আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য

আবদুস্ সাত্তার

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮
[জুন ১৯৭১]

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২।এ, হাটখোলা রোড
ঢাকা-৩

প্রচ্ছদ
বীরেন সান্যাল

Aadibashi Sanskriti O Sahitya (Primitive Culture and Literature) by Abdus Sattar. Published by Bangla Academy Dacca, Bangladesh, First Edition 1971.

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

অধ্যাপক মোহাম্মদ আফসার উদ্‌দীন

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান হিসাবে নৃতত্ত্ব-জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। নৃতত্ত্ব-জ্ঞানই মানব সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের একমাত্র কষ্টিপাথর। 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' এই নৃতত্ত্ব-জ্ঞানেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রায় তিরিশটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইংগিতবাহক। বস্তুতঃ আমাদের আদিবাসী ঐতিহ্য নিয়ে বৃটিশ যুগে কম তথ্যানুসন্ধান হয় নাই। বৃটিশ সিভিল সার্ভিস অফিসারদের একটি মস্ত অসুবিধা ছিল এই যে, তাঁরা এ দেশের ভাষা জানতেন না—কাজেই তথ্য ছিল সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড। দেশীয় গবেষক ও সংগ্রাহকদের স্বভাবতঃই এ অসুবিধা থাকার কথা নয়।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক দীর্ঘদিন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বেশ কয়েকটি গবেষণা-সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর কয়েকটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। এই গ্রন্থটিও তাঁর গবেষণা-ফসলের অন্যতম নিদর্শন। তিনি যে কেবল বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন তাই নয়—মটিফ এবং মটিফিম বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে সমগ্র বিশ্বের প্রায় তিনশত উপজাতীয় সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ। গ্রন্থটি যে কেবল নৃবিজ্ঞানের

ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের উপকারে আসবে তাই নয়—সমাজবিজ্ঞানী, লোকবিজ্ঞানী ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাও তাঁদের চিন্তার খোরাক এতে পাবেন। আদিবাসী অঞ্চলে নিয়োজিত আমাদের প্রশাসকবৃন্দও এসব তথ্য থেকে উপকৃত হবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বইটির ভাষা সহজ, সরল এবং সাবলীল। বিষয়বস্তু সহজভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি কোথাও বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য ক্ষুণ্ণ করেননি।

আশরাফ সিদ্দিকী
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী
ঢাকা।

সবিনয় নিবেদন

'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাত্র দুটো অর্থাৎ যৌনজীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা যেমন ধর্ম ও বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার ভিন্ন গ্রন্থ 'আরণ্য সংস্কৃতি'তে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। [এক] 'যৌন-জীবন' ও [দুই] 'সাহিত্যে'র প্রাধান্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এই গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠা থেকে ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে আমার সবিনয় বক্তব্য পেশ করেছি এবং যেহেতু যৌন-জীবন ও সাহিত্য আদিবাসী সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সেহেতু এই গ্রন্থের নামকরণও করা হলো 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। কারণ এ দুটোই আদিবাসী সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

সবিনয়ে একটি কথা যোগ করতে চাই তা এই যে, এই গ্রন্থে যেসব বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে সেসব আদিবাসী বা যারা এখনো আদিম অবস্থায় আছেন তাঁদের বেলায়ই প্রযোজ্য। যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চতর ধর্ম যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলিম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁরা যদি এসব মেনে নেন তবে আনন্দিত হবো। আর যদি প্রতিবাদ করেন তবে তাঁদের কাছে সবিনয়ে ক্ষমা চাইব। এখানে আরও একটি কথা আছে। শহরে শিক্ষিত সমাজ ও গ্রামীণ নিরক্ষর সমাজ (অশিক্ষিত সমাজ বলছি না) দুটো আলাদা হলেও গ্রামীণ নিরক্ষর সমাজকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি কি? আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল কাঠামোইতো গ্রামীণ সমাজ। সব সংস্কৃতির উৎস যে গ্রামীণ সমাজ সেই সমাজইতো আমাদের সংস্কৃতির জন্মদাতা।

দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সান্নিধ্যে থেকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সে আলোকই প্রতিফলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তবে আলোচনার সীমা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ রাখিনি। বিশ্বের অন্যান্য আদিম সমাজের সঙ্গেও তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। 'আবশ্যিক গ্রন্থ ও পাদটীকায়' সেসবের উল্লেখ করা হয়েছে এবং অগণিত আরণ্য জনপদের ভাই-বন্ধুদের সাহায্যও পেয়েছি প্রচুর এবং গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থ যদি আদিবাসী ভাইবোনদের সামন্যতমও উপকারে আসে তবে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

'বাংলা একাডেমী' কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব বহন করে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাদের কাছে আমার বিনয়াবনত শ্রদ্ধা।

১১।৭ সার্কুলার রোড,
ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫

আবদুস্ সাত্তার
২০. ১. ৭৮

বিষয়-সঙ্কেত

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

সংস্কৃতির সংজ্ঞা যেমন ব্যাপক তেমনি অরণ্যচারী মানুষের সংস্কৃতি অর্থাৎ আদিবাসী সংস্কৃতির ব্যাখ্যাও জটিলতায় আকীর্ণ। সমাজ বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। কুলী, এনজেল, লার, বস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলছেন, 'সৃষ্টির সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি'; কেউ বলছেন, 'অর্থনৈতিক ভিত্তির কাঠামোই হচ্ছে সংস্কৃতি'। আবার কেউ বলছেন, 'সকল বস্তু-অবস্তুর কৌশলের মধ্যে নিহিত রয়েছে সংস্কৃতি'। কাজেই বোঝা যায়, বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ই.বি. টাইলরের ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তি-সঙ্গত এবং সর্বজন সমাদৃত বলে মনে হয়। তাঁর মতে 'সংস্কৃতি হচ্ছে এমন জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত সমাজবাসীর ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধারণা, বিশ্বাস, শিল্প, আইন, আদালত, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মূল্যবোধ ইত্যাকার সবকিছু।' কাজেই সংস্কৃতি বা কালচার বলতে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত সকল মানুষের পূর্ণ জীবনযাত্রাকে বুঝায়। সে জীবনের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্ম, বিশ্বাস, পূজা-পার্বন, ব্রত অনুষ্ঠান, আচার ব্যবহার, আহার পানীয়, খেলাধূলা, সঙ্গীত-নৃত্য, শিল্পকলা, যৌন-জীবন ইত্যাদি সবই জড়িত। অরণ্যচারী মানুষের মৃত্যুর পরের জীবনেও সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত। অতএব সংস্কৃতি শুধু জীবন নয়—জাতির কার্যক্রম ও ব্যবহার পদ্ধতিই সংস্কৃতি।

অরণ্যচারী নর-নারী বা আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম। জন্ম থেকে মৃত্যু, এমনকি মৃত্যুর পরের অবস্থা-

তেও এই প্রেম বা যৌন-জীবন জড়িত। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বি. ম্যালি-নৌস্কী আদিম সমাজের গোটা জীবনটাই যৌন-জীবন বলে চিহ্নিত করেছেন। মুরিয়া ভাষায় একটি কথা আছে 'কানু ছোড়কে গীত নাহি, গোতুল ছোড়কে বাত নাহি।' কানু ছাড়া গীত নেই, গোতুল অর্থাৎ আড়ম্বর ছাড়া কথা নেই।' এর প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায়, আদিম সমাজের যৌন-জীবন ছাড়া কোনো জীবন বা সংস্কৃতিই পূর্ণ নয়।

॥ এক ॥

অরণ্যচারী নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোক-পাত করা হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে। দৈহিক সম্পর্ক যৌন-জীবনেরই নামান্তর। যৌন-জীবন ও যৌন মিলন পরস্পর ওত প্রোত-ভাবে জড়িত—যেন সে টাকার এপিঠ ওপিঠ।

যৌন-মিলন মানব সমাজের সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি মেটাবার তাগিদ মানুষের চিরন্তন স্বভাব। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই এই স্বভাব মানব জাতিকে তাড়না দিয়ে আসছে এবং সন্দেহাতীত ভাবে এই তাড়না অনাদি-কাল চলবে। সমুদ্রের স্রোতের মতো এর গতি—যে গতি কোনোদিন ব্যাহত হবার নয়।

দেহ সম্পর্কিত জৈব তাড়নার ব্যাপারে আদিম সমাজ কিংবা আদিম সমাজ-উদ্ভূত সভ্য সমাজের মধ্যে কোন ভেদ রেখা নেই। ক্ষুধাবৃত্তি নিরসনের প্রচেষ্টায় যেমন সব মানুষ এক এবং অভিন্ন যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষেও তেমনি প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতী এক পথের যাত্রী—সে আদিম সমাজই হোক অথবা সভ্য সমাজই হোক। অতএব যৌন-জীবন তথা দেহ-মিলন মানব-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খিত বস্তু। পৃথিবী সৃষ্টির মূল কারণেও সেই আকাঙ্খার প্রাধান্য বর্তমান। এসব লক্ষ্য করেই হ্যাভলক এলিস, বি. ম্যালিনৌস্কী, মার্গারেট মীড. এফ. বোয়াস, ফার্ডিনাণ্ড হেনরীক প্রমুখ নৃবিজ্ঞানী যৌন-সমস্যাকে মানব-জীবনের বৃহত্তর সমস্যা বলে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে যৌন-জীবনের ধর্মীয় সারবত্তা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁরা গবেষণা কর্মে লিপ্ত রয়েছেন।

তদুপরি যৌন-ক্রিয়াকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রয়াসও সমানভাবে লক্ষ্যযোগ্য। এমনকি তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য অঞ্চলে যৌন-শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে বলে জানা যায়।

আদিম সমাজের যৌন-জীবন সৃষ্টিরহস্যের মতোই রহস্যময়। এই রহস্যের বেড়াজাল তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাতেও ব্যাপৃত। মৃত্যুর পরের অবস্থায়ও কি করে সম্পর্কযুক্ত এ সম্পর্কে সাঁওতাল ও ভারতের মধ্যপ্রদেশের কোন্দ আদিম সমাজে প্রচলিত তামাকপাতার জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করি। রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সর্দার শ্রীসাগরাম মাঝি কর্তৃক পরিবেশিত তামাক পাতার জন্মকাহিনী এইরূপ:

এক অতি দরিদ্র সাঁওতাল ভদ্রলোকের ছিল এক কন্যা। তিনি হাজার চেষ্টা করেও কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারেন নি। একেতো দারিদ্র্যের কষাঘাত, তদুপরি কন্যার চেহারা ছিল ভীষণ কদাকার। কাজেই কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি।

মেয়েটি কদর্য হলে কি হবে?

সে ছিল সতী সাধ্বী এবং নানারূপ গুণাবলীর অধিকারিণী। এবং এ জন্যে দেবতা মারাংবুরো তাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন।

দেবতা তার চারিত্র্য গুণ এবং সতীত্বধারণের পুরস্কার স্বরূপ আশীর্বাদ করলেন, 'তোমাকে কেউ বিয়ে না করুক, ক্ষতি নেই। তোমার মৃত্যুর পরে তোমাকে এমন বস্তুর আকারে সৃষ্টি করা হবে যাতে গোটা পুরুষ জাতটাই তোমাকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করবে।'

মেয়েটি অবিবাহিতা অবস্থায় মারা গেলো। যৌন-মিলনের কোনো সুযোগই তার জীবনে ঘটলো না। তার লাশ যথারীতি দাহ করা হলো। কিন্তু আশ্চর্য! কয়েকদিন পর দেখা গেলো তার দেহ-ভস্ম থেকে গজিয়েছে তামাক পাতা। এভাবেই পৃথিবীতে তামাক পাতার আবির্ভাব ঘটেছে বলে গোটা সাঁওতাল সমাজ বিশ্বাস পোষণ করে। সেই থেকে তাদের মধ্যে তামাক পান করার প্রচলন শুরু হয়। দারিদ্র্য এবং কদর্যতার জন্য যে ছিল সবার অবজ্ঞেয়, ভগবান মারাংবুরোর কৃপায় সেই হলো সবার প্রিয়পাত্র।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের কোন্দ আদিম সমাজে প্রচলিত তামাক পাতার জন্মকাহিনীর সঙ্গে সাঁওতাল কাহিনীর মূল বক্তব্যে মিল রয়েছে পুরো-মাত্রায়। তবে কাহিনী বর্ণনায় তফাৎ ধরা পড়ে, এই যা। ভেরিয়ার এলুইন সংগৃহীত কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

এক সময়ে একজন যুবক ও একজন যুবতী গোতুলে রাত্রি যাপন করতো। যুবতীটি ছিল খুব ধনী ঘরের মেয়ে কিন্তু যুবকটি ছিল খুব গরীব। তারা রাত্রে গোতুলে একই বিছানায় শয়ন করতো কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতো না। এভাবে দীর্ঘদিন কাটলো।

একদিন যুবতী বললো: 'আমার ঘনিষ্ট হও। আমাকে পরিতৃপ্ত করো।'

যুবক উত্তর দিলো: 'তা কি করে সম্ভব? আমরা উভয়ে যে একই গোত্রভুক্ত।'

এতেও যুবতী নিরস্ত হলো না। সে বার বার যুবকটিকে আহ্বান করতে লাগলো তাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য। কিন্তু যুবকটি অনড়। তার স্থির সিদ্ধান্তের পাথর একটুও নড়লো না।

কয়েকদিন পর অন্য এক গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এলো সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক নিয়ে। তারা সকলে মিলে যুবতীটিকে বললো সেই যুবককে বিয়ে করতে। যুবতী উত্তর দিলো: 'আমি জীবনে বিয়ে করবো না। আর যদি তোমরা আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করো তবে আমি 'অমুক'কে ছাড়া বিয়ে করব না।' যুবতীটি তার দয়িতের নাম বলে দিলো।

তখন একবাক্যে সবাই উত্তর দিলো: 'তা কি করে সম্ভব? তোমরা উভয়ে যে একই গোত্রভুক্ত।'

মেয়েটি বললো: 'আমাদের পিতা-মাতাতো আর এক নন! কাজেই যখন ভিন্ন ভিন্ন পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি তখন আমাদের বিয়েতে কোনো বাধা থাকতে পারে না।'

তখন গ্রামবাসী সবাই মিলে সেই যুবকটিকে আদেশ করলো যুবতীকে বিয়ে করতে। কিন্তু যুবকটি অস্বীকার করলো। সে বললো, 'আমাকে যদি বিয়ে করতে হয় তবে অন্য কাউকে করবো, একে নয়।'

কাজেই তাদের মধ্যে আর বিয়ে হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই মনের দুঃখে মেয়েটি মারা গেলো।

অনেকদিন পরের ঘটনা। একদিন যুবকটি গহীন অরণ্যে গেল কাঠ কাটতে। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় যখন সে যুবতীটির কবরের পাশ দিয়ে ফিরছিল, তখন সে কবরের উপর খুব সুন্দর একটি ফুটন্ত ফুল দেখতে পেলো। ফুলটি সে ছিঁড়ে আনলো এবং নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিতেই তার অন্তরাত্মা মোহনীয় এক ঘ্রাণে আবিষ্ট হয়ে গেলো এবং অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন চৈতন্য ফিরে পেলো তখন অনুভব করলো যে তার হৃদয় থেকে সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পরের দিনও সে কাঠ কেটে ফেরার পথে সেই কবরের উপরে আর একটি ফুল দেখতে পেলো। সেই ফুলটি ও কিছু পাতা ছিঁড়ে এনে সে বিছানায় রাখলো এবং সেসব নিয়ে রাত্রে ঘুমালো। আশ্চর্য! রাত্রে সে স্বপ্নে দেখে সেই যুবতীটি তার পাশে শুয়ে আছে এবং বলছে: 'আমি আমার ভালোবাসার কথা তোমাকে অকপটে জানিয়েছি। তথাপি তুমি আমার কথা শুনলে না। এবং আমাকে বিয়ে করলে না। তবে আমাকে তুমি আজকে এখানে এনেছো কেন? যদিবা আমাকে এনেছোই তবে উঠো—আমাকে প্রেম দাও। আমি তোমার প্রেমাকাংক্ষী। যদি তা না করো তবে আমি তোমাকে বিনষ্ট করবো।'

যুবকটি ঘুম থেকে জাগলো। আশ্চর্য! জেগেই দেখতে পেলো যুবতীটি জীবন্ত অবস্থায় ঠিক তার পাশেই বসে আছে। সে তাকে পরিতৃপ্ত করলো। এখন থেকে সে রাতে তার কাছে যুবতীরূপে আবির্ভূত হয় এবং দিনে পুষ্পরূপে কবরের উপর ফুটে থাকে।

যুবতীটি একদিন বললো: 'আমি অবিবাহিতা অবস্থায় মরেছি। কাজেই আমি যে ফুলরূপে ফুটে থাকি তাতে কোনো বীজের উদ্ভব ঘটবে না।'

অতঃপর একদিন যুবকটি মারা গেলো। তাকে একই কবরে সমাহিত করা হলো। তাদের উভয়ের ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ গজালো তামাক পাতা। তাই তামাক পাতা সবার কাছে এত প্রিয়।

এভাবেই নাকি তামাক পাতার উদ্ভব ঘটেছে বলে কোন্দ সমাজ বিশ্বাস পোষণ করে।

শুধু সাঁওতাল ও কোন্দ সমাজ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসী সমাজেও অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান এবং এসব কাহিনী ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পৃক্ত।

আদিম সমাজের সবকিছুই ধর্মীয় বিশ্বাস আশ্রিত। অতএব যৌন-জীবনও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ভিন্ন নয়। উদাহরণ স্বরূপ নারীজাতি সৃষ্টির মূল কারণ, রহস্যময়ী নারী চরিত্রের ব্যাখ্যা, নারীদের ঋতুস্রাব, ঋতুস্রাব কালীন সঙ্গমরীতি কিংবা সঙ্গম পরিহার, গর্ভবতী নারীর সঙ্গে যৌন-ক্রিয়া, যাদু-তেলেসমাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা যায়। এইসব প্রত্যেকটি ব্যাপারের সঙ্গেই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা জড়িত। এবং এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের সর্বত্র বিষদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

যৌন-জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু নারী সমাজ। 'এক হাতে তালি বাজে না' প্রবাদটির সত্যতা মেনে নিয়েও নৃবিজ্ঞানীরা পুরুষ পক্ষের চেয়ে নারী-পক্ষকে যৌন-জীবনের মূল কাঠগড়ায় অগ্রণীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। তাই পুরুষপক্ষের চেয়ে নারীপক্ষের আলোচনায়ই তারা অধিকমাত্রায় তৎপর হয়েছেন। আমাদের এই আলোচনায়ও নারীপক্ষকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরুষপক্ষ যে অনুপস্থিত একথাও বলছি না। কেননা, নারী ও পুরুষ মিলেই যৌন-জীবন তথা দেহ মিলন এবং সৃষ্টির সার্থকতা।

আদিম সমাজের যৌন-জীবন যেখানে সমাজ সমর্থিত সেখানেই বিবাহের প্রশ্ন। এবং যৌন-জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকই এই বিবাহ। বৈচিত্র্যময় আনুষ্ঠানিক পর্বে আদিম সমাজের বিবাহকে শুধু বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেনি, আকর্ষণীও করেছে অধিক মাত্রায়। সমাজ সমর্থিত যৌন-জীবন অর্থাৎ বিবাহের মূল্য অত্যধিক। এই মূল্য শুধু আদিম সমাজে সীমাবদ্ধ নেই; সভ্য সমাজেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিবাহে রয়েছে জীবন-গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব, ভোগের প্রাধান্য, সংযম সাধনার বিস্তৃতি এবং সংসারধর্ম পালনের নিয়ম-নিষ্ঠা। বিবাহিত-জীবন কেন্দ্রিক সামাজিক জীবন ও সংসারধর্মকে সুন্দর, সুষ্ঠ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার পক্ষে যে যৌন-শিক্ষা অপরিহার্য আদিম সমাজ তা থেকেও বিরত নয়। এমনকি আদিম সমাজকে যৌন-শারীর শিক্ষার প্রতিও অনীহা প্রকাশ করতে দেখা যায় না। এ সম্পর্কে গর্ভকালীন যৌন-ক্রিয়া, ঋতুবতী সময়ে সঙ্গমরীতি, প্রসব অন্তে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে

যৌন-সম্ভোগ ইত্যাদির নাম করা যায়। শারীর-বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন পালনে আদিম সমাজও তৎপর। যৌন-শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তারা বর্তমানে উপলব্ধি করছে। এর প্রমাণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে। কাজেই যৌন-জীবন তথা বৈবাহিক-জীবনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক আলোচনাও এই গ্রন্থে বাদ পড়েনি। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য আদিম সমাজের যৌন-জীবন হলেও গ্রন্থটিকে যৌন-বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করলে প্রচণ্ড ভুল করা হবে। কেননা নিছক জৈববৃত্তি কিংবা জৈব কর্ম-কাণ্ড বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিম সমাজের যৌন-জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু, এমনকি মৃত্যুর পরের অবস্থাতেও বিস্তৃত। তাই সৃষ্টি-তত্ত্ব, দেবদেবী অথবা আদি মানব-মানবীর জন্মকাহিনী, পশু-পাখী, জীবজন্তু পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত, সৌর জগৎ ইত্যাদিতে যৌন-প্রভাব কতটা প্রকট সেসব বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সভ্য সমাজ কতটা আদিম সমাজ কর্তৃক প্রভাবান্বিত সে ইংগীতও এই গ্রন্থে রয়েছে। এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে যৌন-জীবন কতটা সম্পর্ক যুক্ত সে বিষয়েও আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য, নারী ও চন্দ্রের সম্পর্ক, নারী ও সমুদ্রের ঘনিষ্ঠতা, নারী ও সর্পের মিলন ইত্যাদি বিচিত্রধর্মী বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। এসব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক আলোচনাই স্থান পেয়েছে।

আদিম সমাজের যৌন-জীবন উপলব্ধি করতে উদার মনোভাবের প্রয়োজন। বি. ম্যালিনোস্‌কী ব্যাপারটিকে পবিত্রতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। জীবন-ধারণের পক্ষে খাদ্য যেমন অপরিহার্য, মানব-জীবন পরিচালনায় যৌন-মিলনও তাই। কাজেই যৌনাচারকে তুচ্ছ করলে গোটা জীবনকেই তুচ্ছ করা হয়। কেননা, যৌনাচারের সঙ্গে যুক্ত গোটা নারী ও পুরুষ সমাজ। এবং এই যৌনাচারই তাদের পরস্পরকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। মানব সৃষ্টি ও বিস্তৃতির মূল কারণই এই যৌনাচার—পৃথিবী আবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তবে হ্যাঁ, আদিম সমাজের যৌন-জীবন কোথাও রোমান্টিক, কোথাও উদ্‌ভ্রান্ত, কোথাও রাক্ষুসে স্বভাবের এবং কোথাও ভাবনা তাড়িত। এবং

এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণই রয়েছে 'এই আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম পর্বে।

॥ দুই ॥

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আদিবাসী সংস্কৃতির সংজ্ঞা-ব্যাপক এবং বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এবং বলা চলে আদিবাসী সংস্কৃতির উপকরণ এত বেশী যে সবগুলো গুছিয়ে নিলে কয়েক ভলিয়ম-গ্রন্থেও এর সংকুলান হবে না। তাই স্বল্প-পরিসরে, আদিম সমাজের পূর্ণ-জীবনযাত্রার চিত্র আঁকার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রথম পর্বের সবটুকু অংশই ব্যয় করা হয়েছে যৌনজীবন কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী, দেব-দেবী, মানব-মানবী, সৌর-জগৎ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, পশু-পাখী, জীব-জন্তু ইত্যাদির সৃষ্টিকাহিনী এবং সবকিছু কেন্দ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস। বলা আবশ্যক যে, আদিম সমাজ কেন্দ্রিক জীবন-যাত্রার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই ধর্মীয় বিশ্বাস-আশ্রিত এবং এ কারণে সবকিছুর অন্তরালেই সংগুপ্ত রয়েছে তাদের ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা, সঙ্গীত নৃত্য, শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ ইত্যাদিরূপ সাংস্কৃতিক উপকরণ।

বিশ্বসৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে আদিম দর্শনের ফলশ্রুতি যে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত দর্শনের পশ্চাতপট তারও ইংগীত রয়েছে এই গ্রন্থে। তাছাড়া দেব-দেবী, প্রথম মানব-মানবী, সৌর জগৎ, প্রকৃতি ইত্যাদির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আদিম সমাজ যে ভূমিকা পালন করেছে তাতেও যে তাদেরকে আদিম দার্শনিক (Primitive Philosopher) বলে আখ্যায়িত করা যায় তারও পরিচয় বিধৃত আছে এই 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে।

এই গ্রন্থে বাংলাদেশের আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন-পর্যালোচনা মুখ্য হলেও সমগ্র বিশ্বের আদিম সমাজের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনধারার তুলনামূলক পরিচয় এতে রয়েছে। এবং আলোচনা করতে গিয়ে বার বার আমাদের গ্রাম্য-প্রবাদের একটি কলিই মনে পড়েছে : 'নানান বরণ গভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য

১.

ছেলেমেয়ের যৌবন প্রাপ্তিই যৌন-জীবনের সূচনা কাল। আদিম সমাজের সামগ্রিক জীবনধারার মধ্যে যৌন-জীবনের সময়কালই অধিক প্রাধান্যের দাবী রাখে। কেননা, তাদের বিশ্বাসে এই সময়কালই সবচেয়ে সারবস্তুধারী জীবনকাল।

পৃথিবী যেমন শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে নারী জাতিও তেমনি সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় যৌবনের আবির্ভাবে—এই বিশ্বাসেই পৃথিবীর মতো নারী জাতিও আদিম সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে আবির্ভুত হয়। এবং এ কারণে নারী জাতিকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজে পূজা-অর্চনা কিংবা ব্রত-অনুষ্ঠানেরও অন্ত নেই।

তবুও নারী জাতি এক রহস্যময়তার অন্তরালেই আবদ্ধ।

আদিম সমাজের যৌন জীবনের পরিধি ব্যাপক। বয়োপ্রাপ্ত সময়কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পর পর্যন্তও এর ব্যাপ্তি এবং বহু ঘটনার সঙ্গে এদের যৌন-জীবন জড়িত। আসলে যৌন সম্পর্কিত জীবনধারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের জীবনাদর্শের পূর্ণরূপ।

আদিম সমাজের নর-নারীর যৌন-জীবন সৃষ্টি রহস্যের মতোই রহস্যাবৃত। এবং যৌন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় নারী জাতিই প্রধানতঃ অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। নারী জাতি যে কতো রহস্যময়তার বেড়াজালে পরিবেষ্টিত হিন্দুশাস্ত্রেও এর উল্লেখ বর্তমান। যেমন 'নারীনাং চরিত্রঃ দেবা না জানন্তি কুতোঃ মনুষ্যাঃ।' (নারীর চরিত্র দেবতারাই জানতে

পারেন না; মানুষ তো কোন্ ছার!) এ প্রসঙ্গে ই. ক্রলে-এর মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য :

'Women is one of the last things to be understood by man. Though the complement of man and his partner in health and sickness, poverty and wealth, woman is different from man, and this difference has had the same religious results as have attended other things which man does not understand.'[১]

আদিবাসী বিশ্বাসে নারী সৃষ্টির মূল উৎস-কেন্দ্রেই রয়েছে রহস্যময়তার উন্মেষ। শুধু তাই নয়, নারীজাতিকে রহস্যের আধার করেই বিধাতা পুরুষদের হাতে অর্পণ করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত আদিবাসী কাহিনীতে এই প্রমাণ সুস্পষ্ট :

'সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা ত্বশত্রী (**Twashatri**) যখন নারী সৃষ্টির কথা ভাবলেন, কি আশ্চর্য, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, নর সৃষ্টি করেই সব উপকরণ নিঃশেষ করে ফেলেছেন এবং নারী সৃষ্টির আসল বস্তু একরূপ অবশিষ্টই নেই। অতঃপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন এবং অনেক বস্তুর সমন্বয়ে নারী সৃষ্টি আরম্ভ করলেন। তিনি চন্দ্রের গোলাকৃতি, লতাগুল্মের বক্রগতি, ঘাসের কম্প্রভাব, পুষ্পের ফুটন্ত স্বভাব, পত্রের কমনীয়তা, হস্তীশুঁড়ের কর্ম-মুখরতা, হরিণীর চাহনী, মৌমাছির মধু-চাকের সৌকর্য, মেঘের ক্রন্দন, সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য, বায়ুর চাঞ্চল্য, খরগোসের ক্ষিপ্রস্বভাব, ময়ূরের অহঙ্কার, তোতাপাখীর বুকের লোমের কোমলতা, প্রস্তরের কাঠিন্য, মধুর মিষ্টিভাব, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, অগ্নির দাহ্যগুণ, বরফের শীতলতা, চড়ুইয়ের কিচির মিচির, কোকিলের কুহুতান, সারসের শঠতা, চক্রবাকের বিশ্বস্ততা ইত্যাদি উপকরণসমূহ নারীরূপিনী মূর্তিতে সংস্থাপন করে এবং অতঃপর তাকে জীবন দান করে পুরুষের হাতে অর্পণ করলেন।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই পুরুষ লোকটি সৃষ্টিকর্তার কাছে এসে অভিযোগ করলো : 'প্রভু, যে জীবটি আমাকে প্রদান করেছেন সে আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। সে সব সময় বক বক করে, আমাকে অসম্ভব গালিগালাজ দেয়, আমাকে ছেড়ে এক মিনিটও কোথাও যায় না,

সব সময় তাকে আদর করতে হয়, কারণে আকারণে সর্বক্ষণ ক্রন্দন করে, কেবল আলস্যে দিন কাটায় ইত্যাদি। অতএব, তাকে ফেরৎ দিতে এসেছি। কেননা তার সঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব।'

স্বষ্টিকর্তা বিশত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, ও আমার কাছে থাক।'

আবার এক সপ্তাহ পর লোকটি স্বষ্টিকর্তার কাছে এসে বললো, 'প্রভু, ওকে ফিরিয়ে দেওয়া অবধি ভীষণ নিঃসঙ্গতা অনুভব করছি। এখন কেবলি মনে পড়ে ও কোকিলের মতো কি চমৎকার গাইতো, ফিঙ্গের মতো কি সুন্দর নাচতো, হরিণের মতো আমার চোখের দিকে কেমন নির্নিমিখ তাকিয়ে থাকতো! প্রভু, ও ছিল মায়াবী লতাগুল্ম। কেমন মায়ায় আমাকে জড়িয়ে রাখতো। ওর হাসিতে ছিল যাদু, যাদুর স্পর্শে আমার হৃদয় জুড়িয়ে দিত। তোতা পাখীর বুকের চেয়েও ওর বুক নরম। ওর স্পর্শে আমি সব দুঃখ ভুলে যেতাম। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। প্রভু, ওকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।'

স্বষ্টিকর্তা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ওকে নিয়ে যাও।'

তিনদিন যেতে না যেতেই লোকটি আবার স্বষ্টিকর্তার কাছে এসে হাজির। সে বললো, 'প্রভু, আমি বুঝতে পারি না কেন এমন হয়! সে আমার কাছে আনন্দের চেয়ে অশান্তিরই কারণ। ওকে আমার প্রয়োজন নেই। ওকে ফিরিয়ে নিন। ও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।'

স্বষ্টিকর্তা এবার ক্ষেপে গেলেন। তিনি কর্কশ স্বরে বললেন, 'দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। আমি বার বার একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে পারবো না। তোমাকে যে কোনো ভাবে তাকে আয়ত্তে আনতেই হবে।'

লোকটি অনড়। বললো, 'প্রভু, এভাবে তার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।'

স্বষ্টিকর্তা আরও ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি ধমকের স্বরে বললেন, 'এ কেমন কথা? একবার বলছো ওকে ছাড়া বাঁচবো না, আবার বলছো ওর সঙ্গে বাস করা অসম্ভব! ওসব হবে না। ওকে তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে এবং এভাবেই চলবে তোমাদের জীবন।'

স্বষ্টিকর্তা এবার লোকটির মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করলেন।

স্রষ্টিকর্তার আদেশ। অমান্য করা মহাপাপ। লোকটি তাকে গ্রহণ করে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কি আর করব! হায়রে রহস্যময়ী নারী! তোমাকে ছাড়াও বাঁচি না, তোমাকে নিয়েও বাঁচা দায়।'[২]

উপরোক্ত কাহিনীতে পুরুষের ভাগ্য এবং নারী চরিত্রের রহস্য বেশ উপলব্ধি করা যায়। এবং আদিবাসী বিশ্বাসে সেই থেকে নারী জাতি রহস্যাবৃত হয়ে পুরুষ জাতির কাছে টিকে আছে। এ রহস্য সৃষ্টি রহস্যের মতোই অদ্ভুত। শুধু আদিম সমাজ কেন গোটা মানব জাতির কাছেই নারী সমাজ এক প্রশ্ন সাপেক্ষ বস্তু।

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। নর ও নারীর যৌন জীবন সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণ গভীর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। জীবন ধারণের পক্ষে আহার এবং পানীয় যতোটা প্রয়োজনীয় যৌন সম্ভোগও ততোটা আবশ্যকীয় বলে আদিম সমাজের ধারণা। অবশ্য সেই যৌন-সম্ভোগের মধ্যে থাকতে হবে পবিত্রতা, ধর্মীয় ও সামাজিক আইনের শাসন।

প্রায় দুই দশক কাল বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের সংস্পর্শে থেকে এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমার এই উপলব্ধিই জন্মেছে যে, যৌন সম্ভোগ দেহের উন্নতি সাধন করে এবং মনের প্রফুল্লতা আনে। তবে তা উপযুক্ত লোক কর্তৃক উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে সমাধা করতে হবে। উপযুক্ত লোক বলতে বিবাহিত লোককেই বোঝায়, সময় বলতে সামাজিক বাধা নিষেধ বা 'টাবু' মানতে হবে; এবং স্থান বলতে গোপনীয় স্থান কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে হতে হবে। এ সম্পর্কেও অবশ্যি মতভেদ আছে। কেননা কোনো কোনো আদিম সমাজ অবিবাহিত যুবক যুবতীর যৌন-ক্রিয়া সমর্থন করে। (এ সম্পর্কে অবশ্যি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) যাহোক, যৌন-ক্রিয়ার মতো গোপন জিনিস পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। গোপনীয়তাই এর একমাত্র আভরণ। এবং এজন্যই বলেছি, ঠিক সৃষ্টি রহস্যের মতোই এটা রহস্যাবৃত।

যৌন-ক্রিয়ার প্রাধান্য আদিম সমাজে যতোটা লক্ষ্য করা যায় ততোটা প্রাধান্য হয়তো আধুনিক সভ্য সমাজে স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অনেক ক্ষেত্রে,

বিশেষ করে নৈতিকতার দিক দিয়ে আদিম সমাজকেও হার মানিয়েছে। তবে কি আধুনিক সভ্য সমাজ এখনো তাদের পুরনো ঐতিহ্য বজায় রাখতে উন্মুখ? আদিম সমাজ থেকে যে তারা উদ্ভূত এসব কি তাই সপ্রমাণ করে?

যৌন-ক্রিয়ার মূল কেন্দ্র বিন্দু প্রজনন অঙ্গ—অর্থাৎ পুরুষ অঙ্গ এবং স্ত্রী অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে 'রসিক আত্মীয়তা' সূত্রে আবদ্ধ এরূপ ধারণা পৃথিবীর বহু আদিম সমাজে বদ্ধমূল। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া আদিম সমাজের উল্লেখ করা যায়। ভেরিয়ার এলুইন দীর্ঘদিন মুরিয়াদের সংস্পর্শে থেকে তাদের যৌন-জীবন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে প্রজনন অঙ্গের প্রাধান্য বর্তমান। তাঁর মতে '......**The penis and vagina are *hassi ki nat*, in a 'Joking relationship' to each other, admirably puts the situation.**'[৩] সম্ভবতঃ এই ধারণা থেকেই আদিম সমাজে অবাধ মেলামেশার সূত্রপাত হয়েছে। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার রীতি তাদের যৌন জীবনের এক রহস্যঘন দিকচিহ্ন সূচিত করে।

২

অবিবাহিত যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশার কেন্দ্রস্থল 'আডডাঘর' (dormitory house) নামে খ্যাত। তাদের বৈচিত্র্যময় যৌন-জীবনে আডডা-ঘরের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেদিন থেকে আদিম সমাজ ঘর বেঁধে জ্ঞাতি-ভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তাদের মধ্যে এই বিশেষ শ্রেণীর ঘরের অস্তিত্ব বর্তমান। কাজেই 'আডডা-ঘর'-এর ইতিহাস আজকের নয়—আবহমান-কালের এবং এগুলো আদিবাসী জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যময় নিদর্শন। বলা যায় যে, আদিবাসী ভেদে এই ঘরগুলোও আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক গ্রামেই আডডা-ঘর দৃষ্টিগোচর হয়। এই ঘরগুলো নির্মিত হয় গ্রামের প্রান্ত সীমায় এবং লোকালয় থেকে বহু দূরে; সর্বোপরি মুরুব্বীদের দৃষ্টির বাইরে। আদিম সমাজের যৌন-জীবন কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, হাসি-ঠাট্টা, নৃত্য-গীত, প্রেম-কৌতুক প্রভৃতি আনন্দ স্ফূর্তি ব্যাঞ্জক ক্রিয়া-কর্ম ছাড়াও এসব ঘরে অনেক সময় সামাজিক জীবনের যাবতীয় কর্ম এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বিচিত্র ধরনের কর্মপদ্ধতি সম্পাদনের আশ্রয় স্থল হিসেবে ঘরগুলোর ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে ঘরগুলোকে নিছক আডডা-ঘর না বলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বলা যেতে পারে। তবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাচুর্য আদিবাসী সমাজে বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ আদিম সমাজই এই শ্রেণীর ঘর যেভাবে

ব্যবহার করে আসছে, তাতে এগুলোকে আডডা-ঘর বলে অভিহিত করাই সমীচীন। কারণ তাদের অবাধ মেলামেশা জনিত আমোদ-স্ফূর্তি, নৃত্য-গীত ইত্যাদির আনন্দ ধ্বনি এসব ঘর কেন্দ্র করেই অনুরণিত। বলা আবশ্যক যে, শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর অনেক আদিবাসীদের মধ্যেই বিবাহপূর্ব অবস্থায় যুবক যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা এমনকি যৌন-ক্রিয়া পর্যন্ত দোষণীয় নয়; তবে বিয়ের পর ছেলেমেয়ে উভয়কেই খুবই পবিত্র জীবন যাপন করতে দেখা যায়।

শুধু এই উপমহাদেশের আদিবাসী কেন, পৃথিবীর সব আদিবাসীর মধ্যেই অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার রীতি প্রচলিত। এই ধরনের মেলামেশার জন্য প্রয়োজন নীরব-নিভৃতি, ফলে আডডা-ঘরের আবশ্যকতা অপরিহার্য এবং সেসব লোকালয় থেকে দূরে এবং মুরুব্বীদের দৃষ্টির আড়ালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মগদের আডডা-ঘর 'চেরাং' নামে অভিহিত। 'চেরাং' নির্মিত হয় 'মাচাং' আকারে। অবিবাহিত মগ যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে মেলামেশার জন্য 'চেরাং'-এ সমবেত হয়; এমন কি, অনেক সময় রাত্রিও যাপন করে থাকে। তদুপরি পাকিস্তানের পাঠানদের জির্গার মত সামাজিক জীবনের ন্যায় অন্যায় সম্পৃক্ত বিচার-সালিসও 'চেরাং'-এ অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিবাহ, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় কাজকর্মের প্রাথমিক আলোচনা বৈঠকও এখানে নিষ্পন্ন হতে দেখা যায়।

মগদের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যময় একটি দিক এই যে, তারা স্বপ্নের দৃশ্যমান বস্তুর নির্দেশ অনুসারে সামাজিক ও ধর্মীয় অনেক কাজ সমাধা করে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। বিয়ে সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা শুভ-ফলপ্রসূ হবে কি না, দেখবার জন্য ছেলে বা মেয়ের বাবা, মতান্তরে ধর্ম-যাজক পবিত্র হয়ে 'চেরাং'-এ শয়ন করে। যদি তারা-স্বপ্নের মধ্যে স্রোতের অনুকূলে ভাসমান নৌকা, পাকা ফল ইত্যাদি ধরণের বস্তু দেখতে পায়, তবে ফল শুভ বিবেচিত এবং বিবাহ-কর্ম সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ণয়ের স্থান হিসেবে 'চেরাং'-এর ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের 'আডডা-ঘর'-এর নাম 'ক্যাং'। 'ক্যাং'-কে ঠিক আডডা-ঘর বললে কিছুটা ভুল করা হয়। কেননা, অন্যান্য আদি-বাসীর আডডা-ঘরের চেয়ে এর ব্যবহার-পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা এখানে সমবেত হয় বটে, তবে তাদের ব্যবহারে কোন অবৈধ আচরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তদুপরি এসব 'ক্যাং'-এ রড়ী বা ঠাকুর কর্তৃক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। এমন কি, ধর্মীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠান এখানেই নিষ্পন্ন হয়। ফলে, একে আডডা-ঘর না বলে বরঞ্চ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ধর্মমন্দির বলেও আখ্যায়িত করা যায়। চাকমাদের 'ক্যাং'-এ মহামুনি বুদ্ধের মূর্তিও স্থাপন করা হয়। সাপ্তাহিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে 'ক্যাং'-এ অনুষ্ঠিত হয়।

লুসাই-কুকীদের প্রত্যেক 'নোক' বা গ্রামেই 'জলবুক' বা আডডা-ঘর বর্তমান। জলবুকে এসে লুসাই-কুকী যুবক-যুবতীরা কেবল হাসি-ঠাট্টা, নৃত্য-গীত এবং রসালাপেই মত্ত হয় না ; অনেক সময় রাত্রিও যাপন করে। অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার দরুণ যদি কোন মেয়ে গর্ভবতী হয় তবে গ্রাম্য 'উপা' বা মাতব্বরদের বিচার অনুযায়ী দুষ্কর্মকারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করান হয়। বিয়ে করলেই ঘটনার পরিসমাপ্তি হয় না। সেক্ষেত্রে দুষ্কর্মকারী যুবককে উপযুক্ত জরিমানা দিতে হয় এবং গ্রামশুদ্ধ লোককে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করতে হয়। লুসাই ভাষায় এই রীতিকে 'সনমন' বলে।

লুসাই-কুকীদের 'ভুইতে'-গোত্রভুক্ত লোকদের মধ্যে 'জলবুকে'র প্রচলন না থাকলেও তাদের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার রীতিটি চিত্তাকর্ষক এবং আদিম মনোভাব সঞ্জাত। 'ভুইতে' গোত্রভুক্ত অবিবাহিত বয়স্ক যুবককে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কোন বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ছাড়াও রাত্রি যাপন করবার অধিকার দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে লুসাই-কুকীদের 'পুরুম' গোত্রভুক্ত অধিবাসীদের যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার রীতিটিও আকর্ষণীয়। তাদের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তির অবিবাহিত যুবক-পুত্র ও যুবতী-কন্যা থাকে তবে পুত্র যায় অন্যের বাড়ীতে যুবতী কন্যার সঙ্গে আমোদ-আহলাদে লিপ্ত হতে

এবং আর একজনের যুবক-পুত্র আসে তার কন্যার সঙ্গে মিলন লাভের অভীপ্সায়।[১]

'জলবুক' নির্মিত হয় গ্রামের প্রান্তসীমা সংলগ্ন পাহাড়ের ঢালু উপত্যকা ভূমিতে। মুক্ত আলো-হাওয়া পাবার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে জলবুকে। এ কারণে জলবুক কেবল আড্ডা-ঘর নয়, স্বাস্থ্য নিবাসরূপেও পরিগণিত। ছোট ছোট ছেলেদেরও জলবুকের আঙ্গিনায় পদচারণা করতে দেখা যায়। তারা জলবুকে আশ্রয় গ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের শীতকালে অত্যধিক শীত থেকে রেহাই পাবার জন্য জ্বালানী কাঠ এবং গ্রীষ্মকালে পিপাসা নিবারণের জন্য পানি সরববাহ ও অন্যান্য ফাই-ফরমাস প্রতিপালন করে থাকে। আবার বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাই হয় জলবুকের সদস্য এবং এর পূর্ণ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। প্রত্যেক জলবুকেই একজন করে 'হোত্তু' বা নেতা থাকে। তাব তত্ত্বাবধানেই জলবুক পরিচালিত হয়। এখানে এসে যুবকগণ তাদের প্রেমিকারা না-আসা পর্যন্ত রসাত্মক গল্প, হাসি-ঠাট্টা এবং কৌতুকে লিপ্ত থাকে। অতঃপর তারা উপস্থিত হলেই যুবকদের মনের সাগরে স্ফূর্তির ঢেউ আন্দোলিত হতে থাকে এবং রাত্রির অবশিষ্ট অংশ আমোদ-প্রমোদ কিংবা সুখ-নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। জলবুকে আহার এবং পানীয়ের একরূপ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে যদি কেউ সঙ্গে করে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে তবে তারা তা হৈ-হুল্লোড় এবং বিশেষ আনন্দ-স্ফূর্তির মাধ্যমে খেয়ে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক প্রেমিকাকেই তাদের প্রেমিকের জন্য উত্তম খাবার নিয়ে আসতে দেখা যায়। এ সব যে প্রেমিক-হৃদয় জয় করবার এবং ভালোবাসা গড়ে তোলার উল্লেখযোগ্য পন্থা, তাতে সন্দেহ নেই।

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদিবাসী গারো এবং হাজংদের আড্ডা-ঘর 'ডেকাচাং' নামে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলে এই ঘরকে আবার 'নোকপান্তে'ও বলা হয়। 'ডেকাচাং'-এর গঠন প্রণালী শিল্প-কৌশলসম্ভূত। এই ঘর দেখতে যেমন উঁচু তেমনি এর কারু-কাজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অর্ধেক অংশে বিরাট হলঘর। হলঘরে প্রধানতঃ গ্রাম্য সভা-সমিতি ও বিচার-সালিসের কাজ পরিচালনা করা হয়। এ ব্যাপারে গ্রাম্য প্রধান বা লস্করদের ভূমিকা প্রধান। 'ডেকাচাং'-এর

বাকী অংশ অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ঘরের ভিতরকার চাল সংলগ্ন কাঠসমূহ অসম্ভব বাঁকানো, দেখতে ঠিক ধনুকের মত। এর নির্মাণ-কৌশল সুনিপুণ শিল্পীর কর্মকুশলতার পরিচয় বহন করে।[২]

সিলেটের খাসীয়া সম্প্রদায়ের 'লিনগাম' গোত্রভুক্ত লোকদের মধ্যেই কেবল আডডা-ঘরের প্রচলন দৃষ্টিগোচর হয়। এটা 'চাং' নামে পরিচিত। 'চাং'-এর নিয়ম-পদ্ধতি উপরে বর্ণিত জলবুক কিংবা 'ডেকাচাং'- থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। 'চাং'-এ একমাত্র অবিবাহিত যুবক ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেবল যুবকেরাই এখানে আনন্দ-কৌতুকে নিমগ্ন থাকে। এ কারণে চাং-কে কেবল আড্ডাঘর বলে অভিহিত করা যায় না। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নৃত্য-গীতের আয়োজনও করা হয়। খাসীয়াদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের অন্যতম ব্যবস্থা 'ডিমভাঙ্গা' অনুষ্টানও 'চাং'-এ কখনো কখনো সম্পাদন করা হয়।

রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং রাজশাহীর ওরাওঁ সমাজের আডডা-ঘরের নাম 'ধুমকুরিয়া'। বাংলাদেশের ওরাওঁদের ধুমকুরিয়া এবং ভারতের রাঁচী, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ধুমকুরিয়ার সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাঁচী ও মানভূম অঞ্চলে এই ধুমকুরিয়া 'জোংখ-এরপা' নামেও পরিচিত। ধুমকুরিয়া কিংবা 'জোংখ-এরূপা' যাই বলি না কেন, এসবের নির্মাণ-কার্যে যেমন রয়েছে শিল্প-চাতুর্য তেমনি রয়েছে সৌখিনতার সুস্পষ্ট ছাপ। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বা টাবু অনুসারে ওরাওঁ যুবতীদেরকে ধুমকুরিয়া কিংবা জোংখ-এরপায় যেতে দেওয়া হয় না। কেবল অবিবাহিত যুবক ওরাওঁ ভাষায় যাদের 'ডাঙ্গার' বা 'লোখার' বলে, তারাই ধুমক্রিয়ায় যাওয়ার এমন কি রাত্রি যাপন করবার অধিকার পায়। অবিবাহিতা যুবতী মেয়েদের জন্য আলাদা ধুমকুরিয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'পেল-এরপা' বলে। 'পেল-এরপা'য় এসেও যুবতী মেয়েরা হাসি-ঠাট্টা এবং চিত্ত-বিনোদন কর্মে সময় অতিবাহিত করে। ধুমকুরিয়া এবং পেল-এরূপা নির্মিত হয় বেশ দূরত্ব বজায় রেখে। পেল-এরপার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে একজন করে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা-তত্ত্বাবধায়িকা থাকে। আঞ্চলিক ভাষায় তাকে 'বরকা-ধাংগরীণ' বলা হয়। তার প্রধান

কাজ যুবতী মেয়েদের কাজ-কর্ম এবং গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা। যুবতী মেয়েরা 'পেল-এরপা'-তে এসে কৌতুকাভিনয় করেই চলে যায়। তবে ফাদার পি. ডেহনের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, বর্ষিয়সী বিধবা মহিলাদেরকে অনেক সময় 'পেল-এরপা'-তে রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়। বিধবা বর্ষিয়সী মহিলাদের পেল-এরপা-তে রাত্রি যাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ কম এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে কোন অন্যায় আচরণ কিংবা শ্লীলতার হানি ঘটলে তা তারা গ্রাম্য প্রধানদের কাছে ফাঁস করে দিতে মোটেই কুণ্ঠিত নয়।[৩]

ওরাওঁদের সামাজিক জীবনের বিচিত্র ধারা ধুমকুরিয়া কিংবা জোংখ-এরপা কিংবা পেল-এবপা-কে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। তাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণ, নৃত্য-গীত, যাত্রা-থিয়েটার এবং পালাগান এইসব আড্ডা ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিয়ে-শাদীর প্রাথমিক কথাবার্তাও এখানে সম্পন্ন করা হয়। ধুমকুরিয়ায় কালযাপনকারী যুবকদেরকে অনেক সময় কতকগুলো সামাজিক কাজকর্মেও নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। যেমন বিবাহ কিংবা কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা—'হরি-আরি', 'সরহুল' 'ফগোয়া' অথবা 'উল্কি অঙ্কন' ইত্যাদির প্রাথমিক আলোচনার জন্য সমবেত গ্রাম্য মাতব্বর কিংবা মেহমানদের অভ্যর্থনা করা অথবা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে যুবকদের উপর। এমন কি যদি মেহমান কিংবা মাতব্বরগণ অধিক পরিশ্রমের জন্য নিজেদেরকে ক্লান্ত মনে করে তখন তাদের হাত-পা টিপে দেওয়া, মাথা মালিশ করা ইত্যাদিও সম্পাদন করে থাকে সেই যুবকগণ। বিনিময়ে যুবকগণ অবশ্য অর্থকরী সাহায্য, পুরস্কার কিম্বা গ্রাম্য-মাতব্বরদের আদেশে ধুমকুরিয়া সংলগ্ন বৃক্ষ থেকে পাকা এবং রসাল ফল পেড়ে খাবার অধিকার পায়। এইসব কর্মে যুবকদের তৎপরতা এবং আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করবার মতো।

ধুমকুরিয়া জীবনের সঙ্গে ওরাওঁদের কতকগুলো সামাজিক বাধা-নিষেধ কিংবা 'টাবু'ও জড়িত। গারো, ভীল ও হাজং মহিলারা যেমন ঋতুবতী কালে শস্য-ক্ষেত অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি ওরাওঁ রমণীরাও ঋতুবতী সময়ে ধুমকুরিয়া অথবা পেল-এরাপা-তে যেতে পারে না। তাছাড়া ঋতবতী রমণীগণের পক্ষে নৃত্য-গীত কিংবা ধর্মীয় কোন

অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এসব ছাড়াও ধুমকুরিয়ায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

সাঁওতালদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অনুরূপ আডডা-ঘর 'আখাড়ার' ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতাল যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্মেলনের কেন্দ্রস্থল এইসব 'আখাড়া'। এখানে তারা সমবেত হয়ে গান-বাজনা শেখে, নাচের মহড়া দেয়, এমন কি ধর্মীয় শিক্ষাও গ্রহণ করে। প্রত্যেক আখাড়ার সম্মুখেই রয়েছে বিস্তৃত খালি জায়গা। এই খালি জায়গায় পূজা-পার্বণ, নৃত্য-গীত ও যাত্রা-থিয়েটার অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা আখাড়ায় এসে প্রেমালাপ ও হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাদের যৌন মিলনের স্থান আখাড়া নয়, গহীন অরণ্যভূমি। এই সুযোগ তারা পেয়ে থাকে 'সাংগরেম' নৃত্য শেষে। 'সাংগরেম' নৃত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যুবক-যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় তারা জোড়ায় জোড়ায় গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে এবং যৌন-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

ভারতের বিরহোর আদিবাসীদের আডডা-ঘর 'গীতিওরা' নামে পরিচিত। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'গীতিওরা' ওরাওঁদের ধুমকুরিয়া কিম্বা নাগাদের 'মোরাং'-এর চেয়ে অনেকটা ভিন্ন ধরনের। ঢন এবং পাতা দিয়ে বিরহোর গ্রামের পাশাপাশি দুটো ঘর তৈরী করা হয়। একটি ঘর যুবক ও অন্যটি যুবতীদের জন্য নির্ধারিত থাকে। যুবকদের ঘরের সম্মুখভাগে মাত্র একটি প্রবেশ পথ বা দরজা বিদ্যমান। কিন্তু যুবতীদের ঘরে সম্মুখ-দরজা ছাড়াও পশ্চাদভাগে একটি অতিরিক্ত দরজা তৈরী করা হয় যেন তারা লোক-চক্ষুর অন্তরালে পিছন দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়। এই কাজ তাদেরকে অতি সঙ্গোপনে সমাধা করতে হয়। কেননা, যুবতীদের 'গীতি-ওরায়' একজন বৃদ্ধা মহিলা রাত্রি বেলায় তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে অবস্থান করে। অনেক সময় এই বৃদ্ধা মহিলাকে 'গীতিওরা'র প্রবেশ-পথে আড়া-আড়িভাবে শয়ন করতে দেখা যায়। মাঝখানে যুবতী মেয়েরা দলবদ্ধ

অবস্থায় শয়ন করে। এমন ঘটনা বিরল নয় যে, গভীর রাত্রে যুবকগণ তাদের প্রেমিকাদের সান্নিধ্যলাভের আশায় অতি সঙ্গোপনে গীতিওরার পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কিম্বা ঘরের দেয়ালে হাত দ্বারা বিশেষ ইংগীতের মাধ্যমে প্রেমিকাকে আহ্বান জানায় এবং সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলে গোপন স্থানে প্রেমালাপে মগ্ন হয়।[৪]

হো, মুণ্ডা, হেস্যাদিহ্ প্রভৃতি আদিবাসীদের আড্ডা-ঘরও 'গীতিওরা' নামে খ্যাত। এইসব আদিবাসী যুবক-যুবতী 'গীতিওরা'য় সমবেত হয় বটে, কিন্তু এখানে রাত্রি যাপন করার অধিকার কেবল যুবকদেরই। রাত্রিকালে 'গীতিওরা'য় প্রবেশ কিংবা অবস্থানের অনুমতি যুবতীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। উল্লেখযোগ্য যে, এদের গীতিওরায় যে সব শিল্পসঞ্জাত জিনিস-পত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য আদিবাসীর আড্ডা-ঘরে সে সব পাওয়া যায় না। ঘরের মেঝেতে দেখা যায় গ্রাম্য মহিলাদের হস্তশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সম্বলিত নক্সা-আঁকা মাদুর বিস্তৃত হয়ে আছে। মহিলারা পুণ্য মনে করে গীতিওরায় ব্যবহার করবার জন্যে এইসব মাদুর তৈরী করে দেয়। তাছাড়া দেয়ালে ঝুলানো থাকে নৃত্য-গীতের সরঞ্জাম—বাঁশী, সেতার, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র; আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র-শস্ত্র, তীর ধনুক, দা, বন্দুক, বল্লম কিম্বা সাংসারিক জীবনে ব্যবহার্য কুড়োল, কোদাল ইত্যাদি। এদের গীতিওরায় আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র-শস্ত্র দেখে স্বভাবতই প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এস. ই. পীলের মন্তব্যটি মনে পড়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আদিবাসীদের আড্ডা-ঘরগুলো নির্মাণ করার পশ্চাতে কেবল আনন্দ অনুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা নেই; এগুলো নির্মিত হয়েছে দুর্গস্বরূপ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আড্ডা-ঘরগুলো নির্মিত হয় গ্রামের তথা দেশের প্রান্তসীমায়। এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার সলা-পরামর্শ কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণের কেন্দ্রস্থলও এইসব আড্ডা-ঘর।[৫] হো, মুণ্ডা এবং হেস্যাদিহদের গীতিওরা পরিদর্শন করলে এস. ই. পীলের কথাই মনে পড়ে।

আসামের মোপা, ভুটিয়া, সিংগফু, মিজি, আকা, খোয়া, মিরি, আপাতানী, মিশং, তাহিন, বরাহি মিশমী, দফলা, নাগা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও আড্ডা-ঘরের প্রচলন বর্তমান। এখানকার আদিবাসীভেদে আড্ডা-ঘরগুলোর

নামও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সিংগফু, মিশমী ও মিরিদের ঘরের নাম 'আরিজু'। কোন কোন অঞ্চলে 'আরিজু' 'পা' বা 'পাহ্' নামেও পরিচিত।

রেংগমা ও আংগামী নাগাদের আড্ডা-ঘরকে 'মোরাং' বলা হয়। শুধু রেংগমা ও আংগামী নাগা নয়, আসামের সর্বত্রই অন্যান্য আদিবাসীদের আড্ডা-ঘরও 'মোরাং' নামে খ্যাত। এদের মধ্যেও যুবক ও যুবতীদের জন্য পৃথক পৃথক মোরাং-এর ব্যবস্থা আছে। মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া আদিবাসীদের 'গোতুল' জীবনধারা সম্পৃক্ত নিয়ম অনুযায়ী যুবক-যুবতীরা যেমন গোতুলে রাত্রি যাপন করে এবং অবৈধ মিলনের সুযোগ পায়, তেমন নিয়ম রেংগামা কিংবা আংগামী নাগা যুবক-যুবতীর মধ্যে না থাকলেও মোরাং ছেড়ে অন্যত্র তারা রাত্রির অন্ধকারে গোপন মিলনের সুযোগ করে নেয়। কেননা, রেংগমা কিম্বা আংগামী নাগা যুবকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়ঃ 'না পাই, না পাই দিনত না পাই।' অর্থাৎ দিনের বেলায় তাদের প্রেমিকার সান্নিধ্য মেলা ভার, রাত্রির অন্ধকারই এই কাজের পরম সহায়ক। যতদূর জানা যায়, যুবক ও যুবতীগণ পাশাপাশি পৃথক পৃথক 'মোরাং'-এ রাত্রি যাপন করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয় এবং সেখান থেকেই সুযোগমত তাদের আপন আপন প্রেমিক-প্রেমিকা অন্বেষণ করে বাইরে চলে যায়।

যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার আশ্রয়স্থল হিসেবেই কেবল 'মোরাং' তৈরী করা হয় না। অপর পক্ষে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যাবলী দ্বারা 'মোরাং'-জীবন পরিচালিত।

সাঁওতালদের আখাড়ার মতো 'মোরাং'-এও পূজা-পার্বণ, নৃত্য-গীত এবং অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হয়। পূজা-পার্বণ কিংবা অনুষ্ঠানাদি পালনের সময় 'মোরাং'কে উত্তমরূপে সজ্জিত করা তাদের ধর্মের অঙ্গীভূত—যেমন অঙ্গীভূত নৃত্যের সময় নৃত্য শিল্পীকে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'পুনং' উৎসবের সময় যেমন জাঁকজমক সহকারে সাজানো হয় 'মোরাং', তেমনি মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত করা হয় 'মোরাং'-সদস্যা যুবতীদের। 'পুনং' উৎসবে যুবতীদের উত্তম সাজ-পোষাকের সঙ্গে যুক্ত থাকে পাখীর পালকের মুকুট। এ যেন ঠিক সোনার উপরে সোহাগার মতো। এমনি পোশাকে সজ্জিত হয়ে

যুবতীগণ যখন অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানায়, তখন অতিথিদের মুগ্ধ না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এসব ছাড়াও 'মোরাং'-জীবন কতকগুলো সংস্কারবদ্ধ নিয়মের অধীন। যেমন এখানে এসে কেউ মিথ্যা কথা, অন্যায় আচরণ, খুন-জখম ইত্যাদি ধরনেব সামাজিক কদর্য কাজ করতে পারবে না। এক কথায় দুশ্চরিত্র লোকের অনুপ্রবেশ এখানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রেংগমা ও আংগামী নাগারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র-সমূহ 'মোরাং'-এ এনে গচ্ছিত রাখে। কেননা, এখান থেকে কোন জিনিসই খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া, গড়, কোন্দ প্রভৃতি আদিবাসীরা আড্ডা-ঘরের সদস্যভুক্ত হতে ইচ্ছা করলে কোনরূপ পরীক্ষারই সম্মুখীন হতে হয় না; কিন্তু রেংগমা ও আংগামী নাগা যুবকদের 'মোরাং'-এর সদস্য হতে হলে কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তবে 'মোরাং'-এর সদস্য হতে পারে। এই পরীক্ষা আর কিছুই নয়—যুবককে তার বল-বীর্যের পরিচয়-বাহী শিকারলব্ধ জীব-জন্তুর মাথা হাজির করতে হবে এবং নিজেকে সাহসী এবং কর্মঠ বলে প্রমাণিত করতে হবে। এসব যে কেবল তাকে 'মোরাং'-এর সদস্য হতেই সাহায্য করে তাই নয়—তা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতিরও ইঙ্গিত বহন করে। বলা যায় যে, যুবক বিবাহযোগ্য কিংবা সাহসী কিনা, সে পরিচয়ের সাপেক্ষেও শিকার-লব্ধ জন্তু-জানোয়ারের মস্তক প্রদর্শন অপরিহার্য।

আও নাগাদের আড্ডা-ঘরও 'মোরাং' নামে পরিচিত। জে. পি. মিলস-এর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক গ্রামের সম্মুখভাগের প্রান্ত-সীমায়ই একটি করে 'মোরাং' বিদ্যমান।[৬] গঠন-কৌশল এবং শিল্পচাতুর্যে 'মোরাং' এক দীপ্ত স্বাক্ষর সম্বলিত সুন্দর ঘর। এই ঘর সাধারণতঃ আকারে ৫০ ফুটের উর্ধ্বে লম্বা এবং ২০ ফুটের মত প্রশস্ত। সামনের দিকে বারান্দা সহ ঘরটি প্রায় মাটি থেকে ৩০ ফুট উঁচুতে মাচাং অবস্থায় সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। এটা একদিকে যেমন প্রতিরক্ষার দুর্গস্বরূপ অপর দিকে তেমনি ক্লাবঘর বা আড্ডা-ঘরের কাজও সম্পাদন করে। গ্রামবাসীদের সামাজিক এবং ধর্মীয় কার্যাবলী সমাধা করার আধার হিসাবে

ঘরটির গুরুত্ব এবং প্রাধান্য লক্ষ্য করবার মতো। অনুরূপভাবে আংগামী নাগাদের 'মেমী' গোত্রভুক্ত যুবক-যুবতীদের জন্য পৃথক পৃথক আড্ডা-ঘরের প্রচলন রয়েছে। 'মেমী'-যুবকদের আড্ডা-ঘর 'ইখুইচি' এবং 'মেমী'-যুবতীদের আড্ডা-ঘর 'ইলুইচি' নামে পরিচিত।[৭] এদের আলাদা আলাদা আড্ডা-ঘর থাকা সত্বেও যুবক-যুবতী উভয় শ্রেণীকে কখনো কখনো একই ঘরে রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়। এবং এই নিয়ম অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, এসব ক্ষেত্রে যুবকগণ 'মোরাং'-এর উপরিভাগের তাকে এবং যুবতীগণ মেঝেয় শয়ন করে থাকে। এসব লক্ষ্য করেই জে. এইচ. হাটন মন্তব্য করেছেন : **'The publicity, probably entails great propriety of behaviour.'**[৮]

কোনিয়াক নাগাদের আড্ডা-ঘরকেও 'মোরাং' বলা হয়। মুরিয়াদের 'গোতুল'-এর চেয়ে কোনিয়াক নাগাদের 'মোরাং' কোন অংশেই কম নয়। এখানে এসে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আনন্দে ফেটে পড়ে। তাদের হৃদয়ের সমস্ত আকুতি যেন 'মোরাং'-কে কেন্দ্র করেই আন্দোলিত। তাদের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো গান-বাজনা, নৃত্য-গীত এবং হাসি-তামাসার সঙ্গে একত্রিত হয়ে এক অনাবিল সময়-খণ্ডের সৃষ্টি করে। এ কারণেই কোনিয়াকদেব 'মোরাং'-কে 'অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের সুখ-সাম্রাজ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় 'মোরাং' কোনিয়াক নাগাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এই মোরাং-জীবন পদ্ধতি প্রত্যেকটি কোনিয়াক নব-নারী, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে এক মহান আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে এবং ব্যক্তিবিশেষ ও দলের মধ্যে সুসংহত মনোভাব বিনিময়ে পরম সহয়াতা করে। তাছাড়া জাতীয়তা, সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় উন্নয়নের সকল পথ প্রশস্ত করতেও 'মোরাং'-এর ভূমিকা অপরিসীম। মোট কথা, 'মোরাং' নাগা-সাংস্কৃতির প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহের পরিচয় বহন করে।[৯]

উড়িষ্যার জোয়াং, ভুইঞা, কোন্দ, গাদাবা, বোন্দু, দিদাই, প্রোজা এবং সাভারা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও আড্ডা-ঘরের ব্যবস্থা আছে। আঞ্চলিক ভাষায় এদের আড্ডা-ঘরকে 'মান্দাঘর' বলে। কোন কোন এলাকায়

এই ঘর 'দরবার-ঘর' নামেও পরিচিত। এই ঘর কেবল যুবকদের চিত্ত-বিনোদন ব্যবস্থাই চরিতার্থ করে না, বরঞ্চ একে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থল বলেই আখ্যায়িত করা যায়। প্রত্যেকটি মান্দাঘর বা দরবার-ঘরের পাশে মেয়েদের জন্যও আলাদা করে আড্ডা-ঘর নির্মিত হয়। যুবতী মেয়েরা যাতে তাদের প্রেমিকজনের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়, সে সবেরও পুরোপুরি ব্যবস্থা থাকে এইসব 'মান্দাঘর' বা 'দরবার-ঘরে'। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যেই অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার রীতি প্রচলিত। সামাজিক দৃষ্টিতে এই মিলন মোটেই দোষণীয় নয়। কেননা, তাদের মধ্যে পবিত্র এবং বিশ্বস্ত জীবন শুরু হয় বিয়ের পর থেকে, আগে নয়। বিয়ের পরে সাধারণতঃ কোন মেয়েকেই নীতিভ্রষ্টা কিংবা চরিত্রভ্রষ্টা হতে দেখা যায় না। বিয়ের পর তারা খুবই বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে।

উড়িষ্যার আদিবাসী সমাজের বিশেষ করে জোয়াং ও ভুঁইঞাদের 'মান্দাঘর' বা 'দরবার-ঘর' নানা দিক দিয়েই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[১০] এই ঘর আকারে খুব বড়। ঘরের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং লম্বালম্বি বারান্দা সন্নিবেশিত থাকে। ঘরের পিছনে ছোট ছোট অনেকগুলো কক্ষের সমাবেশ ভারি চমৎকার দেখায়। কক্ষগুলোর মধ্যে একটি থাকে গ্রাম্য-দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট বা নিবেদিত আর একটিতে থাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ উপচার-ছাগল, ভেড়া বা অন্যান্য জীব-জন্তু। দেয়ালে নানারূপ হস্তশিল্পের নিদর্শনও ঝুলানো অবস্থায় নজরে পড়ে। ঘরের মাঝখানে হলঘর বা মিলনায়তন। মিলনায়তনের এক পাশে সর্বক্ষণের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকে। এই অগ্নিকুণ্ডের বহুবিধ উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত যে, কেউ যদি কোন অন্যায় করে তবে তাকে ভবিষ্যৎ-জীবনে আর অন্যায় না করার শপথ গ্রহণ করতে হয় এই অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করে। দ্বিতীয়তঃ জোয়াং, ভুঁইঞা প্রভৃতি আদিবাসীরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এক রকম বাইরে থেকে গ্রহণ করে না। সেই জন্য রন্ধন-ক্রিয়া কিংবা বন-জঙ্গল পোড়ানোর আগুন তারা এই অগ্নিকুণ্ড থেকেই সংগ্রহ করে। তৃতীয়তঃ অগ্নির আছে দাহ্য-শক্তি বা দৈবশক্তি; সেজন্যে তা সবকিছু পোড়াতে সমর্থ হয়।

তাদের বিশ্বাস, অগ্নিকুণ্ড সর্বক্ষণের জন্য জ্বালানো থাকলে তার সারবস্তু তাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করবে।

'মান্দাঘর' বা 'দরবার-ঘর' এতদঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে যে কতটা প্রয়োজনীয় তা নিম্নের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে আশা করি। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতিটি প্রয়োজনীয় কাজে গ্রামের লোক এখানে এসে সমবেত হয়। এখানে এসে তারা স্থির করে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা; কোন্ ক্ষেতে ফসলের বীজ বুনবে কিংবা কোথায় হলকর্ষণ করবে, এসবও এখান থেকে স্থিরীকৃত হয়। তাছাড়া সাংসারিক বা সামাজিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান চিন্তাও এখানে এসে সমাধা করতে হয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক মান্দাঘর বা দরবার-ঘরেই একজন করে ঠাকুর বা ধর্মযাজক অবস্থান করেন। তিনি সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য সবাইকে আশীর্বাদ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রপূতও করে দেন।

মান্দাঘর বা দরবার-ঘরের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীকে নানা ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে নৃত্য-গীত শিক্ষা অন্যতম। মান্দাঘরের সম্মুখ-ভাগে যে খোলা মাঠ অবস্থিত সেখানে প্রতি রাত্রেই ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীরা এসে সমবেত হয় এবং নৃত্য সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীরা যে কখনো কখনো নাচতে নাচতে এ গ্রাম সে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এরূপ নজিরও বিরল নয়। গ্রাম-প্রদক্ষিণকারী নৃত্যের মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হয়; এমন কি, কোন কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে মনোমিলন ঘটে এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। মান্দাঘর বা দরবার-ঘর যে মূলতঃ নৃত্য শিক্ষারই কেন্দ্রভূমি তা মান্দাঘরের উৎপত্তি সম্পর্কিত কাহিনীর মধ্যে বিধৃত। যতদূর জানা যায়, জোয়াংদের আদি-পুরুষ রোসী তার ছেলেমেয়েকে নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়েই 'মান্দাঘর' তৈরী করেছিল। ভেরিয়ার এলুইন সংগৃহীত একটি কাহিনী থেকে জোয়াংদের 'দরবার-ঘর' বা 'মান্দা ঘর'-এর উদ্দেশ্য এবং সামাজিক জীবনের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। জনৈক ধর্মযাজকের কাছ থেকে তিনি কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন।

কাহিনীটি এইরূপ: আমার বয়স যখন দশ বছর তখন থেকে আমি 'মান্দাঘর'-এ ঘুমুতে যেতাম। আমার বাবা আমাকে একটি ঢোল তৈরী করে দিয়েছিলেন। আমি সেই ঢোল বাজাতাম এবং মনের সুখে দেবতার পূজা করতাম। রাত্রে প্রায়ই নাচের আসর জমতো। নাচ শেষ করে আমি পার্শ্ববর্তী মেয়েদের মান্দাঘরে চলে যেতাম। যুবতী মেয়েরা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতো। আমি তাদের অতিথি হলে তারা আমার সেবা-যত্ন করতো; এমন কি, হাত-পা টিপে দিত। পরিশ্রান্ত হলে হাত-পা টিপে দিলে যে কি আরাম পেতাম আমি তখন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতাম। তাছাড়া উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় তারা নানারূপ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তৈরী করতো এবং আমার জন্য মান্দাঘরে নিয়ে আসতো। আমি তাদের জন্য টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতাম এবং সময় বুঝে দিয়ে দিতাম। এদের মধ্যে আমি দু'জন মেয়েকে ভালবেসে ফেললাম। অর্থাৎ আমার ছিল দু'জন প্রেমিকা (দাংগ্রী)। আমি এদের দু'জনকেই চিরুণী, আংটি এবং ফুলের মালা দিতাম। সত্যি কথা বলতে কি, এসব দিতে পারলে আমি যে কি খুশী হতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিনিময়ে তারাও আমাকে নানারূপ উপহার দিত এবং আমার সঙ্গে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতো।

অপরপক্ষে, আমি যখন দলের সঙ্গে অন্য গ্রামে নাচতে যেতাম তখন কাজুরিয়া এবং বানসপাল গ্রাম দু'টিতে যাওয়া ছিল আমার অতি অবশ্য কাজ। এই গ্রাম দু'টিতে যেন না গেলেই নয়। কেননা, সেখানেও একদল মেয়ে ছিল যারা আমাকে ভীষণভাবে আদর করতো। আমি তাদের জন্য মুড়ি এবং অলঙ্কারাদি উপহার দিতাম। সেখান থেকে ফেরার পথে তারা এসে আমাকে থামাতো, আমাকে ঘিরে গান করতো এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর ফুল বিনিময় হতো। প্রথম প্রথম আমার ভীষণ লজ্জা করতো, কিন্তু পরের বছর যখন তারা আমাদের গ্রামে নাচতে আসে তখন আমাদের মধ্যে প্রেম হয় এবং আমি দু'জনকে নিয়ে পালাক্রমে শুয়ে থাকি।[১১]

ভারতের মধ্যপ্রদেশের 'বাস্টার স্টেট'-এর মুরিয়া আদিবাসীদের 'আড়ডা-ঘর' 'গোতুল'-এর নাম বিশ্ব-বিশ্রুত। মুরিয়া ভাষায় একটি প্রবাদ আছে:

'কানু ছাড়া গীত নাহি, গোতুল ছাড়া বাত নাহি।' কাজেই এই প্রবাদ থেকেই আশা করি 'গোতুল'-এর প্রাধান্য সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। মুরিয়াদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনের কেন্দ্রভূমি 'গোতুল'। মুরিয়া-জীবনে গোতুলের ভূমিকা অপরিসীম এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন আদিবাসীদের মধ্যে নেই। গোতুলের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, রীতি-নীতি এবং গোতুল-কেন্দ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইনের মন্তব্যটি আশা করি গোতুল-জীবনের সম্যক পরিচয় দিতে সমর্থ হবে: 'গোতুল মুরিয়াদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাব উদ্ভব ঘটেছে গঁড় জাতিদের প্রধান দেবতা লিংগু পেনকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটি মুরিয়া অবিবাহিত যুবক-যুবতীকে অবশ্যম্ভাবীভাবে গোতুলের সদস্য হতে হবেই। এই সদস্য-সদস্যাদেরকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত করা হয়। কিছুদিন গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার পর যুবক এবং যুবতীদেরকে বিশেষ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এই আখ্যা সম্মান-জনক এবং আখ্যাপ্রাপ্ত হলেই তাদের উপর অনেক সামাজিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সদস্য এ সদস্যাদের পরিচালিত করার জন্য কিছু সংখ্যক নেতাও নিযুক্ত করা হয়। নেতাদের কর্তব্য তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।........যে বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হয় তা এই যে, যুবকগণ 'চেলিক' এবং যুবতীগণ 'মইতারী' নাম গ্রহণ করে। এই 'চেলিক' ও 'মইতারী'গণ যে যে ধরনের গোতুলের অন্তর্ভুক্ত সে সেই ধরনের গোতুলের নিয়ম অনুসারে পবিচালিত হয়। প্রধানতঃ দুই প্রকার গোতুলের অস্তিত্ব বর্তমান। একটি প্রাচীন ধরনের—যাতে অবিবাহিত যুবক-যুবতী জোড়ায় জোড়ায় গমন করে, রাত্রি যাপন করে এবং তাদের এই ধারা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারা কখনো কখনো বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং বেশ কয়েক বছর ধরে গোতুলে সহবাস পর্যন্ত করে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো অতি আধুনিক ধবনের—যাতে এই ধরনের মেলামেশা অনেকাংশ পরিমিত........।[১২]

উপরের মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, চেলিক এবং মইতারীদের গোতুল-কেন্দ্রীক জীবন একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, অপরদিকে তেমনি

উপভোগ্য। চেলিক এবং মইতারী আর কিছুই নয়—মুরিয়া অবিবাহিত যুবক-যুবতী যারা গোতুলের সদস্যভুক্ত হওয়ার পর থেকে এই বিশেষ নামে আখ্যায়িত হয়। তারা দিনের বেলায় গোতুলে এসে সামাজিক কাজ-কর্ম সমাধা, ধর্মীয় উপদেশ গ্রহণ, এমন কি নৃত্য-গীত সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করে থাকে। রাত্রি বেলায় শুরু হয় তাদের রোমাঞ্চকর জীবনের আবর্তন। তখন চেলিক এবং মইতারীগণ এক সঙ্গে নৃত্য-গীতে অংশ গ্রহণ করে, হাসি-ঠাট্টায় মত্ত হয়। সব শেষে একত্রে রাত্রি যাপন করে।

গোতুল কেন্দ্র করে চেলিক ও মইতারীগণের যে কতরকম রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত আছে, তা প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন সংগৃহীত জনৈক চেলিকের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হবে: এক সময়ে গোতুলে বার জন ছেলে ও দশজন মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছেলে অপর একজন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হওয়া সত্ত্বেও বিছানায় ঘুমাতো।........আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মালাকুর। মালাকুকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। আমি তখন গোতুলের পাহারাদার। কিন্তু দুই বছর পর আমি পাহারাদার থেকে 'কোটওয়ার'-এ উন্নীত হই। সামাজিক প্রথা অনুসারে আমার তখন 'কোট-ওয়ারী' নিয়ে ঘুমাবার কথা। কাজেই আমাকে মালাকুকে ছেড়ে একজন কোটওয়ারীর সঙ্গে ঘুমুতে হতো। কিন্তু আমি মালাকুকে কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। আমার প্রাণটা পড়ে থাকতো মালাকুর কাছে। রাত্রে তখন সবাই ঘুমে অচেতন থাকতো, আমি কোটএয়ারীর বিছানা থেকে পালিয়ে অতি সন্তর্পণে হামাগুঁড়ি দিতে দিতে মালাকুকে প্রেম দান করতে চলে যেতাম। বলা দরকার যে, মালাকুর সঙ্গে যে গোপনে আমার বিয়ে হয়েছিল এসব আমার বাবা-মা জানতেন না। বড়ই আনন্দের ব্যাপার এই যে, তাঁরা আমাকে জানালেন খুব শীগ্‌গীরই মালাকুর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার তখন খুশির সীমা ছিল না এবং মালাকুকে পাবার জন্য আমি প্রতিটি প্রহর গুণতে ছিলাম।

এই শুভ সংবাদ শুনার অল্প কয়দিন পরেই আমি বিশেষ একটি কাজ উপলক্ষে বনওয়াগ নামক স্থানে চলে গেলাম। এক সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। সেখানে থাকাকালীন স্থানীয় গোতুলে আমি একজন জমাদারনীর সঙ্গে ঘুমাতাম। জমাদারনী আমাকে খুব ভালবাসতো। তার কাছ থেকে

বিদায় নেওয়ার রাত্রে ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ সে আমার চুলে গোঁজা চিরুণী উঠিয়ে নিয়ে নিজের খোঁপায় গুঁজলো। ......মনওয়াল থেকে কুকুরী নামক এক গ্রামে আমাকে যেতে হলো। সেখানকার গোতুলে এক রাত্রে আমি মনের আনন্দে নাচলাম। আমার নাচে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার একজন মইতারী আমার প্রেমে পড়লো এবং অনবরত আমাকে তামাক প্রদান করতে শুরু করলো।........কিছুদিন পর আমি বাড়ী রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে গহীন অরণ্যের মাঝখানে তিনজন যুবতী এসে আমার পথ আগলে দাঁড়ালো এবং আমার কাছে পেম নিবেদন করলো। কিন্তু আমি তখন ঘরমুখো........।

বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পরেই আমার বাবা-মা আমাকে মালাকুর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। আমরা খুব সুখে ছিলাম। সব সময় দু'জনে মিলে কাজ করতাম। কখনো ঝগড়াঝাটি করতাম না।........

আমার বিয়ের এক বছর পর বরডঙ্গরে মহারাজা এলেন। আমি বাবার সঙ্গে মহারাজার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান দেখতে গেলাম। সেখান থেকে আমাদেরকে মালাকটে যেতে হলো। এবং সেই মালাকটের গোতুলে আমাকে দুটো রাত্রি কাটাতে হলো।' বলা বাহুল্য, সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন মইতারী খুব গোপনে আমার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করল।[১৩]

উপরোক্ত কাহিনীটিতে কেবল রোমাঞ্চই প্রচ্ছন্ন নেই : মুরিয়াদের সমাজ-জীবনেরও বৈচিত্র্যময় চিত্র পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোতুল হলো মুরিয়া যুবক-যুবতী বা চেলিক-মইতারীদের কাছে নাইট-ক্লাব স্বরূপ। এক কথায় চিত্ত-বিনোদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

গোতুল-কেন্দ্রিক আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে নৃত্য অপরিহার্য। নৃত্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয় গীত। শুধু আদিবাসী সমাজ কেন আধুনিক শিক্ষিত সমাজেরও গীত নৃত্যের অঙ্গীভূত। মুরিয়া নৃত্যে যেসব গীত পরিবেশিত হয়, উদাহরণস্বরূপ তার দু' একটার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"কোরকা তে দোয়া উই কি হে লো তিলোকা,
তানা ওসি বড় কিয়াকাঁ দাদা সিল্লেদার।
মেহ্ওয়াল কপাল লেওয়া বড় কিয়াকান।

বড় না দায়ে ইউকি হে গো তিলোকা।
গোদা তে গিলো ইউকি হে গো তিলোকা।
তা না বড় কিয়াকাঁ দাদা সিল্লেদার।
কোনয়ার তে কোর উইকি হে গো তিলোকা।
তা না বড় কিয়াকাঁ দাদা সিল্লেদার।
বল না দায়ে উইকি হে লো তিলোকা।
সেন্দুক তে রূপিয়া উইকি হে লো তিলোকা।
তা না না না বড় কিয়াকাঁ দাদা সিল্লেদার।
ঝাঁপি তে চোচো উইকি হে লো তিলোকা।
না না তা না উইকা দাদা সিল্লেদার।"[১৪]

ভাবার্থ :

হে বোন তিলোকা, গোহাল থেকে গরু নিয়ে যাও।
হে ভাই সিল্লেদার, আমি কি জন্য গোহাল থেকে গরু নেব ?
গরু চরাবার মাঠ নেই. আমি কি জন্য গরু নিব ?
হে বোন তিলোকা, তুমি কি চাও আমার কাছে ?
তিলোকা, তুমি বাথান থেকে শূকর ছানা নিয়ে যাও।
হে ভাই, সিল্লেদার, আমি কি জন্য শূকর ছানা নিব ?
হে বোন তিলোকা, তুমি ঘর থেকে মুরগী নিয়ে যাও।
হে ভাই সিল্লেদার, আমি কেন মুরগী নিতে যাব ?

উপরোক্ত গীতিসমূহ নৃত্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। আদিবাসী নৃত্যধারার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, গানের প্রতিটি লাইনের অর্থবহ ইংগিত তারা নৃত্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। শুধু আদিবাসী কেন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নৃত্য-ধারায়ও একই স্বর লক্ষণীয়। তাছাড়া, গানগুলো পরিবেশিত হয় কখনো একক কিংবা কখনো কোরাস স্বরের মাধ্যমে। অধিকাংশ গানে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রশ্ন ও জবাব। উপরোক্ত গানটি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। শুধু তাই নয়, গানগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব অনেক সময়ই দর্শককে ভাবিয়ে তোলে ও মোহাবিষ্ট করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের আর্তিই গানগুলোর মূল বিষয়বস্তু।

পৃথিবীর সর্বত্রই আডডাঘরের অস্তিত্ব বর্তমান। এস. এ. পীলের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, ভুটান থেকে নিউজিল্যাণ্ড এবং মারকোসেসা থেকে নাইজার পর্যন্ত প্রতিটি আদিবাসী সমাজের মধ্যেই আডডাঘরের প্রচলন রয়েছে।[১৫] এই আডডা ঘরসমূহ নানাদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তুলনামূলকভাবে এই উপমহাদেশের আদিবাসীদের আডডাঘরের সঙ্গে এইসব আডডাঘরের ব্যবহার পদ্ধতিতে কোথাও কোথাও মিল লক্ষিত হলেও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে প্রচুর। কেননা, মারকোয়েসা থেকে নাইজার পর্যন্ত যেসব আডডাঘরের বিবরণ এস. এ. পীল সাহেব পেশ করেছেন তাতে জানা যায়, যে এইসব আডডাঘরে যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশার চেয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক-আচার অনুষ্ঠানই প্রতিপালিত হয় অধিক মাত্রায়।

নিউগিনির আদিবাসীদের আডডাঘরগুলোতেও ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানই সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত নৃত্যতত্ত্ববিদ এ. সি. হাডন -এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নিউগিনির আদিবাসীদের আডডাঘর বা ক্লাব ঘরের মত টরেস ষ্ট্রেইট্‌স (**Torres Straits**) দ্বীপপুঞ্জের আদি-বাসীদের আডডাঘর কবদ (**Kwod**) সমূহও একই উদ্দেশ্যে নির্মিত। হাডন বলেনঃ কবদ ধর্মীয়, সামাজিক এমন কি, রাজনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। প্রত্যেকটি যুবক কবদ-এর সদস্য। তারা এখানে সমবেত হয়, প্রয়োজন-বোধে ঘুমায়, তাছাড়া কবদ রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর। তদুপরি যুবকগণ কবদের জন্য পানি সংগ্রহ করে; সদস্যদের খাদ্য জোগায়, জ্বালানী কাঠ আনয়ন করে, অগ্নি প্রজ্জ্বলন লক্ষ্য করে—এক কথায় মুরুব্বী-দের সব রকম আদেশ পালন এবং খেদমতে তারা হাজির।[১৬]

মেলানেশিয়া এবং নিউগিনির প্রায় সর্বত্রই যে সব আডডাঘরের অস্তিত্ব বর্তমান, সেগুলো ব্যবহৃত হয় পুরুষ কর্তৃক। মহিলাদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ কডরিংটন দীর্ঘদিন মেলানেশিয়া ও নিউ-গিনির আদিবাসীদের সান্নিধ্যে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের প্রত্যেকটি গ্রামেই একটি করে বিশেষ শ্রেণীর ঘর আছে—যেখানে পুরুষগণ আহার করে, চিত্তবিনোদনের জন্য সময় কাটায়, এমনকি, রাত্রিও যাপন করে থাকে। সেখানে আরও একটি নিয়ম প্রচলিত যে, গ্রামে কোন অতিথির আগমন ঘটলে তার প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং অভ্যর্থনা সেই বিশেষ শ্রেণীর

ঘরেই করা হয়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের আড্ডাঘরের মত সেইসব ঘরে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, দর্শনীয় সুদৃশ্য চিত্র এবং শিল্পকলার নিদর্শনসমূহও গচ্ছিত রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ফ্লোরিডার 'কিয়ালা', সানফ্রিসটোভালের 'ওহা', সান্তাক্রুজোর 'মাদাই' এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের 'বুরে' নামক ঘরগুলোও একই উদ্দেশ্য পালন করে।[১৭] কিন্তু মেলানেশিয়ার মাইলু দ্বীপেব আদিবাসীদের 'দোর' ঘরসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই জন্য যে, এখানে শত্রুর মাথা কেটে এনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটা একদিকে যেমন শৌর্য বীর্যের পরিচয় বহন করে, অপর দিকে তেমনি শত্রুতার উন্মেষ অন্তর্হিত হয়। তা ছাড়া দেয়ালে আবো ঝুলানো থাকে যুদ্ধের ঢাল, তরবারি, বল্লম, তীর, ধনুক ইত্যাদি। যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং যুদ্ধজয়ের আনন্দ অনুষ্ঠান এখানেই পালন করা হয়। তদুপরি অবিবাহিত যুবকদের বিয়ে সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার বৈঠক-ঘরও এই 'দোর'।[১৮] অনুরূপভাবে সান্তা আন্না অঞ্চলের 'তুহে', ফ্লাইরিভার এলাকার 'দারিমু', পুরারী ডেল্টা অববাহিকা অঞ্চলের 'রাভী' প্রভৃতি আড্ডা-ঘরসমূহে একই ধরনের ক্রিয়া কলাপ লক্ষ্য করা যায়। এসব ছাড়াও মেলানেশিয়া এবং নিউগিনির বহুস্থানে ভিন্ন নামে পরিচিত আড্ডাঘর দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, এইসব ঘরেব কোনটাতেই মহিলাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ রেমণ্ডফার্থ ঘরগুলোর অবস্থান, নির্মাণকৌশল এবং ভেতরের আসবাবপত্র পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন যে, সর্বোপরি ঘরগুলো যুদ্ধপ্রিয় আদিবাসীদের সামরিক জীবন পবিচালনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।[১৯]

মেলানেশিযা এবং নিউগিনি অঞ্চলে মেয়েদের জন্য যে আড্ডাঘর নেই, এমন কথা বলা যায় না। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সেখানকার কোন কোন নির্দিষ্ট আড্ডাঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে সেখানেও এই উপমাহাদেশের মতো মেয়েদের আড্ডাঘর আছে এবং নানা কারণে সেগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ নিউ হেব্রীডেসের 'ইমে ইয়াম' ঘরসমূহের উল্লেখ করা যায়। এই ঘরগুলোও মুরিয়াদের গোতুলের ভূমিকা পালন করে। ইমে ইয়াম ঘরে যুবতীরা কেবল রাত্রিই যাপন করে না—আপন আপন প্রেমিকের সঙ্গে যৌন ক্রিয়া পর্যন্ত সম্পাদন

করে। সেখানকার যুবক-যুবতীরা যে ভাবে ইমে ইয়াম ব্যবহার করে, তাতে একে সাময়িক সহবাসকেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করা যায়। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হামফ্রে দীর্ঘদিন নিউ হেব্রীডেসের আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সেখানকার প্রত্যেক গ্রামেই একটি বিশেষ শ্রেণীর ঘর আছে। এই ঘর ইমে ইয়াম নামে পরিচিত। এখানে খৎনা ক্রিয়া সম্পাদন করার পর অবিবাহিত যুবকগণ অবস্থান করে। বছরের বিশেষ সময়ে কয়েকদিনের জন্য এই ঘরে 'আইওহোয়ানল' নামে পরিচিত এমন একজন মহিলা অবস্থান করে, যার কাজ হলো যুবকদেরকে যৌনরহস্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। আইওহোয়ানাল কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে কোন যুবকই বিয়ে করতে পারবে না, এটা তাদের চিরাচরিত নিয়ম। এমনকি আরও একটি নিয়ম প্রচলিত যে, যৌনশিক্ষা দেওয়াব প্রাক্কালে সেই আইওহোয়ানাল যুবকদের সঙ্গলাভেরও ব্যবস্থা করবে। অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যুবকগণ বিয়ে করতে পারবে না।

ব্রিটিশ নিউগিনির ওয়াগওয়া আদিবাসীদের 'পুতুমা' নামে খ্যাত ঘরগুলোও প্রায় ইমে ইয়ামের ভূমিকা পালন করে। পুতুমা যুবতীদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এখানে তারা রাত্রিও যাপন করে। পুতুমা ঘরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক বাড়ীতেই এক বা একাধিক পুতুমা ঘর আছে। কোন বাড়ীতে যখন কোন নতুন ঘর তৈরী করা হয় তখন বাড়ীর সবচেয়ে পুরনো ঘরটি পুতুমা হিসেবে মেয়েদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পার্শ্ব-বর্তী বাড়ীর অবিবাহিত যুবতী মেয়েরা এখানে আস্তে আস্তে সমবেত হতে থাকে এবং অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে এলে অবিবাহিত যুবকগণও সেখানে জড় হয়। যুবক যুবতীদেব মধ্যে প্রেম বিনিময়ের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। প্রথম যুবক পুতুমায় প্রবেশ করেই যুবতীদের কাছে কয়েকজন যুবকের নাম বলে এবং জানতে ইচ্ছে করে যে, কোন নামের যুবককে তারা গ্রহণ করতে চায়। কোনও যুবককে পছন্দ হলে নির্দিষ্ট কোনও যুবতীকে বলতে শোনা যায়, 'আচ্ছা ঠিক আছে, অমুককে আসতে বলো'। এমনিভাবে সব যুবতীই নিজ নিজ প্রেমিক পছন্দ করে নেয় এবং অতঃপর পুতুমা সর্দারের নির্দেশ অনুসারে তারা জোড়ায় জোড়ায় সেখানে রাত্রি যাপন করে। যেসব

যুবককে অপছন্দ করা হয় তারা তখন একই উদ্দেশ্য পালন করার জন্য অন্য পুতুমায় গমন করে মনের বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষে। প্রত্যেক পুতুমায়ই গান বাজনা বা নৃত্যের ব্যবস্থা আছে; তবে প্রধান উদ্দেশ্য যৌন মিলন।[২০]

ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের 'বুকুমাতোলা' ঘরসমূহের সঙ্গেও পুতুমার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি, এই উপমহাদেশের আদিবাসীদের অনেক আড্ডাঘরের সাথেও বুকুমাতোলার প্রভূত মিল রয়ে গেছে। সেখানকার প্রত্যেক গ্রামেই বিশ থেকে তিরিশটি করে বুকুমাতোলা দৃষ্টিগোচর হয়। এইসব ঘরে অবিবাহিত যুবক যুবতী কখনো দু'জন কিম্বা চারজন অথবা আটজন করে সাময়িকভাবে অথবা দীর্ঘদিনের জন্য অবস্থান করে। আবার কখনো কখনো এমন দেখা যায় যে, দু'এক ঘন্টার জন্য কেউ কেউ আসে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য।[২১] বুকুমাতোলার সঙ্গে ভারতের গোন্দ আদিবাসীদের 'ধানগরবাস্যা'র কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। গোন্দ আদিবাসীরাও ধানগরবাস্যায় এসে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। জানা যায়, গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই তারা নাকি নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে এসে আড্ডাঘরে এরূপ কাজ সমাধা করে।

পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ারও সর্বত্র আড্ডাঘর বিদ্যমান। এতদঞ্চলের ম্যারিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ইউারিতুই আদিবাসী যুবকদের মধ্যে একটি নিয়ম প্রচলিত যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও যুবতীদের নিয়ে আড্ডাঘরে রাত্রিযাপন করে এবং তাদের এই ঘর মার-কোয়েসা দ্বীপপুঞ্জের 'টি' ঘরের মতোই; তবে তফাৎ এই যে, টি ঘরে রাত্রি বেলায় মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

পলিনেশিয়ার পিলিট দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের যুবক সম্প্রদায়ের 'কাল-ডেবেকেল' নামে একটি বিশেষ সমিতি আছে। এই সমিতির সদস্যভুক্ত যুবকদের আমোদ প্রমোদ এবং হাসি কৌতুকের জন্য এক প্রকারের মিলন-কেন্দ্র বর্তমান এবং তা 'বাই' নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে যে সব আড্ডা-ঘর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, বাই সেসব থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে আশা করি।

পিলিট দ্বীপপুঞ্জের অবিবাহিত যুবকগণ তাদের পিতা মাতার বাড়ীতে অতিথি বলে পরিগণিত। কেননা, দিনের বেলায় তারা পিতামাতার সঙ্গে থেকে সাংসারিক কাজ পরিচালনা করলেও রাত্রি বেলা পৈতৃক বাড়ীতে থাকা তাদের রীতিবিরুদ্ধ এবং বাই তাদের রাত্রি যাপনের একমাত্র স্থান। প্রত্যেক বাই ঘরে একজন কিংবা একাধিক 'আরমেঙ্গল' নামে অবিবাহিতা মহিলা থাকে এবং তারা যুবক সম্প্রদায়ের সাময়িক সম্পত্তি বলে পরিগণিতা।[২২]

নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসীদের 'হোয়ারী' নামে খ্যাত আডডাঘরগুলোও যুবক যুবতীদের আমোদ প্রমোদের জন্য নির্মিত। এখানে তারা রাত্রি যাপন করে, এমনকি, তাতে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করাও মোটেই দূষণীয় নয়।[২৩]

মালয় দ্বীপপুঞ্জের জাকুন আদিবাসীদের সঙ্গে ভারতের মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের গোন্দ আদিবাসীদের অন্ততঃ একটি ব্যাপারে বেশ মিল পরিলক্ষিত হয়। তা হলো এই যে, জাকুন সম্প্রদায় গোন্দদের মত যৌন ক্রিয়া কখনো নিজের বসতবাটিতে সমাধা করে না। বয়োপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে যাতে এই গোপন মিলন অবলোকন করতে না পারে কিংবা যৌন সম্ভোগ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা না জন্মাতে পারে এ জন্যই একরূপ করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আগেও সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

সরওয়াক অঞ্চলের অরণ্যচারী মানব সম্প্রদায় ডাইয়াকদের সামাজিক নিয়ম কানুন জাকুন সম্প্রদায়ের বিপরীতধর্মী। কেননা, ছেলেমেয়ে বয়োপ্রাপ্ত হলেই তাদেরকে আর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে দেওয়া হয় না। তখন রাত কাটাবার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আডডাঘরে। এর অন্যতম কারণ হলো বাড়ীতে অবস্থান করলে তারা হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে পিতা মাতার যৌন ক্রিয়া অবলোকন করতে পারে কিংবা যৌন লিপ্সা সম্পর্কে তাদের কোন উপলব্ধি ঘটতে পারে।[২৪]

সুমাত্রার বটক আদিবাসীদের আডডাঘর 'সুপো' সাধারণতঃ যুবকদের জন্যই নির্ধারিত। যুবকগণ একে দিন ও রাত্রি উভয় অবস্থাতেই আমোদ প্রমোদের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে, তবে মেয়েদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ— এমন কথা বলা যায় না। তবে তারা রাত্রিতে সুপোতে প্রবেশ করতে পারে না। দিনের বেলায় কাপড় বুনন, হস্তশিল্পকর্ম এবং অন্যান্য সাংসারিক

সৌখিন কাজ সমাধা করার জন্য স্নুপোতে গমন করে। তাদের মধ্যে অবৈধ মিলনের কথা সাধারণতঃ শোনা যায় না। অনুরূপভাবে সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের 'নুহু', ফ্লোরেন্স অঞ্চলের 'রোমালুলি', কেই দ্বীপপুঞ্জের 'রোয়েমাহ কোম্পানী', কিমুর এলাকার 'উমালুলিক' এবং ফরমোসা দ্বীপপুঞ্জের 'পালংঘান' নামে খ্যাত আড্ডাঘরসমূহএ একই উদ্দেশ্যে নির্মিত এবং ব্যবহৃত হয়।[২৫]

আন্নাম এবং সীয়াম অঞ্চলের মুই এবং খা আদিবাসীদের আড্ডা ঘরসমূহের সঙ্গে ইতিপূর্বে বর্ণিত বুকুমাতোলা, পুতুমা এবং ধানগরবাস্যা ইত্যাদি ধরনেব আড্ডাঘরের সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুই এবং খা আদিবাসীদের আড্ডাঘরে যুবক সম্প্রদায় আনন্দ কৌতুক সময় কাটালেও অবিবাহিতা মেয়েদের সেখানে আসতে দেওয়া হয় যৌনলিপ্সা পরিতৃপ্ত করতে।[২৬]

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লুজন অঞ্চলের ইগোরোট আদিবাসীদের সম্প্রদায়-ভুক্ত পুরুষ ও নারীদের আড্ডাঘর যথাক্রমে পাহাফুনান এবং ওলাগ নামে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলে পাহাফুনান দিনের বেলায় ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিপালনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রাত্রিবেলায় অবিবাহিত যুবকগণ সেখানে গান বাজনা, নৃত্য গীত এবং হাসি ঠাট্টায় লিপ্ত থাকে। তবে সেখানকার পাহাফুনান এবং ওলাগ কোনটাতেই অসৎ কর্ম, অবৈধ আচরণ কিম্বা অশ্লীলতাজনিত কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ. ই. জেংস উল্লেখ করেছেন যে, ইগোরোটদের মনুষ্যত্ববোধ খুব প্রবল এবং এজন্য মেয়ে পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকেরই সতীত্ব ও চারিত্র্যগুণ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।[২৭]

ইগোরোটদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবার্ট ব্রিফল্ট প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মেয়ের এবং ব্লুমেনট্রিট-এব যুক্ত বিবৃতির উল্লেখ করে বলেন যে, লুজন অঞ্চলের ছেলে ও মেয়ে উভয়েই যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়। প্রত্যেক গ্রামেই দুটো করে বৃহৎ আকারের ঘর বিদ্যমান—তার একটিতে ছেলেরা এবং অপরটিতে মেয়েরা রাত্রি যাপন করে। যুবক ও যুবতীদের ঘর তত্ত্বাবধানের জন্য যথাক্রমে একজন বৃদ্ধ ও একজন বৃদ্ধাকে নিযুক্ত করা হয়। তারা ঘর তত্ত্বাবধান ছাড়াও আরও কড়া নজর রাখে এই জন্য যে, কোন ছেলে বা মেয়ে কোনক্রমেই যেন ঘর

থেকে বের হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ না করতে পারে। এই কড়া শাসনের মারাত্মক পরিণতি লক্ষ্য করে রবার্ট ব্রিফল্ট আরও উল্লেখ করেছেন যে, ইগোরোট যুবতীরা কড়া শাসনের নিষ্পেষণে অনেক সময় যৌন-বিকারগ্রস্তা হয় এবং শেষ পর্যন্ত কামলিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে বানরের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।[২৮]

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। ইগোরোটদের সামাজিক বিবর্তনও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো। মনুষত্ব-বোধ ও চারিত্রিক গুণ এককালে যা তাদের গর্বের বস্তু ছিল কালের বিবর্তনে তাতেও আজ ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। রবার্ট ব্রিফল্ট, মেয়ের, ব্লুমেনট্রিট, জেংকস প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ ইগোরোটদের সম্পর্কে যা লক্ষ্য করেছেন তার সম্পূর্ণ উল্টো পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছেন আর. এফ. বার্টন প্রায় চল্লিশ বছর পরে। বার্টন দীর্ঘদিন ইগোরোটদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে বলেন যে, সমগ্র পার্বত্যভূমিতে প্রায় গ্রামেই এমন ধরনের কতকগুলো ঘর আছে যেসবকে বিয়ের পরীক্ষা ঘর বলে অভিহিত করা যায়। চার বছর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সব ছেলেমেয়ে এইসব ঘরে আডডা দেয়, এমনকি, রাত্রিও যাপন করে। যুবকগণ যুবতীদের আডডা ঘরের নিকটবর্তী হয়ে বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমে আহ্বান জানায় এবং অতঃপর জোড়ায় জোড়ায় আরণ্য অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।[২৯] বার্টন সাহেব এই বলেই নিরস্ত হন নি। তিনি অন্যত্র আরও মন্তব্য করেছেন যে, পাহাফুনান কিংবা ওলাগে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের অবাধে মেলা মেশার জন্যে যদি কোন যুবতী গর্ভবতী হয় তবে সেই যুবতী কালবিলম্ব না করে তার দয়িতার কাছে এই ঘটনা বলে দেয়। যুবতীটিকে খুব উল্লসিত মনে হয়। কেননা, সন্তান হওয়ার লক্ষণই তার হৃদয় মন আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। সন্তান কামনা নারীর মনের পরম আর্তি এবং এটাই তার উল্লাসের কারণ। যদি সেই যুবক তাকে বিয়ে নাও করে তাতেও তার অনুতপ্ত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, অন্য যে কোন যুবক এই ভেবে পরিতৃপ্ত হয়ে তাকে বিয়ে করবে—প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্যে এটা প্রমাণিত যে তার আছে সন্তান ধারণের ক্ষমতা এবং তার মধ্যে আছে প্রচুর সারবস্তু।[৩০]

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল অঞ্চলের রোরোরো আদিবাসীদের আডডা-

ঘর 'বাহিত্তু' কেবলমাত্র পুরুষদের ব্যবহারের জন্যই নির্মিত। তাদের মধ্যে একটি নিয়ম প্রচলিত যে, ছেলেদের বয়স সাত আট বছর হলেই তাদেরকে বাহিত্তুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই তারা অবস্থান করে। অবশ্য, মাঝে মাঝে এসে পিতা মাতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। বাহিত্তু আসলে তাদের শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে ছেলেরা লেখাপড়া, কাপড় বুনানো, যুদ্ধ কৌশল, নৃত্য গীত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বাহিত্তুতে একজন করে নেতা থাকেন। তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের সকল কাজের তদারক করেন, এমন কি ভবিষ্যৎ কর্মসূচীও তিনি নির্ধারিত করে দেন। এই কারণে বাহিত্তুকে আডডাঘর না বলে বরঞ্চ শিক্ষালয় বলাই সমীচীন। এমন যে সৎ প্রতিষ্ঠান, এখানেও মেয়েদের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্ময়কর বটে। বছরের কোনও কোনও নির্দিষ্ট দিনে বাহিত্তুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোজ উৎসব পালন করা হয়। তখন যুবকগণ কুমারী মেয়েদের চুরি করে এনে সেই নির্দিষ্ট দিনে বাহিত্তুতে রাখে এবং তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। যেসব মেয়ে পিতৃ মাতৃহীনা, তাদেরকেই সাধারণতঃ চুরি করা হয়। বোরোরোদের মধ্যে আরও একটি নিয়ম প্রচলিত যে, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয় এবং এটা প্রমাণিত হয় যে সেই স্ত্রী চরিত্রভ্রষ্টা তবে সেই নষ্টা মহিলাকে বাহিত্তুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট রাত্রিতে যুবকদেরকে ভোগ করার জন্যে।[৩১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হাটন ওয়েবস্টার দীর্ঘদিন মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার আদিবাসীদের সান্নিধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাদেরও আডডাঘর আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ গ'তেমা অধিবাসীদের ক্যালেপুলে নামক ঘরগুলোর উল্লেখ করা যায়। ক্যালেপুলেকে একই সঙ্গে আডডারঘর এবং শিক্ষা কেন্দ্র—উভয় নামেই চিহ্নিত করা যায়। কেননা, দিনের বেলায় যুবকগণ এখানে নানারূপ শিক্ষা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে সামরিক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয় অধিক মাত্রায়। যুদ্ধপ্রিয় গ'তেমা যুবকগণ ক্যালেপুলেতে শিক্ষালাভ করে সুনিপুণ যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হয়। অপরপক্ষে, রাত্রি বেলায় যুবকগণ ক্যালেপুলেকে চিত্ত বিনোদনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে ব্যবহার করে।[৩২]

ব্রিটিশ গড়োয়াল এবং আলমোড়া অঞ্চলে ভুটিয়াদের আড়ম্বর র‍্যামবাংগ নানা কারণে উল্লেখের দাবী রাখে। ভুটিয়াদের সামাজিক জীবনের পূর্ণ চিত্র র‍্যামবাংগকে কেন্দ্র করেই চিত্রিত। ইতিপূর্বে আমরা পৃথিবীর যেসব আড্ডাঘর সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে আড্ডাঘরে বিবাহিতা মেয়েদের রাত্রি যাপনের কোন নজীর পাই নি। কিন্তু ভুটিয়াদের র‍্যামবাংগ এদিক দিয়ে অনন্য এবং রোমাঞ্চকর জীবন যাত্রার পরিচয় বহন করে। ছেলেমেয়ে, যুবক যুবতী এবং বিবাহিত অবিবাহিত নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যামবাংগ-এ গমন করে। বিবাহিতা মহিলারা সন্তান হওয়ার আগ পর্যন্ত র‍্যামবাংগ ছেড়ে কখনো বাড়ীতে ঘুমায় না। মেয়েদের বয়ঃসীমা দশ বছরে পেঁছুলেই তারা র‍্যামবাংগ-এ ঘুমুতে থাকে এবং অবাধ মেলামেশার শিকার হয়। ফলে সতীত্বগুণ তাদের মধ্যে একরূপ অনুপস্থিত। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ সি. এ. শেরিং ভুটিয়াদের সমাজ জীবনের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এতদঞ্চলের বিশেষ করে দরমা পরগণায় সতী সাধ্বী রমণী একরূপ অজ্ঞাত বলা চলে।[৩৩] যাহোক, অবাধ মেলামেশার মুক্ত রীতি তাদেরকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, যে কোন প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্য করে থাকবেন, একজন পুরুষ অন্য একজন নারীর কোমর জড়িয়ে কিংবা একই চাদরের নীচে হাত ধরাধরি করে নারী পুরুষ হাসিমুখে রাস্তা চলছে। ইউরোপীয় অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রী মিলে রাস্তায় অনুরূপভাবে চলাফেরা করলেও প্রতীচ্যে এর নজির মেলা ভার ছিল। কিন্তু অনুন্নত ভুটিয়া সমাজ সে রীতি যথার্থই খণ্ডন করেছে।

এতদঞ্চলের বড় বড় গ্রামে একাধিক র‍্যামবাংগ বর্তমান। ইতিপূর্বে র‍্যামবাংগ-এর যে সব বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেসব ছাড়াও কতকগুলো সামাজিক নিয়ম এখানে প্রতিপালন করা হয়। তন্মধ্যে একটি রীতি উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয়। যেহেতু যুবক যুবতীদের মিলন কেন্দ্র র‍্যামবাংগ, সেহেতু তাদেব বিয়ে শাদী এখানেই সমাধা করা হয়। এবং এই বিয়ে অনুষ্ঠানে ছেলে বা মেয়ের বন্ধু বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করার ভঙ্গিটি বড় চমৎকার। যদি মেয়েরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের তাদের ছেলে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে একদল মেয়ে রাস্তায় বের হয়

এবং তাদের মধ্য থেকে দু'জন মেয়ে একটি লম্বা কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরে দোলাতে থাকে এবং বিশেষ শ্রেণীর গান পরিবেশন এবং মুখ দ্বারা সীৎকার দিতে থাকে। তখন ছেলেরা এই ইঙ্গিত বুঝে এবং বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গ নেয়। অনুরূপভাবে ছেলেরা যদি মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে চায় তবে তারা রাস্তায় বেরিয়ে মুখ দ্বারা বাঁশীর আওয়াজ তোলে এবং এই বিশেষ বিশেষ শব্দ মেয়েদের কানে পেঁছুতেই তারা আগুনের মশাল হাতে বেরিয়ে আসে। যদি তারা পূর্ব পরিচিত থাকে তবে র‍্যামবাংগ-এর সম্মুখস্থ মাঠে মশাল হাতে নিয়ে বসে—হাসি তামাশায় মত্ত হয় এবং এইভাবে রাত কাটিয়ে দেয়। আর যদি পূর্ব পরিচিত না থাকে তবে ছেলেরা একদিকে বসে এবং মেয়েরা মুখোমুখি হয়ে ভিন্নদলে বসে গল্প গুজবে নিমগ্ন হয়। এমন পরিবেশে কখনো কখনো তাদেরকে নৃত্য গীতেও অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। নৃত্যের সময় মদ্য পান এবং ধূমপান তাদের আনন্দ উৎসবেরই অঙ্গ। পরিশ্রান্ত না হওয়া বা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তাদের এ অনুষ্ঠান চলতেই থাকে।

কিন্তু ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার[৩৪] র‍্যামবাংগ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং এর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে একে মুসাফিরখানা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হান্টারের মতে প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক র‍্যামবাংগ আছে। দূরদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। তবে তাদেরকেই সাধারণতঃ আশ্রয় দেওয়া হয়—যারা গ্রামবাসীর পরিচিত, আত্মীয় স্বজন। অপরিচিত লোককে অভ্যর্থনা করা কিংবা র‍্যামবাংগ-এ রাত্রি যাপন করার অধিকার দেওয়া হয় না। অন্যান্য আডডাঘরের মত র‍্যামবাংগও নানারূপ নিয়ম কানুনের অধীন এবং এখানেও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নেতা বা সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

আফ্রিকার প্রায় সব অঞ্চলেই আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে বিভিন্ন শ্রেণীর আডডা ঘর। এইসব ঘরের সঙ্গে এই উপমহাদেশের ঘরগুলোর কোন কোনটার সাদৃশ্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। পূর্ব আফ্রিকার বাসুতু, উইগেণ্ডু, ইউনামবেসী প্রভৃতি আদিবাসী সমাজভুক্ত যুবকেরা ইওয়ানজা নামক আডডাঘরকে তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন প্রবাহের উৎস হিসেবে সাব্যস্ত

করে। ইওয়ানজা কেবল যুবক সম্প্রদায়ের জন্যই নির্দিষ্ট এবং তারা এখানে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত শিক্ষা ছাড়াও ধর্মীয় এবং সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করে। তদুপরি ইওয়ানজা সংলগ্ন সম্মুখস্থ বিস্তৃত মাঠ তাদের নৃত্য গীতি বা খেলাধূলার আশ্রয়স্থল। উল্লেখযোগ্য যে কঙ্গো অঞ্চলের ওয়াপকুমু আদিবাসীদের ইওয়ানজাগুলো একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সেখানে যুবকদেরকে সামরিক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশী। এখান থেকে প্রত্যেকটি যুবককে সামরিক কলা কৌশল শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত সৈন্যরূপে গড়ে তোলা হয়; সেক্ষেত্রে এতদঞ্চলের ইওয়ানজাকে আড্ডা ঘর না বলে সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র বললেই অধিকতর ভালো হয়।

আফ্রিকার বারি সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী যুবক যুবতীদের আড্ডা ঘরগুলো ইওয়ানজা থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এগুলোকে আড্ডা ঘর না বলে বাসগৃহ বললেই যুক্তিসঙ্গত হয়। বারি ছেলে মেয়েরা শিশুকাল অবধি পিতা মাতার সংসারে থাকে; কৈশোরে পৌঁছুলেই তাদের আশ্রয়স্থল হয় মেষ ভেড়া ছাগল ইত্যাদির বাস গৃহ এবং বয়োপ্রাপ্ত হলেই তারা নিজেদের বাস উপযোগী গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে এবং এগুলোই তাদের বাসগৃহ বা আড্ডা ঘর—যে নামেই চিহ্নিত করা হোক।[৩৫]

আফ্রিকার আদিবাসীদের আড্ডাঘরগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র বা দুর্গের ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত ববেন্দা আদিবাসীদের 'টুণ্ডু' ঘরসমূহের উল্লেখ করা যায়। এক কথায় টুণ্ডু ববেন্দা যুবকদের সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র বা সুরক্ষিত দুর্গ। এই ঘর তৈরী করা হয় আদিবাসী প্রধানদের বাসস্থানের সম্মুখস্থ বিস্তৃত ভূমিতে। এতে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হয়। প্রথমতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে ঘরটি দুর্গের কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ টুণ্ডুতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি সৈনিক যেন আদিবাসী প্রধানদের এক একজন দেহরক্ষী। মেয়েরাও টুণ্ডুতে শিক্ষালাভ করতে পারে। ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে তাদেরকে ডোম্বা নামক বিশেষ এক শ্রেণীর ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। ডোম্বাতে এসে তাদের জীবনধারা অন্য এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। কেননা, এখানে এসে তারা বিয়ে সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা এবং সন্তান জন্মদান পদ্ধতি সম্পর্কে ডোম্বা শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে। ডোম্বার শিক্ষা সমাপ্ত হলে কোনও

নির্দিষ্ট রাত্রিতে পাইখন নৃত্যের আয়োজন করা হয়। এই নৃত্য আর কিছুই নয়—বিয়ের পূর্ব মুহূর্তের মহড়া মাত্র। ডোম্বাতে অবস্থানকারী যুবক যুবতীরাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের অনেকের মধ্যেই বিয়ে কর্ম সম্পাদিত হয়। সকালবেলা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেমিক প্রেমিকা বা যুগল দম্পতি চাদরের নীচে মুখোমুখি হয়ে অনুষ্ঠানের অন্যতম সূচী পালন করে।[৩৬]

কেনিয়ার লুগওয়ারী ও কিপসিকা আদিবাসী সমাজভুক্ত যুবক যুবতীদের আড্ডা-ঘর যথাক্রমে আডরুজু ও সিগুরয়নে নামে খ্যাত। ভারতের মধ্যপ্রদেশের বাষ্টার স্টেট-এর মুরিয়াদের গোতুলের সঙ্গে একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে আডরুজু ও সিগুরয়নে-এর মিল আছে। মুরিয়াদের মত লুগওয়ারী এবং কিপসিকা সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক যুবতী তাদের আড্ডাঘরে সমবেত হয়ে হাসি ঠাট্টা, নৃত্য গীত এবং অন্যান্য চিত্ত বিনোদন কর্মে লিপ্ত হয় বটে ; কিন্তু যৌন ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান কোনক্রমেই আডরুজু কিম্বা সিগুরয়নে নয়। তাছাড়া কুমারী মেয়ের সতীত্ব রক্ষার্থে সেখানকার যুবকগণ খুবই সচেষ্ট। অপরপক্ষে নিজেদেরকেও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে তারা প্রয়াসী। এই কারণে ব্যাভিচার, অশ্লীলতা এবং অসৎ আচরণের কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবতা-বোধ ও চারিত্র্যগুণে তারা মহীয়ান।[৩৭]

আফ্রিকার মাসাই আদিবাসীরাও অন্যান্যদের মতো আড্ডাঘর জীবন যাপনের পক্ষপাতী। তাদের আড্ডাঘর 'মৈনি আট্টা'র সঙ্গে নান্দীদের আড্ডা ঘরের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নান্দীদের মতো মাসাইদের মৈনি আট্টাও সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং যোদ্ধারা সেখানে কখনো সাময়িক-ভাবে কখনো বা দীর্ঘদিনের জন্য অবস্থান করে। মৈনি আট্টাতে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ না হলেও যেসব মহিলা সেখানে গমন করে, তারা যোদ্ধাদের মুরুব্বী শ্রেণীর এবং তাদের কাছ থেকে যোদ্ধারা আদর যত্ন এবং স্নেহ পেয়ে থাকে। কারণ, যে সব মহিলার আবির্ভাব সেখানে ঘটে, তারা যোদ্ধাদের হয় মা, না হয় মায়ের কোন বিবাহিতা বৃদ্ধা সখী।[৩৮]

উপরে এই উপমহাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবন ধারার অন্যতম উৎস আড্ডাঘরসমূহ সম্পর্কে সামান্য পরিচয় পেশ

করা হলো। এ সবের মধ্যে কোন কোনটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধান করা হলেও অধিকাংশ আডডাঘরের কর্মপদ্ধতিতে যৌন মিলনের প্রাধান্যই লক্ষ্য করবার মতো। কেননা এইসব আডডা-ঘরেব অধিকাংশই 'যৌন-শিক্ষার দক্ষতালাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব ঘবের দেওয়ালের চারদিকে নানারকম চিত্র অঙ্কিত ও খোদিত থাকে। অনেক স্থলেই এই চিত্র যৌন অর্থব্যঞ্জক। মাঝখানে কাঠের খুঁটির গায়ে বৃহদাকার স্ত্রী-যোনি খোদিত থাকে। কোনো কোনো স্থানে প্রকাণ্ড পুরুষাঙ্গ, আবার কোথাও বা এক তরুণ আবেক তরুণীকে আলিঙ্গন করে ধরে আছে। এই ধরণের চিত্র ও ভাস্কর্যাদি যে বিশেষ অর্থবহ তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে না।'[৩৯]

আডডা-ঘর কেন্দ্রিক অবাধ মেলা-মেশার ফলশ্রুতি যৌন-কর্ম বৈগাদের মধ্যে যে কতো প্রকট তা নিম্নোদ্ধৃত ইংগীতপূর্ণ মন্তব্যে স্পষ্ট বলে মনে হয়: **'The sowing of the the seed is the happiest moment in one's life—how should one resist it ?'[৪০]**

ডক্টর ফার্থের মতে টিকোপিয়াদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা তো দূরের কথা অবাধ যৌন-কর্মেও কোনো বাধা নেই।[৪১] আফ্রিকার থোংগা আদিম সমাজের মধ্যে একই নিয়ম প্রচলিত।[৪২] প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হাইন্‌স ডক্টর মারগারেট মীডের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, সামোয়া আদিম সমাজের মধ্যেও অবাধ মেলামেশা ও অবাধ যৌনকর্মের উল্লেখ আছে এবং এসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আডডাঘরে ঘটে।[৪৩]

আবহমান কাল থেকেই আদিবাসী সমাজ যৌন সম্পর্ককে বেশ উদার মনোভাব নিয়ে দেখে আসছে। কেননা, যৌন সম্পর্ককে তারা খাদ্য ও পানীয়ের চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং সে যৌন সম্পর্কিত প্রেমধারার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনাদর্শের পূর্ণরূপ। এই ব্যাপারটি সঙ্কীর্ণ মনে না নিয়ে একটু উদার মনোভাবের দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলে আদিবাসীদের কোনক্রমেই দায়ী করা চলবে না। এ প্রসঙ্গে **B. Malinowski**-এর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:..................**The native treat sex in the long run not only as a source of plesure, but, indeed, as a thing serious and even sacred. Nor**

do their customs and ideas eliminate from sex its power to transform crude material fact into wonderful spiritual experience, to throw the romantic glamour of love over the technicalities of love-making.[৪৪]

এসব লক্ষ্য করেই আদিবাসী সমাজে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য আড্ডাঘরের প্রচলন করেছে এবং এর ব্যবহার যে অনন্তকাল পর্যন্তও চলবে সে অনুমান আমরা করতে পারি। তাদের সমাজ জীবনে এখনো এমন সব কর্মধারার পরিচয় পাওয়া যায়—যা আধুনিক শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে অন্তর্হিত এবং এ কারণেই তাদেরকে আদিম সমাজভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। এবং সে কর্মধারাসমূহের মধ্যে অবাধ মেলামেশা এবং যৌন সম্পর্ক অন্যতম। সভ্য সমাজের কাছে যেটা অশ্লীল, তাদের কাছে হয়ত সেটাই শ্লীলতার নামান্তর।

আধুনিক শিক্ষিত ও সভ্য সমাজও কি তাদের অবচেতন মন থেকে অনেক আদিবাসী প্রভাব বিদূরিত করতে সমর্থ হয়েছে? কোথাও যাত্রা-কালে টিকটিকির বাধা কিংবা পিছু ডাক অথবা হাঁচির অশুভ লক্ষণও অনেক শিক্ষিত লোক উপেক্ষা করতে পারে না। এমনকি, অনেক শিক্ষিত লোকের ছেলে মেয়ের কপালের কোণে আদিবাসীদের অন্যতম বিশ্বাস সম্পৃক্ত অপদেবতার কুনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার চিহ্ন কালির দাগ অঙ্কন করতেও দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ক্লাব ঘর, নাট্যশালা, কীর্তন ঘর ইত্যাদি চিত্তবিনোদন কেন্দ্র কি আদিবাসীদের আড্ডা ঘরসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয় না?

৩.

ইতিপূর্বের আলোচনায় আড্ডা-ঘর, অবাধ মেলামেশা এবং অবাধ মেলামেশা জনিত গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এমনকি অবাধ মেলামেশার জন্য যদি কোন যুবতী গর্ভবতী হয় তবে সেক্ষেত্রে দুষ্কর্মকারী যুবককে যে সেই যুবতী বিয়ে করতে হয় এরূপ ইংগীতও দেওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কেননা, অবাধ মেলামেশার জন্য যুবতী গর্ভবতী হলে ধারণা করা হয় যে, দেবতার অনুগ্রহে এরূপ ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে মনে করা হয় যুবতীর মধ্যে রয়েছে সারবস্তু এবং সে তখন সমাজের আদরের পাত্রী ও তার সন্তান দেবতার দান। প্রসঙ্গতঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঙ্খো ও বনযোগীদের এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পাহফুনান ও ওলাগে আদিবাসীদের নাম করা যায়। পাঙ্খো ও বনযোগীদের মধ্যে যদি কোন অবিবাহিত মেয়ে গর্ভবতী হয় তবে মনে করা হয় যে খোজিং দেবতার অনুগ্রহে এরূপ হয়েছে এবং সেই সন্তান তখন 'খোয়াবং' বা সিদ্ধপুরুষ অথবা সাধ্বী রমণী বলে খ্যাত। সমাজে তার উচ্চস্তরের স্থান। অনুরূপ পাহফুনান এবং ওলাগে আদিম সমাজ গর্ভবতী রমণীকে মনে করে যে, তার আছে সারবস্তু—সন্তান ধারণের ক্ষমতা। এ জন্যে সে সমাজে আদরনীয়া, সম্মানের পাত্রী।

যৌন ক্রিয়ায় যে নারী গর্ভবতী হয় প্রাথমিক অবস্থায় এই বিশ্বাস আদিবাসী সমাজে ছিল না। তাদের ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, গাছের পাতা, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যজনিত ব্যাপার থেকেই নারীদের গর্ভের সঞ্চার হয়।

তাছাড়া অপদেবতা বা দেবতার সঙ্গম রীতির কারণেও গর্ভ সঞ্চার হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই কুকীদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, তাদেব সমাজের বয়স্কা মেয়েরা একাকী বিশেষ করে দুপুর বেলা কিংবা সন্ধ্যাবেলা গহীন অরণ্যে গমন করে না। তাদের বিশ্বাস অপদেবতারা তাদের উপর 'আসর' করতে পারে। ফলে তাদের গর্ভের সঞ্চার হতে পারে। তাছাড়া ঋতুস্রাবও নাকি অপদেবতাদের স্পর্শেই সংঘটিত হয় বলে তাদের বিশ্বাস।

অনুরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। অরু দ্বীপপুঞ্জের (Aru Islands) মেয়েরা বুইতাই ('Boitai) অপদেবতার ভয়ে গহীন অরণ্যে একাকী প্রবেশ করে না। তাদের বিশ্বাস এই দেবতার কেপানলে পড়লে হয় তাদের গর্ভবতী হতে হবে, না হয় ঋতুবতী হতে হবে। বুইতাই দেবতার জবরদস্তীমূলক সঙ্গমই নাকি ঋতুস্রাবের কারণ।[১]

একই বিশ্বাস ওয়েতার (Water), আমবুনিয়া (Ambonia), ইউ-লিয়াসার (Uliasser) অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। তাদের ধারণা কুলুআনটেলুস (Kiuantelus) নামক অপদেবতাই গহীন অরণ্যে নারীর সান্নিধ্যে আসলে সেই নারী গর্ভবতী হয়।[২]

মেয়েদের ঋতুবতী হওযাব সময়কালেই অপদেবতার প্রভাব বেশী পড়তে পারে এই বিশ্বাসেই পৃথিবীর অধিকাংশ আদিম সমাজ তাদেরকে ঋতুবতী সময়কালে পবিবাবেব অন্যান্যদের থেকে পৃথক কবে রাখে। এজন্য কোন কোন আদিবাসী সমাজে আলাদা ঘরও তৈরী করে দেওয়া হয়। আলাদা ঘবে থাকাকালীন তাবা সূর্যের আলো পর্যন্ত দেখতে পারে না। কেননা, তাদের বিশ্বাস সূর্যরশ্মিও গর্ভসঞ্চাব করতে সমর্থ হয়। ফ্রেজার বর্ণিত ইতিহাস খ্যাত দানে (Danae)-এর কাহিনী এর উল্লেখ-যোগ্য প্রমাণ।[৩] এমনকি আগুনেব প্রতি দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ। আগুনের তেজ থেকেও গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা।[৪]

গ্রীনল্যাণ্ডবাসী (Greenlanders)-দের ধারণা চন্দ্রেব আলোক সংযোগেও নারীরা গর্ভবতী হতে পাবে।[৫] যেহেতু মেয়েদের ঋতুস্রাবের সঙ্গে চন্দ্রেব যোগ আছে সেহেতু চন্দ্রের আলোক সংযোগে মেয়েরা গর্ভবতী হবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।[৬]

যেহেতু চন্দ্র এবং সর্পের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে সেহেতু সর্পের প্রভাবেও নারীরা গর্ভবতী হতে পারে। অবশ্য, সেক্ষেত্রে মানব-সন্তানের প্রসবের চেয়ে সর্প প্রসবই ঘটে থাকে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই-কুকীদের মধ্যে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীটি এইরূপ :

'চুআং চিলি নামে এক মেয়ে ছিল। সে তার বাবার 'জুম' ক্ষেতে কাজ করতো। জুম ক্ষেতের অভ্যন্তরে এক সাপ বাস করতো। সে চুঅংচিলিকে অত্যধিক ভালোবাসতো। চুঅংচিলি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে জুম কাজে গমন করতো। ছোট বোনের প্রতি নির্দেশ ছিল সর্পটিকে আহ্বান করার। এবং আহ্বান করতেই সর্পটি চুঅংচিলির কোলে এসে বসতো। ছোট বোন সর্পটিকে ভীষণ ভয় করতো এবং ঘুণাক্ষরেও এই কথা তার বাবার কাছে বলতো না।

জুম কাজে যাওয়ার সময় তার বাবা গামছায় বেঁধে তাদের জন্য খাবার দিতো। কিন্তু সাপের ভয়ে ছোট বোন কিছুই খেতে পারতো না। চুঅং চিলি এবং সর্পটি মিলে সব খাবার আনন্দের সঙ্গে খেয়ে ফেলতো। না খেতে পেয়ে ছোট বোন ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকলো। একদিন তার বাবা বললো, 'হে আমার ছোট কন্যা, তুমি দিন দিন কেন এমন শুকিয়ে যাচ্ছো?'

ছোট মেয়ে বললো, 'বাবা, একথা তোমাকে বলতে পারবো না। আমার বলতে ভীষণ ভয় করে।'

বাবা বলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সে বলতে থাকলো : 'বাবা, আমার বোন চুঅংচিলি একটি সাপের সঙ্গে প্রেম করে মত্ত থাকে। জুম ক্ষেতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে সাপটিকে ডাকতে বলে। আমি ডাক দিতেই সাপটি এসে চুঅংচিলির কোলে বসে এবং তখন দু'জনে বেশ আমোদ-স্ফূর্তি করতে থাকে। তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে দূরে সরে থাকি। তখন ওরা আমার কথা বেমালুম ভুলে যায়। সমস্ত খাবার দু'জনে খেয়ে ফেলে। কাজেই আমি শুকিয়ে যাচ্ছি।'

একদিন চুঅংচিলিকে বাড়ীতে আটকে রাখা হলো। বাবা তার ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জুমক্ষেতে গেলো। আর বাবা চুঅংচিলির

পোষাক পরে ছদ্মবেশ ধারণ করলো। এবং সে আড়ালে রাখলো একটি ধারালো দা। আগের নিয়ম মতো ছোট বোন সর্পটিকে ডাক দিতেই সেই সাপ তাড়াতাড়ি এসে, ছুঅংচিলিকে মনে করে তার বাবার কোলে আশ্রয় নিলো। বাবা সঙ্গে সঙ্গে দা দিয়ে এক কোপে সাপটিকে দুই খণ্ড করে ফেললো!

পরের দিন ছুঅংচিলি তার ছোট বোনকে নিয়ে জুমক্ষেতে গেলো। ছোট বোন বার বার সাপটিকে ডাকতে থাকলো কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কারণ তাদের বাবাতো তাকে হত্যা করে ফেলেছে!

তারা বাড়ীতে ফিরে এলো। এসে দেখে তাদের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছুঅংচিলি বাবাকে ডাকতে থাকলো। কিন্তু বাবা তখন একে তো অসুস্থ তদুপরি রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে আছে। ছুঅং চিলি ঘরে পা দিতেই বাবা তাকে দা দিয়ে এক কোপে দ্বিখণ্ড করে ফেললো। কিন্তু আশ্চর্য! দেখা গেল ছুঅংচিলির পেট থেকে বেরিয়ে আসছে সাপের শত শত ছোট ছোট বাচ্চা।.........'[৭]

সর্প কর্তৃক যে নারীরা গর্ভবতী হতে পারে রবার্ট ব্রিফল্টও তা উল্লেখ করেছেন। নারীরা যেমন চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি সাপের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। দক্ষিণ ইটালীর আদিম সমাজের ধারণা সাপের সঙ্গে মেয়েরা প্রেমলীলায় লিপ্ত হয় এবং তাতে গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। জার্মানীর আদিম সমাজের বিশ্বাস রাত্রে মেয়েরা ঘুমিয়ে থাকলে সর্প তাদের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে, ফলে তারা গর্ভবতী হয়।[৮] এমন কি হিন্দু শাস্ত্রেও উল্লেখিত আছে যে, গোখুরা সাপের পূজা করলে সন্তান লাভের সম্ভাবনা আছে।

যৌন-ক্রিয়া ছাড়াও যে কুমারী মেয়েরা গর্ভবতী হতে পারে এমন নজীর পৃথিবীর বহু ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। ঋগ্বেদের একটি ঋকে জানা যায়, 'পৃথুশ্রবসি কানীতে' অর্থাৎ কুমারী কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবসি। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র। তার অনেক আগে থেকেই বৈদিকজনের মধ্যে বিবাহের পূর্বে কুমারী কন্যাদের সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। কুমারী মেয়ের গর্ভে সন্তান প্রসবই শুধু নয়, সেই সন্তানকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রমাণও রয়েছে বহু। "ব্যাবি-

লনীয়দের রাজা প্রথম সারগণ এনিটু নাম্নী কুমারী জননীর গর্ভজাত হলেও সমাজের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। বুদ্ধজননী মায়াদেবীও স্বামী সহবাস ছাড়া স্বপ্নে হস্তী দর্শনান্তে গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবকে প্রসব করেছিলেন। মিশরদেশের কুমারীদেবী আইসিস হোরাসকে প্রসব করেন। মিশরের সিরিসিসে নিথ নাম্নী জনৈকা কুমারীর গর্ভজাত সন্তান। গ্রীসের বেকাস জন্মগ্রহণ করেন সেমিলি নাম্নী কুমারীর গর্ভে। কুমারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নেপথ্য কাহিনী নিশ্চয়ই বিবাহের পূর্বে যৌন সংসর্গ। বিবাহের পূর্বে যৌন-সংসর্গের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী কালের সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুমারী মাতাদের উপর নানা প্রকার অলৌকিক কীর্তিকথা চাপান হয়েছে।[১]

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিম সমাজের কুমারী মেয়েরা স্বামী-সহবাস ছাড়াও গর্ভবতী হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে দেবতা অপদেবতা কিংবা মুনিঋষিদের অলৌকিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল। অনুরূপ নজির হিন্দুশাস্ত্রেও বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের জন্মরহস্যের উল্লেখ করা যায়। ব্যাসের মাতা সত্যবতী কুমারী অবস্থায় যমুনায় পাটনীর কাজ করতেন। একদিন খেয়া পার হওয়ার সময় পরাশর মুনি তাঁর রূপযৌবনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন কামলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য। সত্যবতী ভেবে পেলেন না কি করে পরাশর মুনিকে সন্তুষ্ট করবেন। অতঃপর পরাশর মুনিই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি অলৌকিক মন্ত্র বলে এমন কুয়াশার সৃষ্টি করলেন যে সব অন্ধকার হয়ে গেলো। তখন দু'জনের মিলনে কোনো বাধা থাকলো না। এভাবেই জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস। পরাশর মুনি সত্যবতীকে বর দিলেন এই বলে যে, এতোসবের পরেও তিনি পৃথিবীতে কুমারী বলে কীর্তিতা হবেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত কুন্তীর ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। দুর্বাশা মুনির বরে কুন্তীও সতীত্ব নিয়ে কুমারী হয়ে টিকে থাকলেন। অথচ তাঁর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কর্ণ। মহাভারত খ্যাত সতীসাধ্বী পঞ্চ কন্যার অন্যতমা এই কুন্তী। অপরদিকে পঞ্চকন্যার আরেকজন দ্রৌপদীও পাঁচ স্বামীর ঘর করে সতীত্ব বজায় রেখে অমর হয়ে রয়েছেন।

যৌন-ক্রিয়া ছাড়াও যে নারীরা গর্ভবতী হতে পারে ইতিপূর্বের আলোচনায় তা স্পষ্ট। এই বিশ্বাসের দরুণ আদিম সমাজ যৌন-ক্রিয়াকে কেবলমাত্র কামকেলি হিসেবেই স্থান দিত। এর অবশ্যি কারণও আছে—কেননা পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক আদিম সমাজ আছে যারা অনাবৃত থাকে। ইচ্ছামত গমন ও বিহার তাদের নিত্য নৈতিত্তিক কাজ এবং যৌন কর্মও নিত্যধর্ম বলে বিবেচিত। যৌনকর্মই যে সন্তান উৎপাদনের কারণ এ ধারণা সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত। অনেক আদিম সমাজের ধারণা যে, তাদের পূর্বপুরুষরা যেমন অরণ্য অভ্যন্তরের গহ্বর থেকে আবির্ভুত হয়েছে তেমনিও মানব শিশু বেরিয়ে আসে যোনি-গহ্বর থেকে। এটাই হয়ত নিয়ম। যৌনক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়। এজন্যে যোনি-পূজার প্রচলন আদিম সমাজে লক্ষ্য করা যায়। মোহেনজো-দারু, হরপ্পা ইত্যাদির খননকার্যের আবিষ্কার সমূহে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে চার পাশে ফুল অঙ্কিত যোনিও পাওয়া গেছে। ফুল সন্নিবিষ্ট যোনির শিল্প-চাতুর্য যোনি-পূজারই নিদর্শন বহন করে। এমনকি ভারতের মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া, গোন্দ, হিলমারিয়া ইত্যাদি আদিম সমাজের 'গোতুল'-কেন্দ্রিক আডডা-ঘরে যেসব যোনির চিত্র সন্নিবেশিত থাকে সে সবের প্রতিও যে তারা ভক্তিমান এমন প্রমাণও যথেষ্ট রয়েছে।

হিন্দু সংস্কৃতিতেও যোনি পূজার উল্লেখ আছে। লিঙ্গ মূর্তিতে যেমন শিব পূজার নিয়ম আছে তেমনি শক্তিবোধক যোনি মূর্তিতেও শক্তি পূজার ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা, 'লিঙ্গ পুরাণের' সপ্তদশ অধ্যায়ের একটি বচনে পাওয়া যায়:

> লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাতমহেশ্বরঃ।
> তয়োঃ সংপূজনা ন্নিত্যং দেবী দেবস্য পূজিতো ।।

অর্থাৎ লিঙ্গ বেদী (যোনি) মহাদেবী ভগবতী স্বরূপ। আর লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহাদেবস্বরূপ। এই লিঙ্গ ও যোনির পূজাতে শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা হয়।'

৪.

যৌন ক্রিয়ার উদ্ভব কিভাবে ঘটল এ সম্পর্কিত আদিবাসী দর্শনতত্ত্বও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

সব আদিবাসী বিশ্বাসেই পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী ছিল ভাই বোন। ভাই বোনের যৌন সম্পর্কিত চিন্তা জঘন্যতম এবং অস্বাভাবিক ইচ্ছারই নামান্তর। সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল এক মস্তবড় অন্তরায় এবং মানসিক দ্বন্দ্ব।

এই অন্তরায় ও দ্বন্দ্ব কিভাবে তারা অতিক্রম করলো—সে সম্পর্কিত আদিবাসী ধারণার ব্যাখ্যা অতি চমৎকার ও যুক্তিসঙ্গত। আদিবাসী ভেদে তাদের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন অথচ প্রত্যেকটির অন্তরালেই রয়েছে দর্শনতত্ত্বের ইংগীত।

সাঁওতাল[১] ও কোলদের[২] যৌন ক্রিয়ার উদ্ভব সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা এক। উভয় সমাজই বিশ্বাস করে যে ভগবান মারাং বুরো ও সিংবোঙ্গা যথাক্রমে সাঁওতাল ও কোলদের আদি মানব মানবীকে মদ (rice-beer) বানানোর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।

মদ পান করে তারা উত্তেজিত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় একত্র শয়ন করলো এবং তখনই প্রথম যৌন সঙ্গমের উদ্ভব ঘটে।

ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে যৌন মিলনের পরিবেশ সৃষ্টিতে উত্তেজিত এবং অজ্ঞানাবস্থা খুবই স্বাভাবিক। কেউ কেউ বলেন মদ্য পানের ব্যাপারটিই যৌন ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রূপ।

বৈগা, বাইসন হর্ণ মারিয়া, কুরুক, ওরাওঁ, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেখিয়েছে যে, তাদের আদি মানব মানবী অর্থাৎ ভাই বোন কেউ কেউ এক যুগেরও অধিক কাল পৃথকভাবে থাকার পর একত্র হয়ে একজন অপরজনকে চিনতে পারেনি, অতঃপর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে।

আবার বুন্দু প্রভৃতি আদিবাসীদের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের আদি মানব মানবী বসন্ত কিংবা কুষ্ঠ রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর চেহারা পাল্টে গেছে; ফলে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি। এমতাবস্থায় তারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে।

ভীলদের মতে পাহাড় পর্বত অরণ্য পরিভ্রমণ করার পর তাদের আদি মানব মানবী একত্র হলে ভগবান নারীটিকে পশ্চিম মুখো এবং পুরুষটিকে পূব মুখো হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর ভগবানের আদেশে আবার তারা সামনা সামনি মুখ করে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর তারা পরস্পর পরস্পরকে স্বামী স্ত্রীতে বরণ করে নিয়েছে। তখন আর তাদের যৌন মিলনে কোন বাধা থাকে নি। তাদের মতে এভাবেই পৃথিবীতে যৌন ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে।[৩]

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে হালুয়াঘাট থানার চরভাঙ্গালীয়া গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ গারোর কাছ থেকে তাদের প্রথম মানব মানবীর প্রথম সঙ্গম রীতির যে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলাম তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ভগবান তাতারা রাবুগা পৃথিবী সৃষ্টি করে সেখানে বসবাসের জন্য মানব মানবী শনি ও মুনিকে সৃষ্টি করলেন।

শনি ও মুনি পরস্পর ভাই বোন।

ভগবান তাদের পরীক্ষার জন্য দুইজন দুই দেশে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন।

একজন রইল তুরা পর্বতে আর একজন নীলগিরি পর্বতে।

দীর্ঘ বারো বছর পর তারা একত্র হলো কিন্তু একজন অপরজনকে চিনতে পারলো না।

পুরুষ শনি নারী মুনিকে বললো, 'তুমি কে?'

মুনি উত্তর দিলো, 'আমি তোমার স্ত্রী।'

এভাবে তারা পরস্পর স্বামী স্ত্রীতে পরিণত হলো।

দীর্ঘ দিন কাটলো। ক্রমে ক্রমে তারা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধায় পরিণত হলো। অথচ যৌন মিলনের পদ্ধতি তাদের কাছে অজ্ঞাত। ভগবান স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা পরস্পর একত্র হও, নইলে পৃথিবীতে মানব জাতির উদ্ভব ঘটবে না।'

কিন্তু কিভাবে একত্র হবে?

কোন পদ্ধতিই যে তাদের জানা নেই।

হঠাৎ একবার খুব বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে সব জলমগ্ন হয়ে গেল। তখন শনি ও মুনি দেখে যে একজোড়া ব্যাংগমা ও বেংগমী কেমন মিলিত হয়ে আছে।

সেই থেকে তারাও অনুরূপভাবে একত্র হলো এবং এভাবে পৃথিবীতে মানব জাতির বিস্তৃতি ঘটলো।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংগমা ও বেংগমী ঠিক মানব সদৃশ যৌন ক্রিয়া-পদ্ধতিই অবলম্বন করে।

৫.

ঋতুস্রাব দেখা দিলেই নারী জাতিকে দেখা হয় ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ সারবস্তুর আধার হিসেবে। সে তখন নারীমাত্র নয়—সন্তান ধারণের বস্তু। এবং এ কারণেই কামবোডিয়ার আদিবাসীরা ঋতুস্রাব হওয়ার পর থেকেই অবিবাহিত মেয়েদেরকে দেবস্ত্রী অর্থাৎ প্রাহ্ এন (Prah-En) দেবতার স্ত্রী মনে করে। এমনকি তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং তাদের গালাগালি করাও নিষিদ্ধ। রজস্বলা অনুষ্ঠান পালনের পর তাদের মানবের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে। নতুবা নয়।[১]

রজোদর্শনের পর মেয়েদের কেন্দ্র করে আদিবাসী সমাজে উৎসব অনুষ্ঠানেরও অন্ত নেই। সিলেট ও আসামের খাসীয়া সমাজ প্রথম ঋতু-স্রাবের সময় আনন্দ অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের বিশ্বাস রজোদর্শন নারীর সন্তানবতী হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। তাই তারা প্রথম রজস্বলা মেয়েকে নিয়ে মিছিল বের করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলের সর্বাগ্রে থাকে সেই মেয়ে এবং তার সঙ্গে থাকে রজোমিশ্রিত লাল পতাকা। গ্রাম পরিভ্রমণ শেষ করে নৃত্য গীত ও ভোজেরও আয়োজন করা হয়।[২]

প্রথম রজোদর্শনের পর উৎসব পালনের রীতি আফ্রিকা, ইউরোপ, জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

মেয়েরা কখন থেকে রজস্বলা হতে শুরু করলো কিংবা ঋতুবতী হওয়ার মূল উদ্ভব কখন থেকে এ সম্পর্কেও আদিবাসী সমাজে কাহিনী কল্পনার অন্ত নেই।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রভাবিত আদিবাসী যেমন গারো, হাজং, ওরাওঁ, সাঁওতাল কিংবা আফ্রিকার আশান্তি, মাসাই, আমেরিকার মাউরী, দাইয়াক প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণা পুরুষদের আদেশ অমান্য করার অভিশাপগ্রস্ত পাপ থেকে অথবা নিষিদ্ধ ফলমূল ভক্ষণজনিত ব্যাপার থেকে মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে।

হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিবাসী যেমন রাজবংশী, দালুই, হদি, ভারতের আগারিয়া, গোন্দ, কোল, পরধান প্রভৃতিদের ধারণা রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নেয়, সম্ভাব্য অশুভ আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সীতাদেবী বার বছর এই রজস্বলা রীতি ধারণ করেন। সেই থেকে এই ঋতুস্রাবের শুরু হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই কুকীদের মতে অপদেবতার জোর জবরদস্তী মূলক সঙ্গম ক্রিয়া থেকেই ঋতুস্রাবের উদ্ভব।

আসামের মিশমী, আবর, লাখের ও লেপচাদের ধারণা অন্যরকম। তাদের মতে কামদেবতা নারজং নিউ-এর ইচ্ছায়ই এরূপ ঘটে। এ সম্পর্কে লেপচা সমাজে প্রচলিত একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি একটু ভিন্ন ধরণের এবং অন্যান্য আদিবাসীদের ধারণার সঙ্গে ঠিক এই কাহিনীর কোন সঙ্গতি নেই :

প্রথমতঃ মেয়েদের যোনি ছিল ঠিক মাথার উপরে। তখন ঋতুস্রাব শুরু হলেই স্রাবজনিত রক্ত মুখ মণ্ডল ব্যাপৃত করত। দেবতারা এই দেখে খারাপ বোধ করতে থাকলেন এবং সেই স্রাব স্থানান্তরিত করলেন পুরুষের হাটুতে। তাতেও অসুবিধা হলো। কেননা পুরুষব্যক্তিরা যখন শিকারে কিংবা মাঠের কাজে গমন করত তখন স্রাবের রক্তে বসুধা মাতা অপবিত্র হতে থাকলেন। কামদেবতা নারজং নিউ এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। যোনি যথাস্থানে চলে গেল।

দেবতারা নারী জাতির মাথার উপরে যোনির অবস্থান পছন্দ করলেন না। তাঁরা সমস্ত পাখীজাতীয় জীবকে ডাকলেন মাথার উপর থেকে যোনি স্থানান্তরিত করতে।

সব পাখীই আসল। তাদের মধ্য থেকে একজন বহু কষ্ট করে যোনি মাথার উপর থেকে কপালে আনল।

এখানেও অসুবিধা। কেননা, ঘরে ঢুকতে কিংবা শোয়ার সময় বালিশে সেই যোনি আঘাত প্রাপ্ত হয়। অতঃপর কপাল থেকে ঠোঁটে, চিবুকে ও গালে পরপর স্থানান্তরিত করা হলো। তাতেও অসুবিধা।

অতঃপর তা স্থানান্তরিত করে নাভীমূলে নিয়ে আসা হলো। এখানে সেই যোনী দীর্ঘদিন অবস্থান করলো। সেখানেও অসুবিধা। তাই সকল অসুবিধা বিদূরিত করে যোনি নিয়ে আসা হয়েছে বর্তমানের গোপন স্থানে।

নারজং নিউ এবারে সন্তুষ্ট হলেন। সেই থেকে এখান থেকেই ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং সেই স্রাব ঘনীভূত হলেই তা থেকে সন্তান সন্ততির জন্ম হয়।

নাভীমূলে যোনির অবস্থান ছিল বলে সেখানে এখনো গর্তের আকারে চিহ্ন রয়ে গেছে বলে তাদের ধারণা।[৩]

ভেরিয়ার এলুইন মধ্য প্রদেশের মুরিয়াদের নিকট থেকে যে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তাতে জানা যায় ঋতুস্রাব প্রথমে পুরুষদের হতো। মেয়েদের অবজ্ঞাসূচক পাপ থেকে এই স্রাব মেয়েদের উপর বর্তেছে। কাহিনীটি এইরূপ:

প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষদের ঋতুস্রাব হতো এবং ঋতুকালীন সময়ে তাদেরকে পরিবারের অন্যান্যদের থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্ন কুটিরে (**Segregated hut**) থাকতে হতো। স্রাবের সময় রক্ত ধারণ করার জন্য তারা বাঁশের চোংগায় লিঙ্গ পুরে রাখতো।

একবার এক মেয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল এবং পুরুষ ব্যক্তিকে অসম্ভব ঠাট্টা করেছিল।

পুরুষ লোকটি তখন ভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং লিঙ্গ থেকে চোংগা খুলে নারীর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়।

সেই থেকে নারীদের উপরই এই ঋতুস্রাবের ভার বর্তেছে।[৪]

ময়মনসিংহের গারোদের ধারণা মেয়েদের জননেন্দ্রীয় ছিল পায়ের গোড়ালীর একটু উপরে।

একবার এরূপ অবস্থায় এক মেয়ে কাজে ব্যস্ত এমন সময় এক মুরগী এসে যোনিতে ঠোকর দেয় এবং রক্তপাত শুরু হয়। মুরগীর ঠোকরের

আঘাতে সেই জননেন্দ্রীয় লাফ দিয়ে উঠে এসে বর্তমানের গোপন স্থানে আশ্রয় নেয় এবং সেই থেকে এখানেই অবস্থান করছে।

ঋতুস্রাব সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস যে, এই রীতির প্রচলন ঘটেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে দেবতার সংস্পর্শে এসে তাদের যোনিদ্বারে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সেই আঘাতেই রক্ত ঝরার আবির্ভাব। এখনও তাদের সেই বিশ্বাস বলবৎ আছে এবং ঋতুস্রাব শুরু হলেই বলা হয় যে স্বপ্নের মাধ্যমে এটা দেবতার কীর্তি।

এই বিশ্বাসের দরুণই ঋতুস্রাবের সময়কালে মেয়েদেরকে বিশেষ কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং পুরুষের জন্য সেই সময়কালে সঙ্গমজনিত কাজ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি কেউ এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে তাকে দেবতার কোপে পড়তে হবে এবং অনিষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। শুধু গারো কেন বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসীই এই ধারণা পোষণ করে।

৬.

ঋতুবতী সময়ে নারীজাতিকে যে আলাদাঘর বা বিচ্ছিন্ন কুটিরে রাখা হয় এই প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ঘরের ব্যবস্থা এককালে খুব প্রবল ছিল কিন্তু আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বিচ্ছিন্ন ঘরের ব্যবস্থা অবলুপ্ত হলেও ঋতুবতী কালীন সংস্কার বদ্ধ ধারণা এখনও অটুট রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, গারোদের ঋতুবর্তী মেয়েরা ফসলের মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে না। তাদের বিশ্বাস ফসলের ফলন নষ্ট হবে। কেননা সামাজিক দৃষ্টিতে তখন সে অপবিত্র। সাংসারিক যাবতীয় কার্যে তার অনুপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনুরূপভাবে সাঁওতাল ও ওরাওঁ মেয়েরা মাঠের কাজ ও ফসলের বীজ বপন করতে পারে না। এমনকি হাড়ি, পাতিল, খাদ্যদ্রব্যও স্পর্শ করা তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এমনকি তাদের পক্ষে ধর্মীয় পীঠস্থানে গমন করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ, মুরং ও চাকমা প্রভৃতি উপজাতীয় মেয়েদের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করাও ধর্মীয় রীতি বিরুদ্ধ।

সিলেট ও আসামের খাসীয়া রমণীরা ঋতুবতী সময়ে জলের কলসী ছাড়াও হাড়ি পাতিল এবং সাংসারিক ব্যবহার্য জিনিসপত্রও স্পর্শ করতে পারে না। রজস্বলা হলে মেয়েরা সব রকম কাজ থেকে বিরত থাকে এবং এই সময়কাল তারা একরূপ নিশ্চুপই থাকে। এমন কি ঋতুস্রাবের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে 'অমুককে দেখছি

না, তার কি হয়েছে?' তারা উত্তর দেয়, 'অমুকের কথা কওয়া নিষেধ, সে বাইরে যেতে পারে না কিংবা জলের ঘাটে যেতে মানা, ইত্যাদি।' তখনই বুঝতে হবে যে, ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে বলেই এতসব ইঙ্গিতপূর্ণ কথার অবতারণা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, খাসীয়াদের ধারণা নারীর মত বসুধা মাতাও ঋতুবতী হয়। নারী ও পৃথিবীতে কোন তফাৎ নেই। আসামের কামাখ্যা মেলার অন্তরালেও অনুরূপ বিশ্বাসের লক্ষণ বর্তমান। 'কামাখ্যা পাহাড়ের প্রস্রবণ। সেই ধারা হয় প্রবল এবং ভিতরের স্তরে খনিজ বক্সাভাধাতু-এর স্পর্শে এসে সেই জলের ধারা হয় লাল। খাসীয়াদের সরল বিশ্বাস হলো ধরণীমাতা ঋতুবতী হয়েছেন, তার প্রমাণ ঐ প্রস্রবণ —কা-মেই-খা—মায়ের জলের ধারা।'

পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের ঋতুবতী সময়কালকে ভীতিপ্রদ বলে ধারণা করা হয়। এই সময়ে তাদেরকে তো বিচ্ছিন্ন কুটিরে রাখা হয়ই তদুপরি তাদেরকে অপদেবতা কবলিত ভীতিপ্রদ জীব বলে কল্পনা করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা, নিউ আয়ারল্যাণ্ড, কালিমনস (Calymnos) প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের বিশ্বাস যে ঋতুবতী মেয়েরা মদ স্পর্শ করলে সির্কায় পরিণত হয়, ফলবান শস্য ক্ষেতে গেলে ফসল নষ্ট হয়, ধারালো চাকু স্পর্শ করলে তা ভোঁতা হয়ে যায়, লোহা স্পর্শ করলে তাতে মরচে ধরে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে আয়নার পারদ গলে যায়, ফলবান বৃক্ষের নীচে গেলে ফল আপনা আপনি বৃক্ষচ্যুত হয়, মধুর চাকের কাছে গেলে মক্ষিকা চাক ছেড়ে পালায়, দুধ স্পর্শ করলে দুধ জমে দই হয়, আচার স্পর্শ করলে আচার নষ্ট হয়, ইত্যাদি। এমনকি তার চাহনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। দৃষ্টিতে দৃষ্টি পড়লে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটার সম্ভাবনা।[১]

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ক্যারিয়ার ইণ্ডিয়ান মেয়েদের প্রথম রজস্বলা কাল আরও ভীতিপ্রদ। প্রথম রজোদর্শনের পর পরই তাদের আলাদা ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই আলাদা ঘরে তাদেরকে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত থাকতে হয়। এই সময়কাল তাদের জন্য 'জীবন্ত কবর' (Burying alive) স্বরূপ। শুধু তাই নয়, এই আলাদা ঘরে তাদের একাকী থাকতে হয়। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থাকে চামড়ার আচ্ছাদন।

তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও ভয়, তার দৃষ্টি পড়লেও ভয়ের কারণ: 'She was herself in danger and she was a source of danger to every body else.'[২]

মারগারেট মীড সামোয়ার এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে। সেখানে মেয়েদের জীবন যাত্রার প্রারম্ভ থেকেই সাংসারিক কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন শিশু পালন, ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলার বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। এই অবস্থায় সংসারের অন্যান্য কাজ যে গতিতে চলে যায়, ঋতুবতী কালও অনুরূপ ভাবে চলে যায়। রজোদর্শন বা যৌবনোদ্‌গম অবস্থা সেখানে কোন পরিবর্তনই আনয়ন করে না।[৩]

ব্রিটিশ নিউগিনির দেনে (Dene) আদিবাসীদের রজস্বলা মেয়েদেরকেও প্রথম রজোদর্শনে উৎসব পালন করে বিচ্ছিন্ন কুটিরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কুটিরে তাকে পুরো দুই চান্দ্রমাস অবস্থান করতে হয়। এই সময়কালে সে নিজের হাতে খাদ্য দ্রব্য পর্যন্ত খেতে পারে না। খাদ্য খেতে হয় কাঠি কিংবা চামচ দিয়ে। সমস্ত শরীর থাকে আচ্ছাদিত। সারাদিন উপোস করে রাত্রে সামান্য কিছু পাক করে খেতে হয় এবং রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হাঁড়ি পাতিল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলতে হয় কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।[৪]

মারগারেট মীডের মতে এ্যাপারেশ (Aparesh) আদিবাসীরা ঋতুবতী মেয়েদের পছন্দ করে না। ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন কুটিরে রাখতে হয়। সপ্তাহখানেক পরে রজস্বলা মেয়েরা পরিবারে ফিরে আসলে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে উপবাস করার পর এক সঙ্গে থাকবার অধিকার পায়।[৫]

সুমাত্রা, মালয়, আফ্রিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও একই নিয়ম প্রতিপালন করতে দেখা যায়। আফ্রিকার আকিকোয়া (Akiukuya) আদিবাসীরা ঋতুবতীকাল শেষ হলেই বিচ্ছিন্ন কুটির সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ফেলে। কেননা, এটা মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

সুমাত্রার মেনাংগকাবোয়া (Menangkabua) আদিবাসীদের মেয়েদের ঋতুবতী কালে শস্য ক্ষেত্রের আশেপাশে যেতে দেওয়া হয় না।

তাদের বিশ্বাস এতে ফসল নষ্ট হবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভিসায়ান্‌স (Visayans) আদিবাসীরাও একই মত পোষণ করে।[৬]

অষ্ট্রেলিয়ার পেন্নিফাদার (Pennyfather) আদিবাসীরদের ঋতুবতী নারীকেন্দ্রিক নিয়ম কানুন আরও কঠিন। রজস্বলা মেয়েদের বাড়ীর বাইরে কোমর পর্যন্ত বালিতে পুতে রাখা হয়। অতঃপর চার পার্শ্বে লতাপাতা দিয়ে কুটির তৈরী করে দিতে হয়। তার হাতে থাকে একটি কাঠি। এই কাঠি দিয়ে সে তার কাপড় চোপড় ঠিক করে। কেননা, নিজের কাপড় তো দূরের কথা শরীরে পর্যন্ত হাত লাগানো তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দক্ষিণ পূর্ব অষ্ট্রেলিয়ার ওয়াকেলবোরা (Wakelbura) আদিবাসীদের ধারণা যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি ঋতুবতী মহিলা দর্শন করে তবে তার মৃত্যু ঘটতে পারে।[৭]

কালিফোর্নিয়ার কারোক (KaFok) আদিবাসীদের ধারণায়ও ঋতুবতী মহিলারা ভীতিপ্রদ বস্তু। এমনকি রোগীকে ঔষধ খাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যদি তারা উপস্থিত হয় তবে রোগী মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। এ কারণেই তাদেরকে পরিবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়।[৮]

মাউরী আদিবাসীদের বিশ্বাস রাতের বেলা যদি ঘরের চালে 'কাহু কাহু' (Kahukahu) পাখী ডাকে তবে পরিবারের কেউ মারা যাবে। এই ভীতিপ্রদ পাখী ঋতুস্রাব জনিত রক্তের প্রেতাত্মা।[৯]

গাছ্ পালার মধ্যেও রজস্বলা রীতি রূপান্তরিত দেখা যায়। এ কারণে অরণ্য অভ্যন্তরের আঠা নির্গতকারী গাছ্‌কে স্ত্রীলোক কল্পনা করে আফ্রিকার জুলু আদিবাসীরা সেই গাছের নিকটবর্তী হয় না এবং আঠা কাজে ব্যবহার করে না।

৭

ঋতুবতী মহিলারা এক ভীতিপ্রদ বস্তু। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদিবাসী ধারণায় তাদের সঙ্গে যৌন মিলন সম্ভব কি না। এ প্রশ্নের জবাবে এইটুকু বলা চলে যে, যে কোন আনন্দ উপভোগ সময়ের অনুকূলেই করা বাঞ্চনীয়। যেখানে ভীতির প্রশ্ন সেখানে তো যৌন ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীরাও এ ব্যাপারে একমত। তবু এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিবাসী সমাজেই ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি কেউ ভুলক্রমে এরূপ কর্ম করে তবে তাকে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্রতা অবলম্বন করতে হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেয়েদের ঋতুকালীন সময় অপবিত্রতার লক্ষণ; যদিও এটা রোগ নয় তথাপি রোগের চেয়েও মারাত্মক হিসেবে ধরা হয়, এমনকি ছোঁয়াচে রোগের চেয়েও।

পৃথিবীর সব আদিবাসীদেরই ধারণা যে, ঋতুস্রাবের ব্যাপার অপদেবতার কীর্তি (Special activity of the demonistic function)। কাজেই অপদেবতার কোপ থেকে বাঁচবার জন্য তাদের সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন অতি অবশ্য কর্তব্য। এই সতর্কতার পরিমাপ কিরূপ নিম্নোদ্ধৃত আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হবে আশা করি।

উত্তর আমেরিকার পোয়েবলো ইণ্ডিয়ানরা (Poeblo Indians) বিশ্বাস

৬—

করে যে, ঋতুবতী মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গম করলে অবশ্যি তারা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।[১] এতদঞ্চলের মাউরী (Maori) আদিবাসীদের একই ধারণা। তবে একটু পার্থক্য এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শকারী পুরুষ নিজেই 'টাবু' হিসেবে পরিগণিত হবে এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিও তাকে ঋতুবতী নারীর মত ভয় করবে। স্ত্রী সহবাস তো দূরের কথা স্ত্রীর হাতের রান্না পর্যন্ত খাওয়া নিষিদ্ধ।[২]

দেনে (Dene) আদিবাসীদের ধারণা আরও প্রকট। তাদের মতে ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে সহবাস করলে পুরুষ পুরুষত্ব হারিয়ে নারীত্বে রূপলাভ করবে। ট্লিনকিট (Tlinkit) আদিবাসীরাও ঋতুবতী নারীর সঙ্গে সহবাসকে জঘন্যরূপে চিত্রিত করে। তাদের মতে এমন গর্হিত কাজ করলে সকল সৌভাগ্য বিদূরিত হয়; এমনকি ইংরেজী লোক-কাহিনীতে বর্ণিত মেডুসা (Medusa)-এর মাথা যেমন পাথরে পরিণত হয়েছিল তেমনি তাদের মাথাও পাথরে রূপলাভ করবে বলে বিশ্বাস।[৩]

ওরাং বেলেনডা (Orang Belenda) আদিবাসীদের দৃষ্টিতেও অনুরূপ কাজ জঘন্যতার নামান্তর। তাদের মতে কেউ যদি ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় তবে সে পুরুষত্ব হারাবে এবং পঙ্গু হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের বিশ্বাস যে, যদি কেউ এরূপ কাজ করে তবে তার হাড় তুলোর মতো নরম হবে এবং ভবিষ্যতে সে পুরুষ বিক্রমে কোন কাজই সমাধা করতে পারবে না।[৪]

শুধু আদিবাসী কেন পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজই ঋতুকালীন নারীর সঙ্গে সহবাস অনুমোদন করে না। মুসলিম মতে অনুরূপ কাজ করলে গোনাহে কবিরা অর্থাৎ বড় পাপ হয় এবং এই পাপের জন্য তাকে স্বর্ণরোপ্য কাফফারা বা দান খয়রাত করতে হয় ও আল্লাহর কাছে তওবা করতে হয়। হিন্দু মতে কেউ যদি এরূপ কাজ করে তবে সে ব্রাহ্মণহত্যাজনিত পাপের অংশীদার হয়।

৮

এতক্ষণ ঋতুবতী মহিলাদের ভীতিপ্রদ দিকের প্রতি সামান্য ইংগিত দেওয়া হলো। এর বিপরীতধর্মী দিকও যে আদিবাসী সমাজে নেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের কাছে জানতে পেরেছি যে, ঋতুস্রাবের রক্তে মন্ত্রপূত করে সেই মেয়েকে বাধ্যকরা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

ময়মনসিংহের গারোদের ধারণা কোন যুবতীকে যদি শত্রুতা সাধনের জন্য বন্ধ্যাত্ব করার ইচ্ছে থাকে তবে তার ঋতুস্রাবের রক্ত যোগাড় করে শনি কিংবা মঙ্গলবারে মন্ত্রপূত করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। তবেই সে চিরদিনের জন্য বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হবে।

ওরাওঁ সমাজ বিশ্বাস করে যে, ঋতুস্রাব মিশ্রিত ন্যাকড়া যদি কাকে নেয় তবে সেই মেয়ে জীবনেও সন্তানের মুখ দেখতে পারে না।

অনুরূপ বিশ্বাস পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। আইনো (Ainu) আদিবাসীদের বিশ্বাস ঋতুস্রাবের রক্তে রয়েছে পবিত্রতার প্রভাব। এই কারণে এই রক্ত সাংসারিক জীবনে সফলতা আনয়ন করতে সক্ষম। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আইনো আদিবাসীরা যখন এই রক্ত বিচ্ছিন্ন কুটিরের মেজে দেখতে পায় তখনই তারা তা তুলে নিয়ে বুকে মাখে—এই জন্যে যে, সাংসারিক কাজে তারা সফলতা অর্জন করবে।'[১]

ইতিপূর্বে দেনে (Dene) আদিবাসীদের ঋতুবতী নারীর প্রতি ভয়াবহ মনোভাবের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যদি

কোন দেনে ছেলে কেবলি কাঁদাকাটি করে কিংবা মায়ের অবাধ্য হয় তবে দেনে মাতা ছেলের গলায় ঋতুস্রাব মিশ্রিত ন্যাকড়া সেই ছেলের গলায় বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস এতে অপদেবতার প্রভাব বিনষ্ট হবে এবং ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মেয়েরা বিচ্ছিন্ন কুটিরে অবস্থান কালে যদি জানতে পারে যে, তাদের ফসল ক্ষেতে ফসল পাকা শুরু করেছে তখন সে দুপুর রাতে উলঙ্গ অবস্থায় ফসলক্ষেতে পায়চারী করে এবং ঋতুস্রাব জনিত রক্ত ছড়িয়ে দেয়—এই জন্যে যে, 'ফসল পোকায় নষ্ট করবে না এবং ফলন ভাল হবে।' উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইটালী এবং হল্যাণ্ডের আদিবাসীরাও অনুরূপ রীতি পালন করে। বাগানের ফুল নষ্টকারী কীট তাড়ানোর ব্যাপারেও তারা একই নিয়ম অবলম্বন করে।

আফ্রিকার কাফির আদিবাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের মত ঋতুস্রাবের রক্ত যাদুর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। 'প্রেমাকাংখী যুবক তার দয়িতার ঋতুস্রাব যোগাড় করা মানেই তাকে পাওয়া এরূপ বিশ্বাস কাফিরদের মধ্যে প্রবল।'[২]

আবার বিপরীতধর্মী ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কেননা, আঙ্গোলার আদিবাসীরা যাদুমন্ত্র নষ্ট করার জন্যে ঋতুস্রাবের রক্ত মিশ্রিত ন্যাকড়া ঘরে ঝুলিয়ে রাখে 'যাতে মন্ত্র প্রভাবে কেউ তাদের ক্ষতি করতে না পারে।'[৩]

হিন্দুধর্মেও ঋতুস্রাবের রক্তের বেশ প্রাধান্য রয়েছে। বৈদিক সংস্কৃতিতে উল্লেখিত আছে যে, ঋতুস্রাবের রক্তে রয়েছে সারবস্তু। শুধু তাই নয়, সে রক্ত অগ্নির প্রতীক। এ কারণে স্রাবের রক্ত অবজ্ঞা করা দোষণীয়।

ঋতুস্রাব মেয়েদের যৌবনবতী হওয়ার লক্ষণ। যৌবনবতী হলেই তাদের রূপ লাবণ্য ষোলকলায় পূর্ণ হয়। ফলে, তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুরুষদের চোখে আবির্ভূতা হয়। সবচেয়ে বড় কথা, সে তখন সন্তান ধারণের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋতুস্রাবের রক্ত লাল এবং এ কারণেই লাল জিনিস যৌন চিহ্ন বলে আদিবাসীদের ধারণা। এই ধারণার ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানে নববধুর জন্য লাল পেড়ে কাপড়, লাল মোজা ইত্যাদি দেওয়ার প্রাধান্য তাদের মধ্যে বর্তমান। এমনকি আদিবাসী সমাজে সিঁদুর পরার রীতি একই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। কপালে

কিংবা সীমন্তে সিদুঁর পরিধান করলেই বুঝতে হবে যে, সে বিবাহিতা এবং আইনসঙ্গত ভাবে যৌনক্রিয়ার পাত্রী এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা অর্জনে সমর্থ।

আসামের আবর, মিশমী, লাখের, খাসীয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণায় লাল রং জীবনসার ও উর্বরা শক্তির প্রতীক। এবং এ জন্যেই আসামে বিহুনাচের জন্য যে পোষাক তৈরী করা হয় তাতে থাকে লালসূতোর লতা পাতা বা জীব জন্তুর শিল্পকর্ম।

লাল রং যে জীবনসার ও উর্বরা শক্তির প্রতীক এই বিশ্বাস পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্টের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

'The practice of painting corpses and bones red, which is well-nigh universal in primitive society and has been so from earliest ages in Europe, may be regarded as connected with blood as one of the forms of the vital principal or soul, but even this aspect is not unconnected with menstruation, for it is from the menstrual blood retained in the womb that human beings are believed by the primitive to be formed. The Maoris expressly state that blood is the substance of the human spirit. The condition of woman in the tabu state is commonly indicated by their painting themselves red. Thus several Australian tribes mark menstruating woman with red paint, as do Kaffir woman, while in India such a woman wears round her neck handkerchief stained with menstrual blood.'[8]

যাহোক, আধুনিক শিক্ষিত সমাজেও বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের জন্য লাল কাপড়, কম পক্ষে লালপেড়ে কাপড় ইত্যাদি এবং হিন্দু সমাজের সিঁদুর পরার রীতি কি উপরে বর্ণিত আদিবাসী সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না?

৯

আদিবাসী সমাজ দুইবার নারীজাতিতে খুবই অপবিত্র মনে করে। প্রথমতঃ ঋতুকালীন সময়ে; দ্বিতীয়তঃ সন্তান প্রসবের পর। ঠিক কতদিন এই সময়কাল নির্ধারিত তার ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। কেননা আদিবাসী ভেদে এই সময়কালে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঋতুস্রাবের সময়সীমা সাধারণতঃ এক সপ্তাহ অথচ আমেরিকার কোন কোন আদিবাসীরা ঋতুবতী মেয়েদেরকে চার পাঁচ বছরও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে হয়ত এতটা কড়াকড়ি নেই, তবে তাদেরকেও যে কতকগুলো কড়া শাসনের নিগড়ে বাধা থাকতে হয় ইতিপূর্বের আলোচনায় তা স্পষ্ট।

ঋতুবতী মেয়েদের জন্য যেমন আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয় সন্তান প্রসবের সময়ও তেমনি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা অতি অবশ্য কর্তব্য। বাংলাদেশের আদিবাসীদের বেলায় এই নিয়ম এককালে খুবই প্রবল ছিল কিন্তু বর্তমানে এই নিয়মে অনেকটা ভাঁটা পড়েছে। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের দরুণই হোক কিংবা দারিদ্রতার জন্যই হোক অনেক আদিবাসী সমাজই এখন আর আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে না। তবে এই রীতি যে একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না।

বাংলাদেশের হাজং, রাজবংশী, হদি, দালুই, চাকমা, টিপরা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে প্রসবকালে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা দেখেছি। প্রসব-বেদনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসূতিকে আলাদা ঘরে স্থানান্তরিত করা

হয়। ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের পর, এমন কি প্রসূতি পরিবারে ফেরৎ না আসা পর্যন্ত তাদের অনেক নিয়মের অধীন থাকতে হয়। যেমন ঘর বাঁধার সময় ওঝা কর্তৃক মন্ত্রপূত করে ঘরের খুঁটি পুঁতেতে হবে। ঘরের চারপাশে দড়ি টাঙ্গিয়ে তাতে আবদ্ধ করতে হবে ঘন কাঁটা সংযুক্ত লতাগুল্ম। তাদের বিশ্বাস এসবের জন্য অপদেবতার কুনজর পড়তে পারবে না।

গারো, হাজং, খাসীয়া, রাজবংশী, ওরাওঁ রমণীরা সন্তান প্রসবের পর থেকে কুটিরে সর্বক্ষণের জন্য অগ্নিকুণ্ড করে রাখে এবং প্রসূতি যদি বাইরে যায় তবে তাকে হাতে করে লৌহদণ্ড নিয়ে যেতে হয়।

অগ্নিকুণ্ড এবং লৌহদণ্ড উভয়ই অপদেবতা তাড়ানোর অস্ত্র। এখানেই শেষ নয়। ঘরে ঢুকবার সময় আবার তাদের হাত পা ভাল করে আগুনে সেঁকে নিতে হয়। এটাও অপদেবতা তাড়ানোর ব্যবস্থা।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার গাজীরভিটা গ্রামে অবস্থান কালে এক গারো রমণীর প্রসবকালে সেই বাড়ীর কতকগুলো নিয়ম প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। হঠাৎ দেখি বাড়ীর মালিক রাত্রি বেলায় ঘরের দরজা খুলে দিলেন, জানালা উন্মুক্ত করলেন; এমনকি বাক্স পেটরা পর্যন্ত তালামুক্ত করে রাখলেন। তদুপরি বাড়ীর সবাইকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, কেউ যেন কোথাও হেলান দেওয়া অবস্থায় না থাকে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, শান্তিপূর্ণভাবে প্রসবের জন্যই এই ব্যবস্থা। আশ্চর্য। ফলও দেখলাম অনুকূল।

সন্তান প্রসবের পর সাতদিন, একুশদিন কিংবা একচল্লিশদিন পর প্রসূতি আলাদা ঘর থেকে পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে আসে। সাত-দিনের দিন প্রসূতিকে ভালো করে খাওয়ানোর নিয়ম আছে। নইলে সন্তান রাক্ষুসে স্বভাবের হবে বলে তাদের বিশ্বাস।

রংপুর জেলার হলদিবাড়ীতে থাকাকালীন একবার এক রাজবংশী যুবক এসে জিজ্ঞেস করলো, 'সাহেব দোয়াত কলম আছে?'

বললাম, 'কেন, কি প্রয়োজন?'

যুবকটি বলা শুরু করলো, 'আমাদের এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

আজ ছয় দিন। সাতের রাত্রি পড়বে। আজ রাত্রে সন্তানের শিয়রে দোয়াত কলম রাখতে হবে নিয়তির ভাগ্য লেখার জন্য।'

অনুরূপ বিশ্বাস শুধু রাজবংশী কেন বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশের আদিবাসী সমাজ সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির প্রতি এই উপমহাদেশের চেয়ে কঠিন নিয়ম আরোপিত করে। এস্কিমো মেয়েদের যেসব নিয়মের সম্মুখীন হতে হয় সেসব শুধু কঠিনই নয় অসহনীয়ও বটে। প্রসব বেদনার চার সপ্তাহ আগেই প্রসূতিকে বিচ্ছিন্ন কুটিরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখান থেকে সে মুক্ত আলোয় বের হতে পারে না। এমন কি খাদ্য দ্রব্যও ঘরের ভিতেরে খেতে হয় এবং অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা ঘরের ভিতরেই পুঁতে রাখতে হয়। থালা বাসন ঘটি বাটি সবকিছুই তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। কোন পুরুষ ব্যক্তি সেসব স্পর্শও করতে পারবে না। একমাস পর যখন পিতা সন্তানের মুখ দেখবার অধিকার পায় তখন প্রসূতি পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে আসে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রসব-বেদনার সময় যদি দীর্ঘতর হয় তবে কোন লোকই কাজে যোগদান করে না।[১]

ওয়ারেগা আদিবাসীদের মহিলারা সন্তান প্রসবের পর সন্তান হাঁটা শেখা না পর্যন্ত পরিবারে ফিরে আসে না। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি সন্তান দেখতে কুটিরে যায় তবে তাকে স্ত্রীর সঙ্গে বিপরীত মুখো হয়ে আলাপ করতে হয়।[২]

সেলিবীস দ্বীপপুঞ্জের আলফোর (Alfoors) আদিবাসীরা সন্তান প্রসবের সময় ঘরের সব দরজা জানালা খুলে রাখে। তাছাড়া তাদের পালিত জীব জন্তুর মুখ তৎক্ষণাৎ বেঁধে ফেলে। প্রথোমোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভালভাবে প্রসবের জন্য এবং দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থা জীব জন্তু যাতে অপদেবতার প্রতীকে সন্তানের আত্মাবস্তু না খেতে পারে সেই জন্যে।[৩]

উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর সর্বত্রই বিচ্ছিন্ন কুটিরে প্রসূতিকে তত্ত্বাবধান করবার জন্য মেয়েরা যাতায়াত করে। পুরুষদের যাওয়ার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ই. এ. হোবেল লক্ষ্য করেছেন যে, নিউগিনির কোন কোন আদিবাসী সমাজ প্রসূতিকে তত্ত্বাবধানের জন্য তার স্বামীকে বিচ্ছিন্ন কুটিরে যাবার অধিকার দেয়।[৪]

পৃথিবীর কোন আদিবাসীই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান পালন না করা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর দর্শন লাভ অনুমোদন করে না। ঋতুস্রাবকালীন নারীজাতি যেমন 'টাবু' হিসেবে পরিগণিত হয় তেমনি সন্তান প্রসবের পর কমপক্ষে সাত দিন সে পুরুষের কাছে 'টাবু'। নিউ মেক্সিকোর পোয়েবলো আদি-বাসীদের মধ্যে এই টাবু'র সময়কাল আরও দীর্ঘ। কোন কোন গোষ্ঠী চার পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রসূতিকে 'টাবু' হিসেবে সাব্যস্ত করে থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাসুতু (Basuto) আদিবাসীদের মধ্যে ওঝা কর্তৃক পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান পালন না করা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী একত্রে থাকবার বা পিতা পুত্রের মুখ দেখবার অধিকার পায় না। 'এটা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান (Absolution of the man and wife)। যদি এটাকে অবজ্ঞা করা হয় তবে তাদের ধারণা যে, স্ত্রীর দর্শন লাভই স্বামীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।'[৫]

সন্তান প্রসবকালে অপদেবতা তাড়ানোর ব্যবস্থাও অনেক আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশের মুরং, সেন্দুজ, পাংখো ও বনজোগীরা সন্তান প্রসবকালে ঢোল ডগরা বাজিয়ে এমনকি বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে অপদেবতাকে ভয় দেখায় যাতে নবজাতকের আত্মাবস্ত সুস্থ থাকে।

একই বিশ্বাস সেলিবীস দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ফিলিপাইন অঞ্চলেও দেখা যায়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে অপদেবতার আবির্ভাব বুঝতে পারে ফলে তারা সারারাত বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে। 'সকাল বেলা স্বামী পরিশ্রান্ত হয়ে নিশ্বাস নেয় এই ধারণায় যে, সে তার স্ত্রী ও নবজাতককে রক্ষা করেছে।'[৬]

আমবোনিয়া অঞ্চলের পাপোয়া (Papua) আদিবাসীরাও সন্তান প্রসবকালে নানারূপ সতর্কতা অবলম্বন করে। তাদের ধারণা পন্তিনাক (Pontinak) নামক অপদেবতা নবজাতক অথবা নবজাতকের প্রজনন অঙ্গ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।[৭]

নবজাতককে অপদেবতার কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য আদিবাসী সমাজে ওঝা কর্তৃক ঝাড় ফুঁক মন্ত্র তন্ত্র ইত্যাদির অন্ত নেই। ময়মনসিংহের গারো সমাজে নবজাতককে কুকুর কর্তৃক লেহন করাতে দেখেছি। তাদের বিশ্বাস সন্তানদের গায়ে কুকুরের জিহ্বার স্পর্শ লাগলে অপদেবতা তার

আশেপাশেও আসবে না। সাধারণতঃ পর পর সন্তান হয়ে মারা গেলেই একপ নিয়ম তারা পালন করে। এমনকি গারো সমাজে নবজাতককে ওঝার নিকট এক পয়সা মূল্যেও বিক্রী করতে দেখেছি। এই বিক্রী আসল বিক্রী নয়—অপদেবতাকে তারা বুঝাতে চায় যে, বাপ মা সন্তানকে অবজ্ঞা করে ওঝার হাতে তুলে দিয়েছে। যাতে অপদেবতা আর কুনজর না করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝোগড়াবিল গ্রামে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীনবচন্দ্র তংচঙ্গ্যার বাড়ীতে এক নবজাতককে কেন্দ্র করে 'এদাদাগানা' ব্রত পালন করতে দেখেছিলাম। অপদেবতার কোপানল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। জন্ম হওয়ার পর থেকেই শিশুটি কেবল কাঁদতো এবং কাঁদতে কাঁদতে ছাইরঙা হয়ে যেতো। সবারই ধারণা অপদেবতার 'আসর' পড়েছে। সকাল বেলা ওঝা বা বৈদ্য এলেন। মা তার শিশু কোলে লয়ে বারান্দায় (চাকমা ভাষায় সাঁকোর দুয়ারে) বসলেন। শিশুর সামনে একটি থালা। থালায় একটা টাকা, একটা কলা, কিছু ভাত, ডিম, সন্দেশ ইত্যাদি রাখা হয়েছে। থালার উপরে একটা সাদা কাপড় (চাকমা ভাষায় 'খাদী') দিয়ে সব কিছু ঢাকা। কাপড়ের এক প্রান্ত শিশুর পিতা ধরে দক্ষিণ মুখো হয়ে বসে আছেন। ওঝা বসে আছেন পূবদিকে মুখ করে। অতঃপর ওঝা একটা লাউয়ের 'বস' হাতে নিয়ে তার মধ্যে চাল রেখে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে চাউল নাড়তে লাগলেন আর থালায় ফুঁ দিতে থাকলেন। মন্ত্রের শেষ শব্দে জোরে উচ্চারিত হলো : 'উ......উ......উ......কুই........।

যতবারই ওঝা থালায় ফুঁ দিচ্ছেন ততবারই শিশুর পিতা কাপড়ের প্রান্ত তুলে ধরছেন। এমনিভাবে ফুঁ দেওয়ার সময় হঠাৎ একটা মাছি থালায় বসতেই পিতা সেই আচ্ছাদন দিয়ে মাছিটিকে চেপে ধরলেন আর তখনই মা শিশু সন্তানটি নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। পরে জানতে পারলাম মাছিটির মৃত্যুই নাকি অপদেবতার বিনাশ সাধন।

সন্তান প্রসবের পর নারী সমাজ যে অপবিত্র এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামান্য ইংগীত দেওয়া হয়েছে। ঋতুবতী কালে যেমন নারীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধ; সন্তান প্রসবের পরও তেমনি নিষিদ্ধ। তবে সন্তান প্রসবের পরের সময় সীমা আদিবাসী ভেদে বিভিন্ন রকম দেখা যায়।

সাধারণতঃ একমাস থেকে দেড়মাস পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে শুতে পাবে না। পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন আদিবাসীরা সন্তান হাঁটা না শেখা পর্যন্ত এমনকি চার পাচ বছরও সঙ্গম ক্রিয়া থেকে বিরত থাকে। শুধু আদিবাসী কেন সভ্য সমাজেও কমপক্ষে চল্লিশ দিন যৌন মিলন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার নিয়ম আছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও আদিবাসীদের এই মত সমর্থন করে। সন্তান প্রসবের পর যৌন মিলনের প্রধান অন্তরায় স্ত্রীজননেন্দ্রীয় থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ। রক্ত কিংবা ঘা না শুকানো পর্যন্ত তা রোগ হিসেবে ধরা হয়। এতে পুরুষের মানসিক রুচিবোধ না থাকারই কথা। তদুপরি রোগাক্রান্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। তাছাড়া স্ত্রী জননেন্দ্রীয় ঠিকমত কাজও করবে না। কেননা পুরুষের আবির্ভাব তখন তার কাছে ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া কিছু নয়। এজন্যেই আদিবাসী সমাজ এই সময়কালকে আখ্যা দিয়েছে **'Sexual taboo state.'**

আদিবাসী সমাজে গর্ভবতী নারীর স্থান ও মর্যাদা কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে প্রথমেই বলতে হয়। **'Life begins with conception and conception produces pregnancy.'**[৮]

শুধু আদিবাসী নয়, শারীরবিজ্ঞান গবেষকদের ধারণায়ও গর্ভবতীর লক্ষণ হলো স্তনের স্ফীতি, স্তনের বোটার পরিবর্তন অর্থাৎ কালো আকার ধারণ এবং তলপেটের স্ফীতিভাব। এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া যে গর্ভধারণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ তা সমগ্র বিশ্ববাসী কর্তৃক স্বীকৃত সত্য।

দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সংস্পর্শে থেকে যেটুকু উপলব্ধি জন্মেছে তাতে বুঝতে পেরেছি যে, মেয়েদের কাজে আলসেমী এবং খাদ্যে অনীহা ভাব প্রকাশও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ।

সামুদ্রিক অঞ্চল ও আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার অরন্তা (**Arunta**), পলিনেশীয়ার পোকাপোকা (**Pukapuka**) ও অন্যান্য আদিবাসীর জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে সি এল ফোর্ড মন্তব্য করেছেন যে, গর্ভধারণের লক্ষণ হলো অসুখ অসুখ ভাব, বমি, আলস্য পরায়ণতা ইত্যাদি।[৯]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর মধ্যে রয়েছে সারবস্তু (**Life-essence**) এবং এই সারবস্তুর একমাত্র প্রকাশ গর্ভবতী

হওয়ার লক্ষণ। কাজেই আদিবাসী সমাজে গর্ভবতী নারী বেশ মর্যাদা সম্পন্ন।

ময়মনসিংহের হাজং সমাজ শিশু সন্তানকে দেবতাতুল্য মনে করে, ফলে গর্ভবতী নারীকেও মর্যাদা দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়।

অনুরূপভাবে গারো, দালুই, হদি, রাজবংশী, সাঁওতাল, ওরাওঁ, চাকমা, টিপরা, মগ প্রভৃতি সব আদিবাসীই গর্ভধারিণী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সাংসারিক কাজকর্ম ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রতি যত্ন ও কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তারা পিছ পা হয় না। এর পিছনে দুটো মনোভাব ক্রিয়া করে—একটি ধর্মীয় ও অপরটি শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত।

ধর্মীয় এই জন্যে যে, মাতৃগর্ভে যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে সে দেব শিশুও হতে পারে।

শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুটা ভয় ও উদ্বেগ মিশ্রিত। এই ভয় হলো—সন্তান যাতে ভালভাবে বড় হয় সেই ব্যবস্থার যেন অযত্ন না হয়; ভালভাবে প্রসব হওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বনে যেন কোন কার্পণ্য না ঘটে ইত্যাদি।

১০

গর্ভবতী নারীর খাদ্য সম্পর্কে ধর্মীয় বাঁধা, নিষেধ বা টাবু জড়িত আছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ রমণীরা শামুক, কাঁকড়া, ইত্যাদি খায় না। ময়মনসিংহের গারোদের মধ্যেও বাইন মাছ, বোয়াল মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ, সাঁওতালরা গর্ভবতী নারীকে ইঁদুর খেতে দেয় না। এসবের পিছনে সংস্কারবদ্ধ ধারণা যে, গর্ভজাত সন্তান পঙ্গু কিংবা ভক্ষ্য জীবজন্তুর আকৃতি ও স্বভাব অর্জন করতে পারে।

একই বিশ্বাস পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। যেমন 'ওয়াশিংটনের সানপুইল ইণ্ডিয়ান (Sanpoil Indians) আদিবাসী মাছ খায় না, পাছে সন্তান মাছের মত সদা কম্পমান থাকে।[১] তাছাড়া খরগোস জাতীয় জীব খাওয়াও তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আফ্রিকার জুলু ও কাফির আদিবাসীরাও গর্ভবতী নারীদের 'মাছ খাওয়া সমর্থন করে না।'[২]

আদিবাসী ধারণা অনুসারে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীদের খাদ্য ও পানীয় স্পর্শ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি গ্রহণের সময় মাছকোটা, গাছের পাতা ছেঁড়া, পাটকাঠি ভাঙ্গাও তাদের পক্ষে অনুচিত। কেননা এতে গর্ভজাত সন্তান পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা।

ময়মনসিংহের গারো অধ্যুষিত এলাকায় দেখেছি গ্রহণের সময় মেয়েরা কোথাও হেলান দিয়েও দাঁড়ায় না। এতেও গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

খাদ্যজনিত ব্যাপারে বিপরীতধর্মী নিয়মও লক্ষ্য করা যায়। যেমন টক জাতীয় খাদ্য—তেঁতুল, আচার, কুল ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপারে কোন নিষেধ নেই। প্রায় প্রত্যেক আদিবাসীদের ধারণাই এসব খেতে না দিলে সন্তানের মুখ দিয়ে লালা পড়ার সম্ভাবনা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গর্ভবতী নারীদের রুচী মাফিক যা খেতে চায় তাই-ই খেতে দেওয়া হয়। এই কারণে ওরাওঁ, রাজবংশী ও সাঁওতাল রমণীদের চুলোর পোড়ামাটি, সাজি মাটি ইত্যাদিও খেতে দেখেছি।

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও গর্ভবতী রমণীদের সাংসারিক জীবনে অনেক গুলো সংস্কারবদ্ধ ধারণা অথবা টাবু মেনে চলতে হয়। একবার এক গারো' রমণী না বলে অন্যের গাছ থেকে একটা কাঁচা মরিচ এনে খেয়েছিল—তার মা জানতে পেরে তাকে শাসালো যে, 'না বলে অন্যের গাছের মরিচ এনেছিস, তোর সন্তান চোর হবে।'

এই কথা শুনেই আব একটা মরিচ নিয়ে গিয়ে সে গাছের মালিককে ফেরৎ দিয়ে আসে এবং না বলার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ডক্টর বি. ম্যালিনৌস্‌কী নর্থওয়েষ্ট মেলানেশিয়ার আদিম সমাজের জীবন যাত্রা প্রত্যক্ষ করে উল্লেখ করেছেন যে, গর্ভসঞ্চারের পাঁচ মাস পর থেকেই মেয়েরা খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে 'টাবু'র অধীনে থাকে। সেখানকার আদিবাসীদের ভাষায় 'কাভায়লুয়া' (**Kavaylua**) অর্থাৎ ফলজাতীয় বস্তু যেমন কলা, আম, আপেল, বাদাম, পেপে ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ। ভবিষ্যৎ সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই এসব করা হয়।[৩]

অনুরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই চাকমা সমাজের গর্ভবতী নারীরা তরমুজ খায় না। কারণ এতে ভবিষ্যৎ সন্তানের পেট অসম্ভব বড় হবে; ফলে, মারা যাওয়ার সম্ভাবনা।

১১

ভবিষ্যৎ সন্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে আদি-বাসী সমাজে ব্রত অনুষ্ঠান পালনেরও ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশের রাজ-বংশী, গারো, হাজং, টিপরা প্রভৃতি আদিবাসী গর্ভসঞ্চারের সাত মাসের মধ্যে এক উৎসব পালন করে। কোন কোন অঞ্চলে এটা 'সাতশা' নামে খ্যাত। এই ব্রতের জন্য নতুন কাপড়, নারকেল, সন্দেশ, পান সুপারী ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট দিনে গর্ভধারিণীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিধান করতঃ পিঁড়ির উপরে উপবেশন করানো হয়। পিঁড়ির নীচে দেওয়া হয় খুব লম্বা লম্বা গোছাবদ্ধ পাট। তাদের বিশ্বাস ভবিষ্যৎ সন্তান কন্যা হলে তার চুল হবে পাটের মত লম্বা।

অতঃপর সেই গর্ভধারিণীর সম্মুখে মিষ্টান্ন সহ এক বিরাট থালা স্থাপন করা হয়।' এই মিষ্টান্ন বেজোড় সংখ্যক মেয়ে একত্র বসে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে ভক্ষণ করে। পরিশেষে বাড়ী শুদ্ধ লোককে মিষ্টি বা 'বাতাসা' দেওয়ার নিয়ম আছে। আশে পাশের ছেলে মেয়েরা যদি এই বাতাসা থেকে বঞ্চিত হয় তখন তাদের ছড়া কেটে গান করতে শোনা যায়:

অমুকের বৌ-এর সাতশা
একখান একখান বাতসা
একবার চাইলাম দিল না
আবার চাইলাম দিল না
আমরা এ্যাতো ছ্যাদর না।

বাতাসা না পাওয়ায় তাদের দুঃখ আছে তথাপি ঠাট্টার সুরে বলছে, 'আমরা এ্যাতো ছ্যাদর না' অর্থাৎ তারা লোভী নয় মোটেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমাজেও গর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে। এই ব্রতের নাম 'গাংশালা'। গর্ভসঞ্চারের সাত-মাসের মধ্যে কোনও এক নির্দিষ্ট দিনে বাড়ী সংলগ্ন নদীর ধারে একটি ছনের ঘর তৈরী করা হয়। অতঃপর গর্ভবতী নারীর বাসগৃহের সামনে একটি মাটির পাতিলে একটি আস্ত সুপারি রেখে পাতিলের গলায় সুতো জড়ানো হয়। সুতোর অপর প্রান্ত বাঁধা হয় তার আবাস গৃহের দরজায়। সুতো থাকে খুব লম্বা। অতঃপর সেই পাতিল সাতবার গর্ভবতী নারীর মস্তক স্পর্শ করিয়ে পাতিল সহ গর্ভবতী নারীকে নদীর ধারে নির্মিত সেই কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে কতকগুলো নিয়ম পালন করার পর পাতিল সহ গর্ভবতী নারীকে নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর পাতিল ঘরে উঠিয়ে রেখে আত্মীয় স্বজন মিলে শূকর বলি দিয়ে ভোজের আয়োজন করে। এই ভোজের নাম 'আগিদা'।

ব্রিটিশ নিউগিনি ও ট্রোব্রিয়াণ্ড (Trobriand) অঞ্চলের আদি-বাসীদের মধ্যেও গর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে উৎসব পালনের রীতি আছে। এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সমুদ্র তীরে। সকাল বেলা গর্ভবতী নারীকে নিয়ে তার ফুফু (আঞ্চলিক ভাষায় Tabula) এবং অনুরূপ সম্পর্কের মেয়েরা নদী বা সমুদ্রতীরে গিয়ে স্নান করায়। অতঃপর নতুন কাপড় পরিয়ে তাকে মাদুরের উপর দাঁড় করানো হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তার পা যেন কোন ক্রমেই মাটি স্পর্শ না করে। সঙ্গে medicine-man বা ওঝাও থাকে। গর্ভবতী নারীর পায়ের কাছে স্থাপন করা হয় ঝুড়ি ভর্তি লতাগুল্ম। এই লতাগুল্ম সহযোগে ওঝা মন্ত্র পাঠ করেন। লতাগুল্ম দিয়ে সেই মহিলাকে জড়ানোও হয়। অতঃপর বিভিন্ন রকম নিয়ম পালনের পর তাকে নিয়ে ঘরে ফেরা হয়। ঘরে ভোজের আয়োজন চলে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে। 'ট্যাবুলা'গণ বেশী পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পেয়ে থাকে। প্রথম গর্ভধারণের সময়ই এই উৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিপালন করা হয়।[২]

১২

বাংলাদেশের আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, তারা কোন ক্রমেই গর্ভবতী নারীর সঙ্গে যৌন-ক্রিয়া অনুমোদন করে না। তাদের ধারণা এতে সন্তান পঙ্গু হতে পারে, গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা, তদুপরি প্রসবকালে কষ্ট হতে পারে।

জনৈক গারো বন্ধু বলেছেন যে, গর্ভবতী কালে যৌন-ক্রিয়াতো দূরের কথা পুরুষের সংস্পর্শ থেকে তাদের সরিয়ে রাখা উচিত যাতে তাদের মন কোন ক্রমেই যৌন লিপ্সার দিকে না আসে। সম্ভবতঃ এ কারণেই গর্ভবতী মেয়েদের বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়—প্রসবের নিমিত্ত বাপের বাড়ী পাঠানোর রীতি উপলক্ষ্য মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ, টিপরা সম্প্রদায়ও গর্ভবতী নারীর সঙ্গে যৌন-ক্রিয়া সমর্থন করে না। টিপরা সম্প্রদায় এ ব্যাপারে আরও কড়া। তাদের মতে, সঙ্গম-ক্রিয়াতো দূরের কথা গর্ভবতী নারীর সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করাও নিষিদ্ধ বা 'টাবু'।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুরূপ নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর বি. ম্যালিনোস্‌কী টরেস স্ট্রেইট-এর আদিম সমাজে একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, 'As pregnancy progresses and the woman becomes big, sexual intercourse must be abandoned, for as the natives say, 'the penis would kill the child.' This taboo is rigorously observed.'[১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ই. ক্রলেও পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম সমাজের গর্ভবতী নারী সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনিও উল্লেখ করেছেন যে, '.........sexual intercourse should be especially forbidden at sexual crises, sush as menstruation, pregnancy and for some time after child birth.'[২]

বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়াও যে লক্ষ্য করা না যায়, এমন নয়। পৃথিবীর কোনো কোনো আদিম সমাজ গর্ভবতী অবস্থায়ও যৌন-ক্রিয়া সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার গাটলা (Kgatla) আদিম সমাজের উল্লেখ করা যায়। তাদের মতে গর্ভজাত সন্তানের দেহবৃদ্ধির জন্য যৌন-ক্রিয়া অপরিহার্য।[৩]

মার্গারেট মীড নিউগিনির আরাপেশ (Arapesh) আদিম সমাজের সান্নিধ্যে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, তারা গর্ভসঞ্চারের প্রথম দুই মাস ঘন ঘন সঙ্গম-ক্রিয়া পরিচালনা করে। তাদের ধারণা দুই মাস পর সন্তান গর্ভ-গহ্বরে আসল স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। অতএব সঙ্গম-ক্রিয়ায় কোনো বাধা নেই।[৪]

দক্ষিণ নাইজেরীয়ার ইকাই (Ekai) আদিম সমাজ এ ব্যাপারে আরও উগ্রতার পরিচয় প্রদান করে। তাদের মতে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পূর্বদিন পর্যন্ত সঙ্গম-ক্রিয়া চলতে পারে।[৫]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, গর্ভকালে সঙ্গম-ক্রিয়া কেউ পছন্দ করছে আবার কেউ বিপরীতধর্মিতায় নিমগ্ন। এই উভয় অবস্থাই সংস্কারবদ্ধ ধারণার ফলশ্রুতি। এবং এই সংস্কার আছে বলেই তারা আদিম সমাজ হিসেবে টিকে আছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশও শুরু হয়েছে এই সংস্কারবদ্ধ ধারণার পথ মাড়িয়ে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজও কি এই 'হাঁ' এবং 'না' এর শিকার নয়? দুটো ধারাই কি তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল নয়?

১৩

সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির বিবাহ-পদ্ধতি জরিপ করে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ কাজ বিরকেত স্মীত মন্তব্য করেছেন, 'There is no people, no tribe on all the earth, which does not know marriage in one form or other. It is as universal as language, the use of fire and tools.'[১] কাজেই কথা বলার জন্য ভাষার যেমন প্রয়োজন, বাঁচার জন্য অগ্নির ও বিবিধ সামগ্রীর যেমন প্রয়োজন, সমাজ সমর্থিত দেহ-মিলন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য বিবাহ তেমনি প্রয়োজনীয়।

কখন থেকে মানব সমাজে বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে তার সঠিক দিন-তারিখ আজ পর্যন্ত কেউ নিরূপণ করতে সমর্থ হন নি। তবে যেদিন থেকে মানব মনে জ্ঞান (Science) ও বুদ্ধির (Sense) উন্মেষ ঘটেছে এবং মানব সংহত সমাজ গঠন করে বসবাস করতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তাদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি চালু হয়েছে। বলা যায়, জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয়ে যখন মানব সমাজে ধর্ম ও বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটে তখনই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য মান-অভিমান ইত্যাদি। এবং এসব গ্রথিত করার জন্যই বিবাহ গৃহীত হয়। কাজেই ধর্ম যেমন সুপ্রাচীন বিবাহ প্রথাও তেমনি সুপ্রাচীন কালের।

ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে যে, আদিম সমাজেতো বটেই, এমনকি বর্তমানের উচ্চতর সমাজের লোকও এককালে অনাবৃত থাকতো এবং যথেচ্ছাচার গমন ও বিহারের জন্য তাদের মধ্যে যৌন-মিলনে কোনো

বাধা ছিল না। এই বাধা সীমিত হয় এসে বিবাহ-বন্ধনে। উদাহরণ-স্বরূপ হিন্দু শাস্ত্রের কথাই বলা যাক। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নৃবিজ্ঞানী শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাভারতের বরাত দিয়ে যে উক্তি করেছেন তাতে হিন্দু-বিবাহের উৎস এবং তৎকালীন সমাজচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আধুনিক পরিবার গঠনের আগে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৎ-কালীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। তাই পাণ্ডুরাজা কুন্তীকে বলতে-পেরেছিলেন যে পূর্বে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তখন তারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করতে পারত, তাদের কারুর অধীনে থাকতে হত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে আসক্ত হলেও অধর্ম হত না অর্থাৎ তা-ই ধর্ম বলে বিবেচিত হতো। তির্যগ্‌যোনিগত কাম ও দ্বেষ বিবর্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্মানুসারে কার্য করে থাকে। মহর্ষিগণ এই ধর্মের প্রশংসা করে থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম প্রচলিত আছে।........এই ধর্ম অনুসারে যখন এক ব্রাহ্মণ উদ্দালক-পত্নীকে তাঁর স্বামী ও পুত্রের সামনে এসে প্রস্তাব দিলেন—'এসো আমরা যাই', তখন সেই মহিলা নিজ ধর্ম প্রতিপালনার্থে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন। পিতার সমক্ষেই মাতাকে অন্য পুরুষের ব্যবহারের এ দৃষ্টান্ত ঋষি পুত্রকে উত্তপ্ত করে তুলল। পুত্রের ক্রোধ দেখে পিতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বৎস! ক্রোধ করো না; এটা নিত্যধর্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মে লিপ্ত হন না।' পিতৃবাক্যে পুত্র সন্তুষ্ট হলেন না। এই নিত্যধর্ম যে অধর্ম এবং স্ত্রীলোকদের পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে বিহার যে সতীধর্মবিরোধী তা প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি বিধি জারী করে বললেন যে অদ্য থেকে যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ সংসর্গ করবেন এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবেন, তাদের উভয়কে ভ্রূণ হত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হতে হবে। এবং স্বামী পুত্রোৎ-পাদনার্থে কোন পুরুষ নিয়োগ করলে যে-স্ত্রী তাঁর আদেশ লংঘন করবেন তাঁরও ঐ পাপ হবে। শ্বেতকেতু প্রবর্তিত এই নিয়ম বা বিধিই বিবাহ।'[২]

এতো গেলো হিন্দুশাস্ত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারে প্রায় একই নিয়ম আরোপিত। সমাজের প্রথম

স্তরে সমাজ কাঠামো ছিলো মাতৃ-তান্ত্রিক—সন্তান সন্ততিরা মাতা ছাড়া পিতৃ-পরিচয় জানতো না। অবশ্যি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এখনো পৃথিবীতে ঢের রয়েছে। সিলেটের খাসীয়া সমাজ তার অন্যতম প্রমাণ। সমাজে মাতৃতান্ত্রিক নিয়ম চালু থাকার ফলে নারীরা যেমন ছিল বহুচারিণী পুরুষগণও ছিল তেমনি বহু নারীতে আসক্ত। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুস্থ এবং নির্মল জীবন যাপন করতে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন হয় রাজা-বাদশাগণ, নতুবা ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীপ্রধানগণ। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বত্রই পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহগণ কিংবা গোষ্ঠী প্রধানরা বিবাহ-পদ্ধতি চালু করেন। এ প্রসঙ্গে চীনদেশের পরাক্রমশালী রাজা ফৌহি, মিসরের সম্রাট মিনিস, গ্রীস দেশের মহাপুরুষ সিক্রপ্‌স্‌, ল্যাপল্যাণ্ডের আতজিস প্রমুখের নাম করা যায়। তাঁরা নিজ নিজ দেশে বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

আদিম সমাজ সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। যখন তাদের মধ্যে বিবেক, বুদ্ধি ও ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তখন থেকেই তাদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন শুরু হয়েছে। অবশ্যি বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্রীয় বিধান, লৌকিক ও স্ত্রীআচার এসব পরের সৃষ্টি। এবং এসবের মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বিদ্যমান।

যৌবনপ্রাপ্ত হলেই আসলে বিয়ের উপযুক্ত সময়। পারিবারিক জীবন, সংসারধর্ম এবং সম্পত্তির মালিকানা ছাড়াও বৈধভাবে সন্তান উৎপাদন করে পৃথিবীকে জনবহুল করার দায়িত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য বিবাহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মগ, চাকমা, টিপরা, গারো, হাজং প্রভৃতি উপজাতীয় সমাজের প্রবীণদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, কেবল যৌনসম্ভোগই বিবাহের আসল উদ্দেশ্য নয়—আসল উদ্দেশ্য বিবাহযোগ্য যুবকের জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গিনী বা বান্ধবী, শান্তির আশ্রয় এবং সুখের সংসার প্রয়োজন। সেই সংসারে থাকবে বৈধজাত সন্তান-সন্ততি—যাদের তারা নিজস্ব সন্তান বলে দাবী করতে পারবে। সর্বোপরি মা, বাবা, ভ্রাতা, ভগ্নি, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞাতি-ভিত্তিক সমাজের মানব-মানবী। তাদের ধারণায় স্ত্রী হলো 'শান্তির আশ্রয়'—যে ধারণার সঙ্গে ঋগ্বেদের একটি সূত্রের অসম্ভব মিল লক্ষ্য

করা যায়: 'ওঁ ইন্দ্রানী-মাস্থ নারীষু শুভগামহশ্রবম' অর্থাৎ নারী জাতি পরম শান্তির আশ্রম।

বিবাহোত্তর কালে নারীর সান্নিধ্যে যৌন-সম্ভোগ তো আছেই, তদুপরি রয়েছে সংসার ধর্ম পালনের মাধ্যমে পারিবারিক দায়িত্ববোধ অর্জন করা। প্রসঙ্গতঃ ই. ডব্লিউ. বুরগেস-এর মন্তব্যটি যথার্থতাব দাবী রাখে: '.........the sexual impulse in itself is not sufficient to insure more than the casual union of the sexes.'[৩]

কাজেই ছেলেমেয়ে বয়োপ্রাপ্ত হলেই বিয়ের প্রশ্ন ওঠে এবং এ ব্যাপারে সাধারণ দৃষ্টিতে পিতামাতা বা অভিভাবকরাই অগ্রণী। বলা যায় যে, শুধু বয়োপ্রাপ্ত হলেই চলবে না—লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছেলে স্বাস্থ্যবান কিনা, উপার্জনক্ষম কিনা কিংবা সংসারধর্ম পালনে সমর্থ কিনা।

পাগল কিংবা চিররুগ্ন ছেলে-মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ অবাস্তব বলে বিবেচনা করা হয়।

১৪

বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসী সমাজেই বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। সর্বাধিক উপজাতীয় অধ্যুষিত জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যা জানতে পেরেছি তাতে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের রেওয়াজ একরূপ নেই বললেই চলে। তবে রাঙ্গামাটি রাজবংশ সম্ভূত শ্রীসলিল রায় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে জানা গেছে যে, ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৩০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সারদা আইনের হিড়িকে বহু বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। বলা যায় যে, সারদা আইনের স্রোত শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, এই উপমহাদেশের সর্বত্রই জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্লাবন জাগিয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "বাল্যবিবাহ বন্ধ আইনই" সারদা আইন নামে খ্যাত। ১৯২৭ সালে শ্রীহরবিলাস সারদা আইন সভায় বিলটি উত্থাপন করেন। প্রথমতঃ তা হিন্দুদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল এবং এতে বলা ছিল যে বারো বছরের কম কোনো মেয়ের এবং পনর বছরের কম কোনো ছেলের বিবাহ হতে পারবে না। ১৯২৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম বিলটি নিয়ে আইন সভায় বিতর্কের সূচনা করে এবং বিলটি অনুমোদনের জন্য নির্বাচন কমিটিতে পেশ করা হয়। তখন তা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য হয় এবং বিবাহের সময়সীমা মেয়েদের জন্য চৌদ্দ বছর এবং ছেলেদের জন্য আঠার বছর ধার্য করা হয়। ১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বিলটি নির্বাচন

কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস থেকে কার্যকরী হয়।[১]

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার গারো সমাজে এককালে 'ঠ্যাং ধরা' বিয়ে নামে খ্যাত যে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে সে বিবাহ-পদ্ধতিও অবলুপ্ত হয়েছে। 'ঠ্যাং ধরা বিয়ের' প্রধান নায়িকা কনে। সে থাকতো খুব ছোট। নির্দিষ্ট দিনে কনের মাতা কনেকে কোলে নিয়ে বিবাহের জন্য নির্মিত কুটিরে বসতো। গ্রাম্য মাতব্বর ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে বর এসে কনের মাতার ঠ্যাং অর্থাৎ পা ধরে বিবাহের স্বীকৃতি দিতো এবং অবশেষে শ্বাশুড়ীকে নববধূসহ নিজ গৃহে যেতে অনুরোধ করতো। এ ভাবে কনে বয়োপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত তার মাতাপিতা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এমনকি মেয়েসহ মাতা জামাতার বাড়ীতে অবস্থান করতো বলে জানা যায়। তাছাড়া, কনে বয়োপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়াও ছিল সমাজ সমর্থিত। বর্তমানে অবশ্যি এই রীতির অবসান ঘটেছে।

বাংলাদেশের একমাত্র রাজবংশী সমাজেই বাল্য বিবাহের প্রচলন এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। বিয়ের পর কনে বয়োপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই অবস্থান করে। কনের প্রথম রজোদর্শনের পর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো 'গৌণ' অথবা 'বিদা'[২] অনুষ্ঠানের পর বর ও কনে স্বামী-স্ত্রীরূপে ঘর-সংসার করবার অধিকার পায়। গৌণ অথবা বিদা তাদের দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা, আসল বিয়ে এবং গৌণ বিয়ের মধ্যেকার সময়কালের পার্থক্য থাকে বেশ কয়েক বছর। উভয় বিয়েতেই জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়।

আদিবাসী সমাজে বাল্যবিবাহের যে সামান্য উল্লেখ দেখা যায় তার অন্তরালে সবচেয়ে বড় কারণ রয়েছে উভয়পক্ষের সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থিরিকৃত করার ব্যাপার মীমাংসা করা। সহায়-সম্পত্তির মালিকানা নির্ণয় কিংবা সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যদি দেখা যায় যে, পিতার একমাত্র কন্যা অবশিষ্ট আছে এবং তার অবর্তমানে শরীকেরা তার সম্পত্তি ভোগ দখল করবার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে সে মেয়েকে বাল্যকালেই বিয়ে

দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার সম্পত্তির মালিকানা একমাত্র মেয়ে ও জামাই 'হতে পারে। নতুবা সে সম্পত্তি অন্যের হাতে পরে মালিকানা স্বত্ত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

রাজবংশী প্রভৃতি আদিম সমাজকে উপরোক্ত কারণে 'পেটে পেটে বিবাহ' রীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়ই ভবিষ্যৎ পুত্র-কন্যা কল্পনা করে বিবাহ-চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হয়। এজন্য ব্রত অনুষ্ঠানও পালন করা হয যাতে গর্ভজাত সন্তান যথাক্রমে ছেলে এবং মেয়ে রূপে জন্মলাভ করে। এ ধরনের বিয়েতে ভবিষ্যৎ বর কনের বাবা-মা লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বর ও কনে বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের চুক্তি সম্বলিত সহায় সম্পত্তি অর্পণ করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ বিবাহের প্রচলন আছে। ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফুগাউ (Ifugao) আদিবাসী সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজের প্রায়ই একই ধারা অনুসরণ করে। ইফুগাউ সমাজের রীতি অনুসারে যার যতো সম্পত্তি থাকবে সে ততো মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া কন্যা যেখানে সম্পত্তির মালিক হতে পুত্রদের মতোও সমান দাবীদার সেখানে সম্পত্তির এবং একই সঙ্গে মর্যাদার অধিকারী হওয়ার লোভে বাল্যবিবাহের প্রচলন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি গর্ভাবস্থায়ও ছেলেমেয়ে কল্পনা করে ভবিষ্যৎ বিয়ের চুক্তিতে তাদেরকে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। বাল্যবিবাহের পর ইফুগাউ ছেলেমেয়েরা যার যার পিতামাতার সঙ্গে অবস্থান করে। বয়োপ্রাপ্ত অথবা সংসারধর্ম পালনের উপযুক্ত হলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ সম্পত্তি তাদের অর্পণ করা হয়।[৩]

১৫

বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজে সাধারণতঃ পিতামাতা বা অভিভাবক শ্রেণীর লোকেরাই বয়োপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে মনোমিলনে (Love-marriage) বিবাহ এবং জোর-জবরদস্তীমূলক (Force-marriage) বিবাহও যে না আছে এমন নয়।

মনোমিলনে বিবাহ সব আদিবাসীদের মধ্যেই রয়েছে তবে বাংলাদেশের মুরং, মগ, চাকমা, খাসীয়া, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতিদের মধ্যেই মনোমিলনে বিবাহের প্রচলন বেশী। মনোমিলনে বিবাহ সম্পর্কে চাকমাদের 'মহামুনি মেলা' কেন্দ্রিক যুবক-যুবতীদের পালিয়ে যাওয়ার রীতি সম্বলিত বিবাহ এবং মুরংদের 'চম্পুয়া'-উৎসব ভিত্তিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক-যুবতীদের পালানো রীতি সম্পৃক্ত বিবাহ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

সাঁওতালদের রাজারাজি বিবাহও মনোমিলনে বিবাহের পর্যায়ভুক্ত। চাকমা ও মুরংদের মনোমিলনে বিবাহের সঙ্গে কিছুটা তফাৎ আছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মনোমিলনে বিবাহ এবং পালিয়ে যাওয়া রীতিতে বিবাহ (Marriage by Elopement) একই ধারা অনুসরণ করে।

জোর-জবরদস্তীমূলক (Marriage by Force) বিবাহ একমাত্র সাঁও-তালদের মধ্যেই প্রচলিত। এই বিবাহ পদ্ধতি সাঁওতাল সমাজে হুরকাটারা বা ইতুত নামে খ্যাত। হুরকাটারা বা ইতুত বিবাহে ছেলের জবরদস্তি-

মূলক পরিচয় বিধৃত আবার বিপরীতধর্মী অর্থাৎ মেয়ের বেহায়াপনার রীতিও সাঁওতাল সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের বিয়ে নিরবোলক নামে খ্যাত।

পাশ্চাত্য দেশের আদিবাসীদের বলপূর্বক বিবাহে (**Marriage by Capture**) যে কৃত্রিমযুদ্ধের পরিচয় বিধৃত সাঁওতালদের হুরকাটারা বা ইতুত কিংবা নিরবোলক বিবাহে তা অনুপস্থিত। বলপূর্বক বিবাহ পাশ্চাত্যের আদিবাসীদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই বিবাহে বর যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তার মধ্যে নিহিত রয়েছে বরের শৌর্য-বীর্যের লক্ষণ।[১]

আফ্রিকার বুশম্যান (**Bushman**) যুবক বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বলপূর্বক কনেকে আনতে গেলে আত্মীয় পরিজন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন বরের সঙ্গে চলে রীতিমত যুদ্ধ। যুদ্ধে যদি যুবক জয়ী হয় তবে সে কনে আনবার অধিকার পায় নতুবা তাকে কনে হারাতে হয়।[২]

এতদঞ্চলের বাহিমা (**Bahima**) আদিবাসী সমাজের বরকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। প্রথমতঃ বর ও কনে পক্ষ দড়ি টানাটানি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বর যদি লক্ষ্য করে যে তার দল পরাজিত হতে যাচ্ছে তখন সে কনেকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাকে বাধাদান করে। এই বাধা অতিক্রম করতে পারলে সে কনে গ্রহণ করবার অধিকার পায়।[৩]

উত্তর প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের কোরিয়াক (**Koryak**) আদিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ রীতি রয়েছে। যখন পিতা বুঝতে পারেন যে, অন্য কোন উপায় নেই তখন তিনি বরকে বলপূর্বক কনে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ....তখন কনের মাতাও কনেকে সাবধান করে দেন যে বর তাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাবে। কনেও কিন্তু অনড়। সেও যুদ্ধ ছাড়া বশ্যতা স্বীকার করতে নারাজ: **'Custom requires that the bride shall not surrender without a struggle, even if she loves her bridegroom. Should the bridegroom find his bride undressed in the separate sleeping tent which she is given before marriage, he would not touch her, considering the accessibility an offence to himself. The bride's resistance is a test of her**

chastity. Accordingly, with aid of her friends, the bride ties up with thongs the sleeves and trousers of her combination suit, so that it cannot be taken off without untying or cutting the thongs. On the day when the bridegroom obtains the right to seize the bride, the latter goes about thus tried up, and tries to run away when her bridegroom approaches her. The bridegroom seizes an opportunity to attack her unawares, to tear or cut the garments with a knife, and touch her sexual organs with his hand. When he has succeeded in doing so, the bride ceases resist, and submissively leaves the beidegroom to her tent.[8]

রাশীয়ার সামোয়েড (Samoyeds) এবং সাইবেরীয়া অঞ্চলের তুংগোজেস (Tunguzes) এবং কামচাডেল (Kamchadels) আদিবাসীদের মধ্যেও নিয়ম প্রচলিত যে, বরের বীরোদ্দীপ্ত যুদ্ধ ছাড়া কন্যা সম্প্রদান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যুদ্ধে কখনো কখনো বরকে মৃত্যুবরণ করতেও দেখা যায়।[৫]

আদিম মানব সমাজের বলপূর্বক বিবাহ রীতি সম্পর্কে লর্ড কেমস্ উল্লেখ করেছেন যে, 'বিবাহের দিন সকালে বর তার বন্ধু-বান্ধবসহ কনে দাবী করে। কনেপক্ষ আত্মীয়-স্বজনসহ ঘোরতর প্রতিবাদ করে। ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাত্রীকে আড়াল করে যুদ্ধ চলতে থাকে কিন্তু বরের বীর বিক্রম সেইসব প্রতিহত করে বিজয়ীর বেশে কনে নিয়ে আসে।[৬]

উত্তর আফ্রিকার ওয়াকামবা (Wakamba) আদিবাসীদের মধ্যেও একই নিয়ম প্রচলিত। কনের পিতামাতা যুদ্ধ ছাড়া বরের কাছে কনে সম্প্রদান করতে রাজী নয়।[৭]

ইতিপূর্বে সাঁওতালদের হুরকাটারা বা ইতুত কিংবা নিরবোলক বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। হুরকাটারা বা ইতুত বিবাহে ছেলে যখন মেয়ের কপালে বলপূবক সিঁদুর পরিয়ে দেয় তখন ছেলেকে মেয়ের এমনকি মেয়ের অভিভাবকদের গঞ্জনা কিংবা মারধোর পর্যন্ত সহ্য করতে হয়।

অনুরূপভাবে নিরবোধক বিবাহে মেয়ের বেহায়াপনার জন্য গালাগালি তো দূরের কথা শুকনো মরিচ পুড়ে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা অপরিহার্য।

তথাপি সে ভবিষ্যৎ স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করে চলে আসে না। যন্ত্রণা গঞ্জনা, গালাগালি সহ্য করে টিকে থাকাও 'বলপূর্বক বিবাহের' (**Marriage by Capture**) লক্ষণ।

উল্লেখযোগ্য যে, আফ্রিকার কাফিরদের মধ্যেও দেখা যায় বর কনের গালাগালির শিকার হয় এবং গালাগালির জ্বালা অতিক্রম করতে পারলেই তারা স্বামী স্ত্রীতে রূপলাভ করে।[৮]

এমন কি পাঞ্জাবের আদিম সমাজেও লক্ষ্য করা যায় যে, কনে পক্ষ বর পক্ষকে জাত তুলে অসম্ভব গালাগালি করে।[৯] প্রসঙ্গত ই. ক্রলে'র মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে: **'.........the abuse is directed against the evil eye and possible external danger to the young couple.'**[১০]

মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বলপূর্বক বিবাহ রীতি লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর বি. ম্যালিনৌসকী, ডক্টর মারগারেট মীড, সি. জি. সেলিগম্যান প্রমুখ প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদও বলপূর্বক বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

সি. জি. সেলিগম্যান বৃটিশ নিউগিনির রোরো (**Roro**) আদিবাসীদের বলপূর্বক বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বর ও কনে বন্ধু-বান্ধব মিলে কনের পিতামাতার বাড়ী পর্যন্ত দখল করে ফেলে। সেলিগম্যানের বর্ণনা অনুযায়ী:

The bride rushes out and runs away as fast as she can and although she is soon overtaken and caught, she defends herself to the best of her ability, with hands, feet and teeth. Meanwhile a sham fight rages between the adherents of the bride and bridegroom. In the midst of the commotion is the bride's mother armed with a wooden club or digging stick, striking at every inanimate object within reach and shouting curses on the ravishers of her daughter. finding this useless, she collapses, weeping for the loss of her child. The other woman of the village join the weeping. The girl's mother should keep up the appearance of extravagant grief for three

days, and she alone of the girl's relations does not accompany the bride to her father-in-law's house ....a mockpillage of houses and gardens of the boy's local group also takes place, though it is clear that no expensive shell ornaments or other really valuable property such as fishing nets' would be taken.[১১]

হিন্দুধর্মেও বলপূর্বক বিয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণখ্যাত সুগ্রীব ও তারার বিবাহ এবং বিভীষণ ও মন্দোদরীর বিবাহ বলপূর্বক বিবাহেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লেখযোগ্য যে, বলপূর্বক বিবাহে বরের শৌর্যবীর্যের পরিচয় বিধৃত এবং অল্প খরচে কন্যালাভ--এসবই হয়ত এর গুণগত দিক। কিন্তু বলপূর্বক বিবাহের অপকার অনেক। বিবাহ অর্থই হলো দুইটি আত্মার যোগসূত্র অর্থাৎ একজন অপরজনের পরিপূরক। একটি টাকার এ পিঠ আর ওপিঠ। তাছাড়া বিবাহে জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের কাঠামোও সুদৃঢ় করে। কিন্তু বলপূর্বক বিবাহে এসব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাছাড়া অর্থ সম্পদ, অলঙ্কার পত্র ইত্যাদি থেকেও বরকে নিরাশ হতে হয়। নারী যে শান্তির আশ্রয় এই নীতি বাক্যের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না বলপূর্বক বিবাহে।

১৬

আদিবাসী ধারণায় বিবাহ অনুষ্ঠান কালেই সবচেয়ে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা এই সময়েই অপদেবতার কোপানলে পড়বার সম্ভাবনা প্রচুর। যে কারণে আদিম সমাজ ফসলক্ষেত রক্ষার জন্য অনুষ্ঠান অথবা নিয়ম পালন করে থাকে ঠিক একই কারণে তারা বিবাহের সময়ও অনুরূপ অনুষ্ঠান অথবা নিয়ম পালন করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহটাও ঠিক যেন ফসলক্ষেতের মতই—সন্তান সন্ততি জন্মাবার পূর্ব প্রস্তুতি।

অপদেবতার কোপানল থেকে নিষ্কৃতি পাবার অভিপ্রায়ে অনেক আদিম সমাজ প্রথমতঃ বর ও কনের যথাক্রমে আমগাছ, শেওড়া গাছ অথবা মহুয়া গাছের সঙ্গে বিয়ে দেয়। অতঃপর বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসল বিয়ে সমাধা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ রাজবংশীদের 'গো গাছ প্রথা'র উল্লেখ করা যায়। এই প্রথা অনুসারে বিয়ের দিন বরকে উত্তমরূপে সজ্জিত করার পর তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা বিশেষ আনন্দ স্ফূর্তির মাধ্যমে নিকট-বর্তী মহুয়া গাছ কিংবা শেওড়া গাছের সন্নিকটে তাকে উপস্থিত করে। এখানে প্রাথমিক অবস্থায় বরকে মহুয়া অথবা শেওড়া গাছকে বিয়ে করতে হয়। শেওড়া অথবা মহুয়া গাছে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বর সেই গাছ আলিঙ্গন করে। অতঃপর বরের আত্মীয়-স্বজনেরা মিলে বরের ডান হাতের সঙ্গে সুতো দিয়ে গাছ আবদ্ধ করে। সবশেষে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সুতো ছিন্ন করে তারা কনের বাড়ীতে গমন করে কনে তুলে আনবার জন্যে।

সাঁওতাল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও এমনি 'অসবর্ণ' পদ্ধতিতে বিবাহ সমাধা করতে দেখা যায়। সাঁওতালদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত যে, বাল্যকালে যদি কোন ছেলে বা মেয়ের উপরের মাড়িতে প্রথম দাঁত ওঠে তবে মনে করা হয় যে দেবতার কোপে এরূপ হয়েছে। তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের দেবতার কোপ থেকে রক্ষাকল্পে প্রথমে কুকুর কিংবা শেওড়া গাছ্ অথবা মহুয়া গাছের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়।

কুকুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে তা 'শেতা বাপলা', শেওড়া গাছের সঙ্গে বিয়ে দিলে তা 'দাইবান বাপলা' অথবা মহুয়া গাছের সঙ্গে বিয়ে দিলে তা 'মাতকোম বাপলা' নামে খ্যাত হয়।

এসব বিয়েতে বিশেষ আনন্দ ও নৃত্য গীতের মাধ্যমে বর ও কনেকে কুকুর কিংবা শেওড়া গাছ্ অথবা মহুয়া গাছ্-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। আগে থেকেই তাদেরকে নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়। এবং বর অথবা কনেকে প্রথমে তাদের যে কোন একটি গাছকে বিয়ে করে অতঃপর বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরের দিন বর ও কনে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করবার অধিকার পায়।

মুণ্ডাদের মধ্যেও 'অসবর্ণ' পদ্ধতিতে বিবাহ রীতির প্রচলন আছে। বিয়ের দিনে বর ও কনের গায়ে ভাল করে তেল ও হলুদ মেখে বরকে আমগাছ ও কনেকে মহুয়া গাছ্ বিয়ে করতে হয়। কাছাকাছি মহুয়া গাছ না থাকলে উভয়েকেই আমগাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

রাজবংশীদের মত মুণ্ডারাও মহুয়া কিংবা আমগাছে সিঁদুর লেপন করে এবং অতঃপর গাছের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। এমনকি সুতো দিয়ে বর ও কনেকে গাছের সঙ্গে বেঁধেও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুতো ছিন্ন করলে বর সেই গাছ্ থেকে সিঁদুর এনে কনের কপালে এঁকে দেয়। এভাবেই তাদের বিয়ে সমাধা হয়।

মুণ্ডাদের মতে বর ও কনের ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে কোন অপদেবতার কুনজর না পড়ে সে জন্যেই অসবর্ণ বিয়ের মাধ্যমে গাছের মধ্যে সেই কোপ রূপান্তরিত করাই আসল উদ্দেশ্য। জে. জি. ফ্রেজারের মতে এই ধরনের বিয়ের অন্তর্হিত রূপ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে 'টোটেম' সম্ভূত গোষ্ঠী বা গোত্রই 'টোটেম' এড়াবার জন্যে এরূপ করে থাকে।[১]

ভারতের কেদারা কুমবি কিংবা পাতিদারদের মধ্যে প্রচলিত 'প্রভু বিবাহ'ও অসবর্ণ পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত। তাদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত যে, মেয়ের বয়স বারো বছরে পদার্পণ করলেই তাকে বিয়ে দিতে হবে। যদি কোন কারণে এই সময়ের মধ্যে বিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাকে চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। এই বিপদ এড়াবার জন্য সেই মেয়েকে প্রথমে একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় এবং পরের দিন সেই ফুলগুচ্ছ পাঁতকুয়ায় ফেলে দিলেই সেই মেয়েকে আর কেউ আইবুড়ো আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারে না। অতঃপর যে কোন সময়ে তার বিয়ে হতে পারে।[২]

পাঞ্জাবের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে চারবার পর্যন্ত বিয়ে করার নিয়ম আছে। তৃতীয় বার বিয়ের আগে অবশ্যি প্রথমে বরকে একটি আঁখ গাছ বিয়ে করতে হবে। তবে সে চতুর্থবারের মতো বিয়ে করবার অধিকার পাবে।[৩]

বাংলাদেশের রউতিয়া আদিবাসীদের মধ্যেও নিয়ম প্রচলিত যে, বিয়ের আগে তাদেরকে আম গাছ বিয়ে করতে হয়।[৪]

বাংলাদেশের কুর্মীদের মধ্যেও বৃক্ষ বিবাহের রীতি প্রচলিত। নির্দিষ্ট দিনে বরকে আম গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বর আম গাছকে কনে কল্পনা করে তার গায়ে সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং সাঁওতাল বা রাজবংশীদের মত গাছকে আলিঙ্গন করে। বরের ডান হাতের কনুই এবং গাছের সঙ্গে সুতো বেঁধে দেওয়ারও নিয়ম আছে। কনেকে বিয়ে দেওয়া হয় আম গাছের সঙ্গে। পরিশেষে বরকে বিবাহের নিমিত্ত তৈরী ছোট ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে বন্ধু বান্ধবরা সেই ঘর কাঁধে করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। কনেকে নিয়ে আসে ঝুড়ির মধ্যে স্থাপন করে। অতঃপর বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসল বিয়ে সমাধা করা হয়।

যে বিশ্বাসে আদিম সমাজ বৃক্ষ বিবাহের পক্ষপাতি ঠিক একই বিশ্বাসে তাদের মধ্যে হাড়ি-পাতিল, বন্দুক-বল্লম কিংবা তরবারির সঙ্গেও বিবাহকর্ম সমাধা করতে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রসঙ্গতঃ হিমালয় পাহাড়ী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বরকে প্রথমে হাঁড়ি পাতিলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার রীতির উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যি জ্যোতিষের গণনার উপর

নির্ভর করতে হয়। জ্যোতিষের গণনায় যদি বরের কোন অশুভ লক্ষণের ইংগীত পাওয়া যায় তখনই তাকে আসল বিবাহের আগে মাটির পাতিল বিয়ে করতে হয়।[৫]

আদিম সমাজের এই 'অসবর্ণ বিবাহ' রীতির অন্তরালে যে ধারাটি সবচেয়ে ক্রিয়াশীল তা হলো অপদেবতার কোপানল এড়ানো এবং নবদম্পতির সম্ভাব্য বিপদ-আপদ গাছের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো। প্রসঙ্গত ডব্লিউ ক্রুকের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে এই ধরনের বিবাহ **'seems to the point to the fact that the marriage may be intended to divert to tree some evil-influence, which would otherwise attach to the wedded pain.'**[৬]

প্রখ্যাত ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ এম. ভন. গেন্নেপ-এর মন্তব্যে ভিন্ন অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, এই ধরনের বিবাহ **'a rite of initiation into the totemic clan, woven into the marriage ceremonies.'**[৭]

সাঁওতাল, রাজবংশী, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম সমাজভুক্ত প্রবীণদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, বৃক্ষ বিবাহে অপদেবতার কোপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অভিপ্রায় ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হলো সন্তান সন্ততি লাভের আকাংক্ষা। কেননা, যে বনদেবতা ও বনদেবীর কতৃত্বাধীনে বৃক্ষরাজি রয়েছে সেই বৃক্ষরাজির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সেই দেবদেবীর আশীর্বাদে নবদম্পতির সন্তান সন্ততি গাছের ডাল পালার মতই বিস্তার লাভ করবে। তাছাড়া বৃক্ষ হলো উর্বরতা শক্তির (**Fertility Cult**) প্রতীক। কাজেই বৃক্ষের সঙ্গে সুখ সম্পর্ক জীবনের ঘরেও সুখের স্পর্শ আনবে বলে তাদের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস থেকেই আদিম সমাজে বৃক্ষ পূজার সূত্রপাত হয়েছে।

বনদেবী যে উর্বরাশক্তির ধারক ও সন্তানদায়িনী ক্ষমতার অধিকারিনী এই বিশ্বাসের সূত্র সুপ্রাচীনকালের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় তার উল্লেখ বর্তমান। প্রসঙ্গত বনদেবী ডিয়ানার উল্লেখ করা যায় : **'For Diana, like Artemis, was a goddess of fertility in general, and of childbirth in particular......There is at least**

nothing absured in the supposition, since even in the time of Pliny a noble Roman used thus to treat a beautiful beech-tree in another sacred grove of Diana of the Alban Hills. He embraced it, he kissed it, he lay under its shadow, he poured wine on its trunk. Apparently he took the tree for the goddess. The custom of physically marrying men and women to trees is still practiced in India and other parts of the East. Why should it not have obtained in ancient Latium?'[৮]

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় এই ধরনের বিবাহকে 'কৃত্রিম বিবাহ' বা (**Fictive Marriage**) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই 'কৃত্রিম বিবাহ' শুধু গাছ গাছড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। গাছ গাছড়া ছাড়াও মাটির হাড়ি, পাতিল, তরবারি, বল্লম, পাথর এমনকি মানব প্রতিনিধি (**Proxy**)-এর মাধ্যমেও বিবাহ সমাধা করতে দেখা যায়। এসব বিবাহের অন্তরালে অপদেবতার কোপ কিংবা সংস্কারবদ্ধ ধারণাই প্রচ্ছন্ন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হিমালয় অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মাটির পাতিলের সঙ্গে বিবাহ তার অন্যতম প্রমাণ।

দক্ষিণ সেলিবিস অঞ্চলের কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে মানব প্রতিনিধির মাধ্যমে বিবাহ সমাধা করতে দেখা যায়। যারা প্রতিনিধিত্ব করে আঞ্চলিক ভাষায় তাদের **'Doeta'** বলা হয়। যদি কনের প্রতিনিধি পুরুষ হয় তবে বরের প্রতিনিধি মহিলা হতে হবে। বর ও কনে কেউ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে না। বরকে কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয় কিন্তু বিয়ে পড়ানো হলেও সে কনে দেখবার অধিকার পায়না এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে একটি তরবারি রেখে সে নিজ গৃহে ফিরে যায়। তিনদিন পর আবার ফিরে এসে তরবারিটা কনেকে উপহার দিয়ে আসল বিয়ে সমাধা করার পর তবে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করবার সুযোগ পায়।[৯]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ই. এ. হোবেল, এফ. বোয়াস প্রমুখ আফ্রিকার কবাকিউট (**Kwakiutl**)এবং নুয়ার (**Nuer**) আদিবাসীদের মধ্যে যে কৃত্রিম বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করেছেন তা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই সমস্ত বিবাহ সংঘটিত হয় সন্তানহীন নর নারীদের কেন্দ্র করে—তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য। এফ. বোয়াস-এর বর্ণনায় আছে:

In such a case, a man who desires to acquire the use of a crest and the other privileges connected with the name performs a sham marriage with the son of the bearer of the name. The ceremony is performed in the same manner as a real marriage. In case the bearer of the name has no children at all, a sham marriage with a part of his body is performed, with his right or left side, a leg or an arm, and the privileges are conveyed in the same manner as in the case of a real marriage.[১০]

নুয়ার আদিবাসী সমাজে 'কৃত্রিম বিবাহে'র আর একটি নিদর্শন হলো বন্ধ্যানারীর কাল্পনিক বিবাহের আয়োজন। নুয়ার আদিবাসীদের বন্ধ্যা নারীকে পুরুষের মর্যাদা দান করা হয়। তার সম্পত্তির অংশীদার কে হবে এই বিবেচনায় বন্ধ্যা নারীর নামে বিয়ের আয়োজন চলে। একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে হয় এবং পুরুষ ব্যক্তি বন্ধ্যা নারীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার সন্তান বন্ধ্যা নারীর সন্তানরূপে পরিগণিত হয় এবং সম্পত্তির মালিক হতে তাদের আর কোন বাধা থাকে না।[১১]

১৭

'আদিবাসী সমাজের আদিমতম নিদর্শন সমূহের অন্যতম নিদর্শন যৌথ বিবাহ (Group marriage). বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে যৌথ বিবাহের অস্তিত্ব অনুপস্থিত। রবার্ট ব্রিফল্ট কোন্দ ও সাঁওতালদের মধ্যে যৌথ বিবাহের এমনকি স্ত্রীর ভগ্নিদের সঙ্গে সঙ্গম রীতির কথা উল্লেখ করেছেন :

Among the Konds.....the Santals, also representatives of the aboroginal race, man has right of access to all the yonnger sisters of his wife, and so have his younger brothers. In other words, there is complete group marriage, In addition a Santal uncle is permitted a good deal of freedom of intercourrse with all his wife's neices, a feature which derives from the age grade organizaton.[১]

দীর্ঘদিন সাঁওতালদের সংস্পর্শে থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত তো নজরে পড়েই নি; এমনকি তাদের সঙ্গে আলাপ করেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে বলে জানতে পারি নি। অসভ্য ও বর্বর থাকা অবস্থায় কোনোকালে হয়ত এর অস্তিত্ব সংগুপ্ত ছিল কিন্তু সভ্যতার আলোক অনেক অশোভন অন্ধকারই বিদূরিত করতে সমর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে এই রীতিও অন্তর্হিত।

যৌথ বিবাহের প্রচলন নীলগিরি পর্বতের টোডা (Toda) আদিবাসী-দের মধ্যে এখনও বর্তমান আছে। একই সঙ্গে বহু পতিত্ব বরণ রীতি

নির্বিবাদে এই টোডাগণ বলবৎ রেখেছে। দীর্ঘদিন টোডাদের সংস্পর্শে থেকে মেজর রস কিং[২] উপলব্ধি করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি নিয়ে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কালাতিপাত করে। সন্তানগণও তাদের কল্পিত বাবাদের কাছ থেকে সমান ভাবেই আদর যত্ন পায়।

কানাউর অঞ্চলের কানেট (**Kanet**) এবং জাট (**Jat**) প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও বহু পতিত্ব বরণ রীতি লক্ষ্য করা যায়। স্যার ডেনজিল ইবেটসন-এর[৩] বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর অন্যান্য ভাইয়েরাও নির্বিবাদে সহবাস করতে পারে। সামাজিক আইনে এটা মোটেই দোষণীয় নয় এবং এ জন্যে কারও কোন ক্ষোভের কারণ নেই। টোডাদের মত এদের সন্তান-সন্ততিও কল্পিত বাবাদের কাছ থেকে একই ভাবে আদর যত্ন ও ভরণ পোষণ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে।

আদিবাসী সমাজ বিভিন্ন রকম গোত্র উপগোত্রে বিভক্ত। একারণে তাদের মধ্যে বিবাহ রীতির দুইটি পর্যায় লক্ষ্যযোগ্য--অন্তর্বিবাহ (**Endogamy**) এবং বহির্বিবাহ (**Exogamy**).

বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের রীতি অনুপস্থিত। চাকমা, টিপরা, হাজং, দালুই, হদি, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ অর্থাৎ একই গোত্র কিংবা একই পরিবারভুক্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। তাছাড়া টোটেম চিহ্ন সম্ভূত পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাহ হতে দেখা যায় না। অবশ্যি জোর জবরদস্তিমূলক বিবাহ, পলায়নরীতি সম্ভূত বিবাহ কিংবা প্রেম ঘটিত বিবাহে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কাজেই বহির্বিবাহ রীতিই এদের মধ্যে প্রচলিত।

অন্যান্য আদিবাসী যেমন লুসাই, কুকী, পাংখো, খুমী, সেন্দুজ প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্বিবাহ রীতি প্রচলিত থাকলেও একই পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হতে দেখা যায় না। তবে তংচংগ্যা ও মনীপুরী মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের প্রচলন খুব বেশী। মনিপুরী মুসলমানদের মধ্যে মামাত ফুফাত বোন ছাড়া অন্য পরিবারের কারও সঙ্গে বিয়ে হতে পারবে না। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় মামাত ফুফাত ভাই কিংবা বোনের অভাবে অনেককেই চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকতে দেখা যায়।

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়তা স্থাপন অর্থাৎ জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের (Phratry) প্রসারতা ঘটানো। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই অধিকাংশ আদিবাসী সমাজ বহির্বিবাহের পক্ষপাতি। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডব্লিউ. আর. রবার্টসন মন্তব্য করেছেন যে, একই পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ অভদ্রতার নামান্তর।[৪]

ডক্টর ওয়েষ্টারমারক'ও নিকটতম আত্মীয় বা চাচাত, ফুফাত, মামাত ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহকে ভ্রান্তিমূলক বলে আখ্যায়িত কচ্ছেন। তাঁর মতে প্রজননের সহজাত প্রবৃত্তি এতে ব্যাহত হয়। ফলে সন্তান সন্ততির বুদ্ধিবৃত্তিতে অপবিপক্কতা ঘটবার সম্ভাবনা।[৫]

স্যার বি. এইচ. থমসন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের সংস্পর্শে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, অন্তর্বিবাহ অনেক সময় পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ফিজিয়ানরা (Fijian) চাচাত ফুফাত মামাত ভাই বোনদেব মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ রীতি বিরুদ্ধ বলে স্বীকার করে।[৬]

এ. এইচ. হুথ নিকট আত্মীযেব মধ্যে বিবাহ রীতি রুচীহীন ও লজ্জা-জনক ('Shame') ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন।[৭]

প্রফেসর ডারউন বলেছেন যে, ব্যাপারটি সত্যি অমীমাংসিত, কেননা একই আদিবাসী যেখানে অন্তর্বিবাহ নাকচ করছে আবাব তাদেব মধ্যেই অন্তর্বিবাহের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়েছে।[৮]

ব্যাপারটি সত্যি অমীমাংসিত। কেননা ডক্টর ওয়েষ্টারমাবক, এ. এইচ. হুথ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ অন্যত্র মন্তব্য করেছেন যে, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ দ্রুত সন্তান সন্ততি লাভের পরম সহায়ক (Blessed with a rapid increase of children).

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ই. বি. টাইলর এই ধরনেব বিয়েকে সঙ্করধর্মী বিবাহ (Cross cousin Marriage) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন অবস্থায় মানব জাতি এই ধরনের বিয়েরই বেশী পক্ষপাতি ছিল।

এল. ফিসন-এর মতে চাচাত ফুফাত মামাত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ-রীতি হৃদয়ের যোগকে আরও গভীরতর করে। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের কামিলারই (Kamilaroi) এবং কোর্নাই (Kurnai) আদিবাসীদের মধ্যে এই রীতির ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এতদঞ্চলের কোনোও যুবতী কোনোও যুবককে অন্তর দিতে গিয়ে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে :

'আহা, আমি যদি চাচাত মামাত ফুফাত বোন (First Cousin) হতে পারতাম।' এই স্বীকারোক্তির অর্থই হলো বিবাহ।[৯]

কোন কোন আদিবাসী যেমন ইরোকো (Iroquois)-দের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত যে সমবয়সী ছেলেরা জ্ঞাতি ভাই (Tribal brotherhood) সম্পর্কিত এবং অনুরূপভাবে মেয়েরা জ্ঞাতিবোন (Tribal sisters) সম্পর্কিত। ফলে এসব ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ সামাজিক-আইন অনুমোদিত। সম্ভবতঃ এ কারণেই ই. ক্রলে মন্তব্য করেছেন: '... and **the cousin marriage termed 'Cross' is the key to the Phratry system.'**[১০]

বাংলাদেশের তংচংগ্যা এবং আসাম ও সিলেটের মনিপুরী মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, চাচাত মামাত ফুফাত ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ রীতি হৃদয়ের যোগসূত্রকে নিবিড়তর করে। তাদের মতে বৈবাহিক সম্পর্ক একদিনের জন্য নয়—সমগ্র জীবনের জন্য 'ঘর বাঁধা'। কাজেই যেখানে পরস্পরের মধ্যে জানাজানি নেই সেখানে মন দেওয়া নেওযার প্রশ্নই উঠে না। চাচাত মামাত ফুফাত ভাই বোন কাছাকাছি থেকে পরস্পরকে যতটা জানতে পারে এতটা সুযোগ অন্যত্র সম্ভব নয়। রক্ত সম্পর্কের আত্মীযের সঙ্গেই রক্তের বিনিময় করা ভালো। একই রক্ত অন্য রক্তে রূপান্তর করা তাদের মতে বেমানান। মনিপুরী মুসলমান (আঞ্চলিক ভাষায় 'পাংগন)-দের ইনফুল ময়ূম গোত্রভুক্ত লোকদের ধারণা এই ধরনের বিয়েতে অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি আরও তীব্রতর হয়; ফলে সন্তান সন্ততি বলবান ও বুদ্ধিদীপ্ত হতে বাধ্য।

মনিপুরী মুসলমানদের মধ্যে 'কাজিন ম্যারেজ' প্রচলিত থাকলেও 'দুধ ভাই' কিংবা 'দুধ বোন'-এর মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। দুধ ভাই কিংবা দুধ বোন বলতে শিশু অবস্থায় মা মারা গেলে মাতৃহীন সেই শিশু যদি অন্য কোনোও মায়ের দুধ পান করে বেঁচে থাকে তবে সেই শিশু (কন্যা বা পুত্র যাই হোক) যার দুগ্ধ পান করেছে তার পুত্র বা কন্যার সঙ্গে তাদের বিয়ে হতে পারবে না।

একই নিয়ম আরব দেশের উপজাতীয় মুসলিমদের মধ্যেও প্রচলিত। যেহেতু দুধ আর মাংশে কিংবা রক্তে কোন তফাৎ নেই সেহেতু দুধ পান করলে মাতৃত্বের দাবীতে সেই শিশু সন্তান আত্মীয়তা (Kinship) অর্জন

করে ('milk is equivalent to real kinship')[১১] কাজেই সহোদর ভাইবোনদের মধ্যে যেমন বিয়ে নিষিদ্ধ তেমনি দুধপানে অর্জিত সম্পর্কযুক্ত ভাইবোনদের সঙ্গেও বিয়ে নিষিদ্ধ।

খাদ্যজনিত ব্যাপার থেকে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে এবং তার ফলশ্রুতি যে বিবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আরও অনেক আদিম সমাজের মধ্যে রয়েছে। প্রসঙ্গত অষ্ট্রেলিয়ার নারিনযেরী আদি-বাসীদের বিশেষ অনুষ্ঠানে 'ন্‌গাইত্যে' (Ngaitye) নামক এক প্রকারের পাখীর মাংস খাওয়ার উল্লেখ করা যায়। সমবয়সী ছেলে মেয়েরা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পাখীর মাংস ভক্ষণ করলে তারা ভ্রাতা ভগ্নিতে (Tribal brothers and sisters) রূপলাভ করে। ফলে, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[১২]

এখানেই শেষ নয়। সেই পাখীর হাড়, পালক ইত্যাদি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হয়। কেননা সেইসব হাড়-পালক যদি শত্রুদের হাতে পড়ে তবে তারা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (Black magic) দ্বারা ক্ষতিসাধন করতে পারে।

টরেস স্ট্রেইটস (Torres Straits) অঞ্চলের আদিম সমাজও একই মত পোষণ করে। একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও পানীয়ের ব্যবস্থা থেকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি হয় ('forming a tie of brotherhood') —সেখানেও বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[১৩] বাংলাদেশের গ্রাম্য সংস্কৃতিতে পোষ্য-পুত্র পালন ব্যবস্থাও একই ধারার সাক্ষ্য বহন করে।

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। অসম পর্যায়ের আত্মীয় বিবাহ (Cross Cousin marriage) নীলগিরী পাহাড়ের গৌড়া, শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা, ভারতের মধ্য প্রদেশের গোন্দ প্রভৃতি আদিম সমাজেও দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া আফ্রিকার হটেনটট, বানতু প্রভৃতি আদিম সমাজেও অসম পর্যায়ের আত্মীয় বিবাহ প্রচলিত।

উল্লেখযোগ্য যে, রামায়ণ ও মহাভারতেও অনুরূপ বিবাহের নজির পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দশরথ ও কৌশল্যার বিবাহের কথা বলা যায়। দশরথ ছিলেন কোশলের রাজা এবং কৌশল্যাও সেই বংশের কন্যা। বৌদ্ধ সমাজের মহাজাতকেও অসম পর্যায়ের আত্মীয় বিবাহের উল্লেখ আছে। মহামুনি বুদ্ধদেব বিয়ে করেছিলেন মামাতো

বোন যশোধারাকে এবং নন্দিতা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন মামাতো বোন রেবতীর সঙ্গে।

মেলানেশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার অনেক আদিম সমাজেও একই ধরনের বিবাহ-রীতি প্রচলিত। এবং বলা চলে এসব আদিম সমাজ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। ডক্টর রিভার্সের ধারণা এসব অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার থাকায় প্রবীণ ব্যক্তিরা বিবাহযোগ্য কন্যাকে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী।[১৪]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ, চাকমা, তংচজ্ঞ্যা প্রভৃতি উপ-জাতীয় সমাজও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং তাদের মধ্যেও অসম পর্যায়ের আত্মীয় বিবাহ রীতি লক্ষ্যযোগ্য। এ সম্পর্কে আগেও ইংগীত দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা পালিগ্রন্থে উল্লেখিত মহামুনি বুদ্ধদেব ও নন্দিতার অনুসারী কিনা তা অবশ্যি গবেষণা সাপেক্ষ।

১৮

ইতিপূর্বের আলোচনায় আদিম সমাজের বিভিন্ন পদ্ধতির বিবাহ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। বিবাহ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতি সম্বন্ধেও আদিবাসী সমাজ কম সতর্ক নয়। এইসব আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতির মধ্যে সামাজিক ও লৌকিক স্পর্শতো আছেই তদুপরি রয়েছে শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসন। এবং এই শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংস্কারাবদ্ধ ধারণায় আচ্ছন্ন—আর এই আচ্ছন্নতাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বেড়াজাল। এই বেড়াজাল অতিক্রম করে তারা সভ্যতার আওতা-ভুক্ত হতে পারেনি বলেই এখনো সভ্যতার চোখে তারা আদিম সমাজ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বিবাহের পূর্বে আদিম সমাজ ভাবী দম্পতির জীবনকালের শুভ অশুভ দিক সূচিত করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। উদাহরণস্বরূপ চাকমাদের 'খোলা-মাননি' অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। বিয়ের পূর্বদিন বিকেলে আংগিনার মাঝখানে একটি সাদা কাপড়ে পান-শুপারী, সন্দেশ, নারকেল, একটা টাকা ইত্যাদি স্থাপন করা হয় এবং পাশে জ্বলতে থাকে ঘি-এর প্রদীপ। বাদ্যকরেরা সেইসব কেন্দ্র করে ঢোল-ডগরা ইত্যাদি বাজাতে থাকে। গুরুজনেরা সেই ঢোলের শব্দ থেকেই নাকি ভাবী দম্পতির শুভ-অশুভ দিক নিরূপণ করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আরও একটি দিক সংগুপ্ত—তা এই যে, ঢোলের শব্দ দ্বারা দেবতা-অপদেবতা তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে নবদম্পতির উপর তাদের

প্রভাব না পড়ে। একই কারণে সাঁওতাল, ভীল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিম সমাজে বিবাহের পূর্বে বন্দুকের আওয়াজ, তীর-ধনুক ছোঁড়া কিংবা বোমা ফাটাবার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা হয়ত মনে করে থাকি বিবাহ অনুষ্ঠানের আনন্দ স্ফূর্তির জন্য এসব করা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের কাছে যেটা আনন্দ আদিম সমাজের কাছে তা ধর্মীয় বিশ্বাস।

রাজবংশী সমাজে দেখেছি অপদেবতার প্রভাব থেকে রক্ষা করে বিবাহের পূর্বে বরকে বেল কাঁটা দিয়ে কান ছিদ্র করে দিতে। তাদের বিশ্বাস ক্ষত চিহ্ন থাকলে অপদেবতা আর তাদের প্রতি কুদৃষ্টি হানবে না—অবজ্ঞা করে দূরে থাকবে।

বলা যায় যে, একই বিশ্বাসের জন্য লুসাই ও কুকী সমাজে ছেলেমেয়ে উভয়েই কানে এবং নাকে অলঙ্কার পরিধান করে। কানে এবং নাকে ছিদ্র থাকার দরুণ অপদেবতার হাত থেকে তারা রেহাই পাবে এটাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। অলঙ্কার পবার মূল উদ্দেশ্য অঙ্গ সৌষ্ঠব নয়—বেঁচে থাকার অবলম্বন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলোর মধ্যে ধান দূর্বা আতপ চাউল, মিষ্টি, সিঁদুর ইত্যাদি সহকারে বর ও কনেকে বরণ করার রীতি বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিম সমাজেই রয়েছে। সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, হাজং, হদি, দালুই প্রভৃতি আদিবাসী সমাজের এটা অতি অবশ্যি কর্তব্য।

এই রীতির অন্তরালে বিশ্বাস এই যে, ভাবী দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ থাকবে। ধান দূর্বা আতপ চাউল ইত্যাদি বস্তুতে রয়েছে জীবন-সার **(Life-essence)** এবং সিঁদুর যৌন-চিহ্ন **(Sex-symbol)** বা বিজয় চিহ্ন বলে কথিত।

হিন্দু সমাজেও এই রীতি প্রচলিত। 'কুলো'—লক্ষ্মীর শূর্প। এই রীতিতে সারবস্তুর আবির্ভাব ঘটানোর কল্পনা ছাড়াও আদিমসমাজ বিশ্বাস করে যে, ধান চাউল ইত্যাদি দেওয়া হয় অপদেবতার খাদ্য হিসেবে। বিবাহকালীন সময়েই অপদেবতার কোপ পড়বার সম্ভাবনা বেশী—এজন্যই এসব দিয়ে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা।

অনুরূপ রীতি পৃথিবীর অন্যান্য আদিম সমাজেও রয়েছে। সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের কোরনাই (**Kurnai**) এবং প্রাচীন গ্রীক রীতিতেও বর ও কনেকে কেন্দ্র করে ধান চাউল মিষ্টি ছিটিয়ে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কোরনাই সমাজের বিশ্বাস যে, বিবাহের রাত্রিতে বর ও কনের আত্মাবস্তু উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই আত্মবস্তুকে ধরে রাখার জন্যই চাউল ইত্যাদি খাদ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[১]

বিয়ের পূর্বে বর ও কনেকে তেল হলুদ মেখে স্নান করানোর রীতি বাংলাদেশের সব আদিবাসী সমাজেই বর্তমান আছে। কোন কোন অঞ্চলে এটা 'তেলাই' নামে খ্যাত। তেলাই অনুষ্ঠান পালনের অন্তরালে যে বিশ্বাস সম্পৃক্ত তা হলো পবিত্রকরণ—যাতে অপদেবতার 'আসর' বিনষ্ট হতে পারে।

আদিবাসী ধারণায় জলের মতো পবিত্র জিনিস আর দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া জলের মধ্যে সারবস্তু রয়েছে অধিক মাত্রায়। একই কারণে চাকমা, মগ, টিপরা, হদি, দালুই, সাঁওতাল, ওরাওঁ রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে বিয়ের পরে মঙ্গলঘট থেকে আমপাতা জামপাতা দিয়ে জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করার রীতি প্রচলিত। বর ও কনের জীবন সুখের হোক এটাই এই আশীর্বাদের মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর অন্যত্রও এই রীতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম সমাজেও বর ও কনেকে স্নান করানো কিংবা জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করতে দেখা যায়।

মালয়ে এই অনুষ্ঠানের নাম 'টেপং টাবার'। টেপং টাবারের উদ্দেশ্যই হলো '.....sterilising the active element of poisons, or of destroying the activities of evil spirits.'[২]

রাজবংশী সমাজের অপদেবতা তাড়ানো কিংবা অপদেবতাকে কানা করে দেওয়ার পদ্ধতিটিও আকর্ষণীয়। বিবাহের পরে নব দম্পত্তি যখন ঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন অঙ্গন থেকে ঘর পর্যন্ত কাপড় বিছিয়ে একটা রাস্তা তৈরী করা হয়। কাপড়ের নীচে উপুড় করে পর পর স্থাপন করা হয় মাটির ছোট ছোট পাতিল। বর ও কনে আগে পিছে সেই রাস্তায় চলা কালে প্রথমে বর একটি পাতিল পা দিয়ে ভেঙ্গে অগ্রসর হয় এবং কনে তার পরেরটি ভাঙ্গে। এমনি ভাবে ক্রমশ: একটির পর একটি যথাক্রমে বর ও কনে ভাংতে ভাংতে ঘরে পৌছে। এই পাতিল ভাংগার অর্থই হলো অপদেবতার চোখ কানা করে দেওয়া—যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অপদেবতার প্রভাব না পড়ে।

কুকি ও লুসাই সমাজে বিয়ের রাত্রে নব দম্পতিকে কেন্দ্র করে 'ইনুগৈখ্লাক' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান খুব সোজা—সারারাত পাড়ার ছেলেরা বাসর ঘরের উপরে শিলাবৃষ্টির মত ঢিল নিক্ষেপ করে। তাদের মতে বিবাহের রাত্রিই সবচেয়ে বিপদজনক। কেননা এই সময়েই অপদেবতার প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা বেশী। তাই ঢিল পড়লে অপদেবতা তাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন আছে—বিয়ের রাত্রে নবদম্পতি ঘুমিয়ে থাকলে তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে ঢিলের মারফৎ তাদের জাগিয়ে রাখাও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হবে চাকমা সমাজের সে পরীক্ষা রীতিও উপভোগ করবার মতো। স্ত্রীলোকেরা কলার খোল দিয়ে দুটো নৌকো তৈরী করে একটিতে পান এবং অপরটিতে সুপারী দিয়ে নদীতে-ভাসিয়ে দেয়। নৌকো দুটো যদি পাশাপাশি ভাসতে থাকে তবে নব দম্পতির মিলের সম্ভানা আর যদি নৌকো দুটো বিপরীত মুখো হয়ে ভাসতে থাকে তবে অমিলের সম্ভাবনা। বিপরীত মুখো হয়ে ভাসলে নৌকো দুটো টেনে একত্র করে তার নীচে থেকে কলসী ভরে জল এনে নব দম্পতিকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে দোষ স্খালন হয়।

সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসী এই নিয়ম পালন করে ভিন্ন উপায়ে। বিয়ের পরের দিন বাড়ীর অঙ্গনে ছোট একটি পুকুর কাটা হয় এবং তাতে জলভর্তি করে বর ও কনেকে সেই পুকুরে পয়সার লুকোচুরি খেলায় নিমগ্ন করা হয়। প্রথমে বর একটি পয়সা কোথাও লুকিয়ে রাখে এবং স্ত্রী তা বের করে। পরে স্ত্রী তা লুকায় এবং বর বের করে। এমনিভাবে যদি উভয়েই সফলতা অর্জন করে তবে তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনে দ্বন্দ্ব কলহ দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাম বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই এই পয়সার লুকোচুরি খেলার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। বাংলার লোক সাংস্কৃতিতে যে আদিবাসী সংস্কৃতির অনেক রীতিনীতিই অনুপ্রবেশ করেছে এটাও তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তফাৎ এই যে, আদিবাসী সমাজের কাছে যেটা ধর্মীয়, বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে হয়তো সেটা সামাজিক। কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

বিয়ের পর বর ও কনেকে একত্র খাওয়ানোর রীতি বিশ্ব বিশ্রুত।

দুটি আত্মার মিলন সাধনই এই একত্র খাওয়ানোর প্রধান উদ্দেশ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের টিপরাদের মধ্যে বিয়ের পর বর ও কনেকে একত্র পাশাপাশি বসানো হয়। অতঃপর কনের মা এক গ্লাস মদ প্রথমে বরের হাতে অর্পণ করে। বর সেই মদ অর্ধেক খেয়ে বাকী অর্ধেক কনেকে প্রত্যার্পণ করে। কনে তা শেষ করলেই বোঝা যাবে তারা দু'জনে মিলে এক হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। তাদের এই মিলনের আরও একটি স্বীকারোক্তি এই যে, বর তার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং কনে তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরবে।

বিয়ের পর নব দম্পতির সম্পর্ক পাকাপোক্ত করার জন্য যে-সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তন্মধ্যে সাঁওতালদের নববধূর স্নান রীতি এবং বরের তীর-ধনুক ছোঁড়াও বেশ আকর্ষণীয়। বিয়ের পর বিশেষ করে কনে যখন শ্বশুর বাড়ী যেতে তৈরী তার আগে তাকে যেতে হবে পার্শ্ববর্তী নদী বা পুকুরে স্নান করতে। বর ঠিক তার পেছনে পেছনে যাবে তীর ধনুক সহ। নববধূ স্নান সেরে কলসী ভর্তি পানি নিয়ে ঘরে ফেরার প্রাক্কালে বর তার দুই কাঁধে আস্তে করে ভর করে তীর ছুড়বে সামনের দিকে। অতঃপর দু'জন হাঁটতে হাঁটতে তীরের কাছে আসতেই কনে সেই তীর পায়ের আঙুল দিয়ে তুলে স্বামীর হাতে অর্পণ করবে। পানি-ভর্তি কলসী তখনও তার মাথার উপরে। এই নিয়মের মধ্যে দুটো ধারা ক্রিয়াশীল। প্রথমতঃ তীর ছুঁড়ে অপদেবতার চক্ষু কানা করে দেওয়া হলো। দ্বিতীয়তঃ নববধূ যে তাকে হাতে পায়ে এবং মাথার সাহায্যে আজীবন সংসার ধর্ম পালনে সহায়তা করবে তার প্রমাণ মাথায় কলসী ভরা জল, হাত দিয়ে কলসী ধরে রাখা এবং পা দিয়ে স্বামীকে তীর তুলে দেওয়ার রীতি।

বিয়ের পর মুণ্ডাদের সিঁদুর দান এবং বরের উত্তরীয়-এর সঙ্গে কনের শাড়ীর গেরো প্রদান ইত্যাদিও নবদম্পতির সম্পর্কের পাকা-পোক্ত রীতি ঘোষণা করে। এই সময়ে মুণ্ডাদের 'দা-আউ ও তুরিং' অনুষ্ঠান পালনের দ্বারাও ভূত-প্রেত, ডাইনডাইনী তাড়িয়ে নবদম্পতির সুখময় জীবন কামনা করা হয়। 'দা-আউ ও তুরিং' অনুষ্ঠানে ম্যাজিকের প্রভাবই প্রবল।

মগদের মধ্যে বিয়ের পর বর ও কনেকে আঙুলে নয় তাদের পরস্পরের কাপড়ের কোণায় গিরো দিয়ে তাদের মিলনের নিদর্শন ঘোষণা করা হয়।

অতঃপর রড়ী বা ঠাকুর উভয়কে পর পর সাতবার ভাত খাওয়ানোর পর কিছু ভাত বর তার নিজের মাথায় এবং পরে তার স্ত্রীর মাথায় ছিটিয়ে দেয়। মগ ভাষায় এই অনুষ্ঠানোর নাম 'মংগলা থামা' ব্রত। ভাত ছিটিয়ে দেওয়ার অন্তরালেও অপদেবতার কুনজর এড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বিবাহ উৎসব ছাড়াও মগ সমাজে খাওয়ার সময় যদি ভিক্ষুক জাতীয় কেউ খেতে দেখে তবে কুনজর পড়ে পেটের অসুখ হবার সম্ভাবনায় কিছু ভাত বাইরে ছিটিয়ে দেয় এবং থালা উঁচু করে নীচে লক্ষ্য করে তবে খাওয়া শুরু করে।

চাকমা সমাজেও বিয়ের পর বর ও কনের মিলনকে নিবিড়তর করার উদ্দেশ্যে উভয়ের কাপড়ের কোণায় গেরো দেয়। এই কাজ পরিচালনা করে 'ছায়লা' ও 'ছায়লী'। চাকমাদের মধ্যে বরের একজন আত্মীয় ও একজন আত্মীয়া বিয়ের আগাগোড়া মধ্যস্থতা করে এবং এরাই ছায়লা ও ছায়লী নামে খ্যাত। কাপড়ে গেরো দেওয়ার পর বর ও কনেকে একত্র ভাত খাওয়ানো হয় এবং এর নাম 'বদ্যাগুল্যা ভাত'। প্রথমে স্ত্রী ডান হাতে এবং বর বাম হাতে উভয়কে উভয়ে এই ভাত খাওয়ায় এবং এতেই বোঝা যায় তাদের দু'জনের অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

রাজবংশী, হাজং, হদি, দালুই, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে বিয়ের পর বর ও কনেকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদের দু'জনকে কতকগুলো সামাজিক নিয়মের অধীনে থাকতে হয়। কাপড় দিয়ে বর ও কনেকে ঢাকার মূলেও তাদের বিশ্বাস যে অপদেবতার কুনজর যেন না পড়তে পারে।

সাঁওতালদের মধ্যেও 'সিঁদুর দান' অনুষ্ঠানের পর বর ও কনে একত্র বসে খায়। সিঁদুর দান উৎসবে বর ও কনে তাদের পরস্পরের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে রক্ত নিয়ে সিঁদুরের সঙ্গে মিশ্রিত করে কনের কপালে পরিয়ে দেয়। এতে তাদের পরস্পরের আত্মা এক হলো বলে বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিঁদুর দানের পর বর ও কনে যে একত্র খায় এটাই তাদের জীবনের প্রথম এবং শেষ খাওয়া! কেননা সাঁওতাল সমাজে স্ত্রী পুরুষ একত্র খাওয়া 'টাবু' বিশেষ।

যে ধর্মীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের আদিম সমাজ বিয়ের পর বর ও কনেকে একত্র খাওয়ায়, কাপড়ে গিরো দেয় কিংবা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় ঠিক এই বিশ্বাসে পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীও অনরূপ

নিযম পালন করে থাকে। ভারতের গঁড় এবং কোরকো আদিবাসীদের বর ও কনেকে বিয়ের পর কাপড়ে গিরো দেওয়া হয় এবং অতঃপর আংটি বদল করার পর একত্র খেতে দেওয়া হয়।[৩]

অনুরূপভাবে ভারতের লবকা (Larkas) আদিবাসীদের মধ্যে ভাত ও মাংস একত্র করে কনেকে খাইযে দিলেই সে স্বামীর জাতভুক্ত হয এবং অতঃপর এক গ্লাস মদ প্রথমে বর ও পরে কনে পান করে এবং এটাই তাদের বিয়ের সর্বশেষ অনুষ্ঠান।[৪]

শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা আদিবাসীদের মধ্যেও বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং কনের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল জড়িয়ে দেওয়াব পর এক থালায় বসে খায় এবং এই খাওযাব পর প্রমাণিত হয় যে তারা সমপর্যায়ের **('to show they are now of equal rank.')**.[৫]

জাপানের বর কনেও বিয়ের পর একত্র বসে খায়। তবে তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, বর ও কনে একসঙ্গে কয়েক গ্লাস মদ পান করে একজন আর একজকে আলিঙ্গন করে তাদের মিলনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।[৬]

খাদ্যজনিত ব্যাপারে ভিন্নরূপও দৃষ্টিগোচর হয়। ভাত ও পানীয় ছাড়া পান শুপারী এমনকি সিগারেট পানের রীতিও রয়েছে। নিউগিনি কিংবা কেই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের বর কনে বিয়ের পর অন্দর মহলে গিয়ে প্রথমে বর পান শুপারী চিবিয়ে সেই চিবানো অংশ কনেকে প্রদান করে এবং কনে তা চিবিযে উভয়ের মিলনের রীতি ঘোষণা করে।[৭]

বোর্নিও দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের বর কনে কিন্তু বিয়ের পর দু'জনে একই সিগারেট খেয়ে তাদের মিলনের ইংগীত জ্ঞাপন করে।[৮]

পরস্পরের রক্ত পান করে মিলনের স্বীকারোক্তি জানাবার রীতিও আদিম সমাজে অনুপস্থিত নয়। ভারতের বিরহোর সমাজের বর ও কনে পরস্পরের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে দু'জনে জিহ্বায় স্পর্শ করার পর বর সেই রক্ত কনের কপালে লেপন করে পরস্পরের মিলনের প্রকাশ ব্যক্ত করে।[৯]

মরক্কোর মূর (Moors)-দের রীতিটি আরও অর্থপূর্ণ। ওঝা (Medicine-man) মন্ত্রপূত করে দেওয়ার পর বর ও কনে একই গ্লাসে মদ

পান করে এবং বর সেই গ্লাস সবার সম্মুখে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলে: **'with a covert meaning that he wishes they may never be parted until the glass again becomes perfect.**[১০]

বিবাহ উপলক্ষে নতুন কাপড় ও উপহার সামগ্রীর লেন দেন আদিম সমাজের চিরাচরিত প্রথা। নতুন কাপড় ছাড়া বিয়ে অশুদ্ধ এরূপ রীতি পৃথিবীর বহু আদিম সমাজে এখনও প্রচলিত। আবার অপদেবতা তাড়াবার জন্য এই রীতির ভিন্নরূপও নজরে পড়ে। কেননা, অনেক আদিম সমাজ অপদেবতার চোখে ধুলো দেবার জন্য বিয়েব পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বরের পোষাক কনে পরিধান করে এবং কনের পরিচ্ছদ বর পরিধান করে।

বাংলাদেশের আদিম সমাজে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় নি তবে রাজবংশী এবং হাজং প্রভৃতি সমাজে লক্ষ্য করেছি যে, পর পর সন্তান হয়ে মারা গেলে পরে যে সন্তান জন্মলাভ করে সেই সন্তান ছেলে হলে তাকে মেয়ের বেশভূষায় সজ্জিত করে রাখা হয়। বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার মাথার চুল কাটা নিষেধ। কান নাক ছিদ্র করে সে অবিকল মেয়েদের মত অলঙ্কার ব্যবহার করে। অতঃপর বয়োপ্রাপ্ত হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে ছেলের পোষাক পরিধান করতে দেওয়া হয়।

রাজবংশী সমাজে পর পর সন্তান হয়ে মারা গেলে সেই জননীকে 'মইল্যা'য় ধরেছে বলা হয়। অপদেবতার কুদৃষ্টিজনিত ব্যাপার থেকেই এরূপ ঘটে বলে তাদের বিশ্বাস।

বিপরীতধর্মী পরিচ্ছদ ব্যবহার করার অন্তরালে দুটো ধারা ক্রিয়াশীল। প্রথমতঃ অপদেবতার দৃষ্টি বিনষ্ট করা। দ্বিতীয়তঃ প্রেমিকার অন্তরাত্মাকে নিজের মধ্যে বশীকরণের ব্যবস্থা।

বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়াও একই উদ্দেশ্যে পুরুষগণ নারীর পোষাক কিংবা নারীগণ পুরুষের পোষাক পরিধান করে। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যভারতের ইরোকালাবন্ধু **(Erukavandu)** নামক যাযাবর সম্প্রদায়ের পুরুষদের নারীর পোষাক পরিধানের ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়।

ইরোকালাবন্ধু কোনোও পুরুষ যদি তার স্ত্রীর প্রসববেদনার কথা জানতে পারে তৎক্ষণাৎ সে তার স্ত্রীর পোষাক পরিধান করে, কপালে সিঁদুরের চিহ্ন আঁকে এবং সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করে অন্ধকার কক্ষে

আশ্রয় নেয়। তাদের বিশ্বাস এতে প্রসব কালে কোন কষ্ট হবে না। যন্ত্রণা যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা যেন সেই পুরুষ ব্যক্তির উপর বর্তে।[১১]

আফ্রিকার জুলুদের উমকুবা (Umkuba) উৎসবের অন্তরালে গরু বাছুরের রোগ জরা তাড়াবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ীর মেয়েরা তাদের ভাইদের পোষাক পরিধান করে রাখালের বেশে মাঠে গরু চরাতে গমন করে। এমনকি ছেলেদের মত গরু তাড়াবার পাচন ইত্যাদিও সঙ্গে নিতে তারা ভুল করে না। সারা দিন মাঠে গরু চরিয়ে সূর্যাস্তের সময় তারা ঘরে ফেরে। তাদের তত্ত্বাবধান করতে পুরুষদের মাঠে যাওয়া, এমনকি তাদের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ।[১২]

উপরিউক্ত ব্যবস্থায় অপদেবতা তাড়ানো, রোগজরা নিরাময় করণ ইত্যাদির ইংগীত পাওয়া যায়। কিন্তু বর ও কনের বিপরীতধর্মী পোষাক পরিধান করার অন্তরালে ঐন্দ্রজালিক ব্যবস্থায় নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর ভাগ্য সমভাবে ভাগ করে নেবার প্রয়াস বিধৃত।

ডক্টর ফ্রেজারের মতে কনে এরূপ করলে সে তার স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্র লাভ করে; এমনকি কনের যন্ত্রণা ইত্যাদি তার স্বামীর উপর বর্তে।[১৩]

এক কথায় এসব চিন্তা ভাবনা যে আদিবাসী ধ্যান ধারণা সঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই। গ্রাম বাংলার বিয়ে বাড়ীতে অনুরূপ পোষাকের মহড়া দেওয়া হয় স্ফূর্তি বা হাসি ঠাট্টার উদ্রেক করার জন্য।

উপহার সামগ্রীর উল্লেখে অলঙ্কার পত্র, কাপড় চোপড় ইত্যাদিতো আছেই তদুপরি প্রতীকধর্মী কতকগুলো জিনিস খুবই উল্লেখযোগ্য। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তংচঙ্গ্যাদের বিবাহে উপহারস্বরূপ ডিম পাঠাতে হবে। এই ডিম হলো সন্তান সন্ততির প্রতীক।

অনুরূপ ভাবে ওরাওঁ, সাঁওতালদের বিবাহে অন্যান্য জিনিস পত্রের সঙ্গে শশা পাঠানো হয়। তাদের মতে শশাও নব দম্পতির ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততির প্রতীক। অতএব ডিম এবং শশা উভয়েই যৌন সম্ভোগের পূর্বাভাস।

আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের মূল্যবান উপহার সামগ্রীর গুরুত্ব তো আছেই তদুপরি বর ও কনের আংটি বদল কিম্বা মূল্যবান সামগ্রীর লেনদেন সম্পর্কে আদিম সমাজ খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আদিম সমাজের কাছে এটা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা তাদের সত্তার সঙ্গে জড়িত। **(It is part of himself.)**[১৪]

বর ও কনে পরস্পর আংটি বদল কিংবা মূল্যবান উপহার বিনিময়কে আত্মীকরণ **(assimilation)** বলে মনে করে।

শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর সর্বত্র এই রীতি প্রচলিত। পাশ্চাত্য-দেশের আদিম সমাজে ব্যাপারটি আরও প্রকট। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে, পাতাগোনিয়ার আদিম সমাজভুক্ত বরদের কনের কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না যতক্ষণ না সে কনের জন্য কিছু উপহার দেয়।[১৫]

একই নিয়ম নিউ ক্যালেডোনিয়ার খকিয়েন **(Khakyen)**-দের মধ্যেও প্রচলিত। বর উপহার প্রদান না করলে কনের ধারে কাছেও তাকে যেতে দেওয়া হয় না।[১৬]

আফ্রিকার কাফির বরকেও কনের জন্য উপহার পৌঁছাতে হয়। যে পর্যন্ত না কনের কাছে বরের উপহার সামগ্রী পৌঁছুবে ততক্ষণ কনে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করবে না।[১৭]

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ডক্টর ওয়েষ্টারমারক এই রীতিকে উৎসাহিত করেন নি। তাঁর মতে এই রীতি কনে ক্রয়ের **(Marriage by purchase)** পদ্ধতির চেয়ে একটু উন্নত ধরনের।[১৮]

ইতিপূর্বে বিয়ের উপহার সামগ্রী, একত্র খাওয়া দাওয়া, নতুন কাপড়, বিয়ে ফিরানো বা বরকে বাধা দেওা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সামান্য ইঙ্গীত দেওয়া হয়েছে, সেসব থেকে কি গ্রাম বাংলার হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃীষ্টান সম্পূর্ণ মুক্ত।

মোটেই মুক্ত নয়।

এখনও গ্রাম বাংলার সর্বত্র বিয়েতে নতুন কাপড় অবশ্যম্ভাবী, অলঙ্কার পত্র প্রদান কিংবা বর কনের আংটি বদল চিরাচরিত প্রথা; বর ও কনের একত্র খাওয়া কিংবা বরকে অন্দর মহলে প্রবেশের সময় বাধা প্রধান ইত্যাদি সামাজিক রীতি নীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য

'ডিম আগে না মুরগী আগে' এই দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যদি মুরগী আগে প্রমাণিত হয় তবে আমরাও বলতে বাধ্য হবো গ্রাম বাংলার বা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনেক রীতি নীতিই আদিবাসী সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত।

গ্রাম বাংলা তো দূরের কথা রাজধানীর অনেক শিক্ষিত পরিবারেও দেখেছি বরের গায়ে হলুদ মাখার পর তার মা সেই হলুদ বাম হাতের তালু দিয়ে মুছে নিচ্ছেন এই বিশ্বাসে যে, অপদেবতা বা ভূত প্রেত ডাইন-ডাইনীর কুনজর আর পড়তে পারবে না।

এসব কি আদিম সঞ্জাত ধারণার অবশেষ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সংগুপ্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না?

হ্যাঁ, যায়।

১৯.

বিবাহে পণপ্রথা (**Progeny price or bride-price**) আদিম সমাজের নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কুড়িটি আদিম সমাজের মধ্যে পনেরটি আদিম সমাজেই পণপ্রথা বিদ্যমান। লুসাই, কুকি, হাজং, হদি দালুই প্রভৃতি সমাজে পণপ্রথা বর্তমানে অন্তর্হিত। লুসাই ও কুকি প্রভৃতি সমাজে এককালে পণপ্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু একবার হঠাৎ করে বিয়ের অব্যবহিত পরেই নব দম্পতির মৃত্যু ঘটায় তাদের ধারণা জন্মে যে পণ প্রথার জন্যই এরূপ ঘটেছে। সেই থেকে লুসাই কুকি সমাজে পণপ্রথা উঠে গেছে।

পাশ্চাত্য দেশের আদিম সমাজেও পণপ্রথার নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। তিনজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ যেমন হবহাউস, হুইলার এবং গিন্সবার্গ[১] ইউরোপীয় অঞ্চলের ৪৩৪টি আদিবাসীদের মধ্যে ৩০৩টি আদিবাসী সমাজেই পণপ্রথা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক মারডক লক্ষ্য করেছেন যে, প্রায় অর্ধেক আদিবাসীদের মধ্যেই পণপ্রথা বিদ্যমান।[২] ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলেও পণপ্রথা বিদ্যমান এবং সেসব অঞ্চলের একটি আদিম সমাজও এই রীতির বহির্ভুত নয়।

সাধারণতঃ কনে পণ নির্ধারিত হয় বরের আর্থিক অবস্থার দিক বিবেচনা করে। অনেক ক্ষেত্রে কনের বংশ মর্যাদা এবং রূপ লাবণ্যের জন্যও কনে পণের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এককালে বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারেও কনে পণ চালু ছিল এবং অনেক

পরিবার তাদের বংশ মর্যাদা এবং সেই সঙ্গে মেয়ের রূপ লাবণ্যের বৈশিষ্ট্যের জন্য পণ হিসেবে মোটা অঙ্ক লাভ করে রাতারাতি অর্থশালী হয়েছে এমন নজিরও বিরল নয়। এমনকি কনে পক্ষের চেয়ে একটু নীচু বংশে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে এক পাল্লায় কনে এবং অপর পাল্লায় স্বর্ণ রৌপ্য দিয়ে সমানুপাতিক ওজনের মাপকাঠিতে মেয়ে বিয়ের প্রচলনও এককালে বাংলাদেশের গ্রাম্য মুসলিম সমাজে সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা বহু রয়েছে। আদিম সমাজের কনে ক্রয় (**Marriage by purchase**) ব্যবস্থা যে গ্রাম বাংলায় চালু ছিল এসব তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বর্তমানে অবশ্য এই রীতি অন্তর্হিত।

সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে কনেপণ হিসেবে নগদ টাকা ৫.০০ থেকে ৫০০.০০ পর্যন্ত স্থির হতে দেখেছি। আবার অনেক সময় অলঙ্কার পত্র, কাপড় চোপড় এবং গরু বাছুরও পণ হিসেবে ধার্য করতে লক্ষ্য করেছি। কাপড়ের উল্লেখে 'মারাংবুরো শাড়ী' এবং 'মা শাড়ীর' নাম করা যায়। সাঁওতাল সমাজে এ ধরনের কাপড় না হলে বর পক্ষের পাত্রী তুলে আনার ব্যাপারে দারুন অসুবিধা। অনেক সময় এই দুই প্রকারের শাড়ীর অভাবে বরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন নজিরও সাঁওতাল সমাজে বহু রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরং, সেন্দুজ, টিপরা, চাকমা, মগ প্রভৃতি সমাজে নগদ টাকা ছাড়াও গয়াল অথবা শূকর কণে পণ হিসেবে ধার্য করা হয়। এমনকি নগদ টাকা, গয়াল কিম্বা শূকরের পরিবর্তে শ্বশুর বাড়ীতে খেটে কনেপণ ঋণ শোধ করারও নিয়ম আছে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, লুসাই ও কুকি সমাজে পণ প্রথা নেই। অবশ্য, নগদ টাকা পণ হিসেবে গ্রহণ করার রীতি তাদের মধ্যে নেই কিন্তু ধার্যকৃত পণের সমপরিমাণ খাটুনি শ্বশুর বাড়ীতে খেটে দেওয়ার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে।

প্রায় একশ বছর আগে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ সি.এ. সোপিট লুসাই কুকি সমাজে অবস্থান করে লক্ষ্য করেছেন যে, 'কোনোও যুবক যদি কোনোও যুবতীকে পছন্দ করে তবে সে এক বোতল মদ, কিছু পান শুপারী ইত্যাদি নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে চলে যায়। এবং মেয়ের বাবাকে তার অভিপ্সা জ্ঞাপন

করে। মেয়ের বাবা সেই ছেলেকে ভাবী জামাতা হিসেবে পছন্দ করলে তাকে তিন বছরের জন্য বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। যুবক তখন তিন বছর ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে 'জুম' কাজে সহায়তা করে। এই তিনটি বছরই তার পরীক্ষা স্বরূপ। তিন বছরের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হলে তাদের বিয়ের চুক্তি হয় এবং পরে আরও দুই বছর শ্বশুর বাড়ীতে অতিরিক্ত খাটতে হয়। এই খাটুনিই কনে পণ বলে ধরা হয়। পাঁচ বছর পর সে স্ত্রীসহ নিজের বাড়ীতে আসতে সমর্থ হয়।[৩]

১৯৬৭ সালেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক অঞ্চলের লুসাই কুকিদের মধ্যে অনুরূপ রীতির প্রচলন লক্ষ্য করেছি। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক কিছুরই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে কিন্তু অনেক আদিম সমাজ এখনও তাদের প্রাচীন রীতিতে অটল। লুসাই কুকিদের এই বিবাহ পদ্ধতিই তার অন্যতম উদাহরণ।

শ্বশুর বাড়ীতে খেটে কনে পণ পরিশোধ করার রীতি পৃথিবীর অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ গুইয়ানার অরবাক (**Arawaks**) আদিম সমাজেও ভাবী জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে খেটে পরীক্ষায় টিকে গেলে তাদের বিয়ে হয় এবং সংসারের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতেই অবস্থান করে (**'until an increasing family renders a separate establishment necessary'**).[৪]

অনুরূপ ভাবে মালয়, আমবোনিয়া, তাসমেনিয়া[৫] প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী সমাজও কনে পণ পরিশোধ করতে না পারলে তার পরিবর্তে শ্বশুর বাড়ীতে খেটে দেয় এবং সেখানে অবস্থান কালে তাদের সন্তান সন্ততি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলে পরিচিত থাকে। বর যখন নিজের বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ প্রত্যাবর্তন করে তখন সেই সন্তান সন্ততি পিতৃতান্ত্রিক (**Paternal**) সমাজভুক্ত বলে দাবী করতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বলপূর্বক বিবাহ, পলায়নে বিবাহ কিংবা মনোমিলনে বিবাহ ইত্যাদিতে পণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বিধবা বিবাহেও পণের প্রচলন নেই। এমনকি বিধবা বিবাহে আনন্দ অনুষ্ঠানও একরূপ পালন করা হয় না।

পশ্চিম আফ্রিকার ডাহোমিন (**Dhomeans**) আদিবাসীদের মধ্যে কনে

পণের এক চিত্তাকর্ষক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ডাহোমিন সমাজে কোনো ও নারী যদি বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় তবে সেই বন্ধ্যা নারী তার স্বামীকে উপযুক্ত পণ প্রদান করে নতুন করে বিয়ে দেয়। নতুন স্ত্রীর গর্ভে তাদের যে সব সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে তারা সেই ডাহোমিন পিতার প্রথম স্ত্রীকে বাবা বলে সম্বোধন করে। কারণ পণ পরিশোধের জন্য সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোকই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে।[৬]

পণপ্রথায় নারীজাতি পুরুষ জাতির চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন বলে ধারণা করা হয়। ফলে, বর্তমানে এই প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য অনেক আদিম সমাজই আন্দোলন চালাচ্ছে। এমনকি অনেক আদিম সমাজ তাতে সফলতাও অর্জন করেছে।

২০.

বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক প্রথাও আদিম সমাজে রয়েছে। সমাজ-সমর্থিত যৌন-জীবনই যে বিবাহের নামান্তর এ সম্পর্কে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহিত জীবনে যেখানে স্বর্গ-সুখের পরিবর্তে নরক যন্ত্রণার আবির্ভাব ঘটে সেখানেই তালাকের প্রশ্ন ওঠে। কি কি কারণে নরকযন্ত্রণা সূচিত হয় সে সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের আদিম সমাজের অধিকাংশদের মধ্যেই তালাকপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের কথাই ধরা যাক। চাকমা সমাজে তালাকপ্রার্থী স্বামী-স্ত্রীর তালাক ব্যবস্থা হেডম্যান ও দশজন গ্রামীণ মাতব্বরের বিচারে স্থিরিকৃত হয়। দোষী ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাছাড়া এসময় মেয়েকে কিছুদিনের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করে বিদায় দেওয়া হয়। সমস্যা খুব জটিল মনে হলে এসব বিচারের ভার হেডম্যান ছাড়িয়ে খীসা এবং খীসা ডিঙ্গিয়ে রাজার হাতে ন্যস্ত হয়। রাজাই আসলে গোটা চাকমা সমাজের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

মুরং সমাজের তালাক ব্যবস্থা প্রতিপন্ন করা হয় গ্রামীন রোয়াজা বা হেডম্যানদের সামনে। বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে সামাজিক আইনে দণ্ডনীয় হতে হয়। তখন সবাই স্বামীকে একটিমাত্র দা দিয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেন। তখন সমস্ত অরণ্যভূমি তার বিচরণ-ক্ষেত্র এবং সমাজের চোখে সে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়।

ময়মনসিংহের হাজং সমাজের তালাক দেওয়ার প্রথাটি বড়ো চমৎকার। নির্দিষ্ট দিনে স্বামী-স্ত্রী গ্রামের অধিকারী বা মাতব্বরেদের ডাকে। তাঁদের

সামনে স্বামী-স্ত্রী প্রথমত কিছু পান পাতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সংস্থাপন করে। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে পান-পাতার মতো ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী দু'জন সবার সম্মুখে পরস্পরকে বাবা মা বলে সম্বোধন করে। এতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সূচিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কোনো অবস্থায়ই গর্ভবতী নারীকে তালাক দেওয়া যায় না।

সিলেটের খাসীয়া সমাজের তালাক ব্যবস্থা আরও চিত্তাকর্ষক। নির্দিষ্ট দিনে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে পাঁচটি করে কড়ি নিয়ে গ্রাম্য মাতব্বরদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। অতঃপর সবার উপস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর হাতে পাঁচটি কড়ি দেয় এবং স্বামী সেই কড়ির সঙ্গে তার নিজের পাঁচটি কড়িও একত্র করে স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে। স্ত্রী অবজ্ঞা ভরে সব কড়ি দূরে নিক্ষেপ করে। এতে বোঝা গেলো যে তারা ঘর করতে নারাজ। তখন লাংদুহ্ বা ওঝা ঘোষণা করেন: 'উ নং পিংতা স্নোংগ' অর্থাৎ আজ থেকে তোমরা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর এই সংবাদ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাঁওতালদের তালাক পদ্ধতি অনেকটা হাজংদের মতো। হাজংগণ পান-পাতা ছিন্ন করে তালাক ঘোষণা করে আর সাঁওতালরা শালপাতা ছিন্ন করে তালাকের ব্যাপারটি জানিয়ে দেয়। তদুপরি স্ত্রী পানি ভর্তি একটি কলসী উপুড় করে বলে দেয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পানির মতো শেষ হলো। অঞ্চল ভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে। কলহ কিংবা মন কষাকষি হলে স্ত্রী বাপের বাড়ী চলে যায়। স্বামী তাকে নিজের বাড়ীতে আনতে চেষ্টা করলে সে রাজী হয় না। তখন স্বামী তার মাথার সিঁদুর মুছে দেয় এবং হাত থেকে লোহার বয়লা খুলে নেয়। এতে তাদের বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া হলো বলে মনে করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ওরাওঁ সম্প্রদায়ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাঁওতালদের রীতি অনুসরণ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিম সমাজেই তালাক প্রথা বিদ্যমান এবং উপরের আলোচনায় মাত্র কয়েকটি আদিম সমাজের তালাক-পদ্ধতি ব্যক্ত করা হলো। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের আদিম সমাজেও তালাক ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষের মুণ্ডা, হো, মাহালী, শবর, লোধা খাড়িয়া, বাউরী, কোচ, লেপচা, রাভা, টুডা, কুর্মী, মাহাতো, নাগা, মিশমী, আবর, লাখের, আওনাগা, সেমানাগা, বেংগমানাগা, মুরিয়া, গোন্দ, মাল পাহাড়ীয়া, হিল মারিয়া প্রভৃতির নাম করা যায়। তবে এঁদের তালাক-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কপালের সিঁদুর মুছে দিয়ে এবং হাতের বালা কেড়ে নিয়ে তালাক ঘোষণা করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামী শুধু জবাব দেয় এই বলে যে, 'তোমাকে ছেড়ে দিলাম' ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা সম্প্রদায় তাদের অন্যতম। ভেদ্দাদের একটি প্রবাদের বাংলা অনুবাদ এইরূপ: 'একমাত্র মৃত্যুই স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, নতুবা নয়।' প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ সেলিগম্যান দীর্ঘদিন ভেদ্দাদের সংস্পর্শে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, 'বিবাহ-বিচ্ছেদ একরূপ অজ্ঞাতই বলা চলে (**'Any thing like a formal divorce is unknown').**[১]

'অনুরূপভাবে কঙ্গোর বাহোয়ানা (**Babuana**), ব্রাজিলের মাত্তো গ্রোসো (**Matto grosso**), ইন্দো-চীনের লিসু (**Lisu**) প্রভৃতি আদিম সমাজেও তালাক-প্রথা অনুপস্থিত।২ ভেদ্দাদের মতো তারাও মনে করে যে, একমাত্র মৃত্যুই বিচ্ছেদের কারণ ঘটাতে পারে।

যে সব কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে তন্মধ্যে বন্ধ্যাত্ব, ঘন ঘন সন্তানের মৃত্যু, যৌন-কর্মে অপারগতা, স্বামীর সম্পত্তির বিনষ্ট সাধন, অযাচিত ঋণ-করণ, অযথা কলহ-ঝগড়া, চরিত্র ভ্রষ্টা হওয়া, রান্না বা স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় অনীহা প্রকাশ ইত্যাদি প্রধান। এবং এসব কারণ শুধু বাংলাদেশের আদিম সমাজেই প্রযোজ্য নয় পৃথিবীর সর্বত্রই এসব কারণের সারবত্তা মেনে নেওয়া হয়।

নষ্ট চরিত্র, ব্যভিচার এবং বন্ধ্যাত্ব বিবাহ বিচ্ছেদের সাধারণ কারণ। যৌন-কর্মে অপারগতাও বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনসঙ্গত কারণ বলে বিবেচিত। কিন্তু নিম্ন কঙ্গো অঞ্চলের বুশোঙ্গো (**Bushongo**) আদিম সমাজের নিয়ম বড়ো চিত্তাকর্ষক। বুশোঙ্গোদের মধ্যে যদি স্বামী যৌন-কর্মে অপারগ হয় তবে স্ত্রীকে পরিতৃপ্ত করার জন্য অন্য স্বাস্থ্যবান যুবক অন্বেষণ করে। স্বাস্থ্যবান যুবক পেয়ে গেলেই বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না। বরঞ্চ

না পাওয়া গেলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।[৩] অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় সে ক্ষেত্রেও পরীক্ষামূলকভাবে যৌন-কর্মে পারদর্শী ব্যক্তির অণ্বেষণ করা হয় বিবাহ টিকিয়ে রাখার জন্য।

বহু চারিণী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার রীতি বিশ্বজোড়া হলেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ ভারতের টোডা, সিকিমের লেপচা এবং আফ্রিকার দিংকা আদিম সমাজে। টোডাদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত যে কয়েক ভাইয়ে মিলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।[৪] অনুরূপভাবে একজন লেপচা যুবক তার সহোদর ছোট ভাইকেও তার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করতে কোনো বাধা প্রদান করে না।[৫] আফ্রিকার দিংকা আদিম সমাজে নিয়ম প্রচলিত যে স্ত্রী বহুচারিণী হোক ক্ষতি নেই, সে স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করলেই যথেষ্ট। কাজেই তাদের মতে বহুচারিণী হওয়া দোষণীয় নয়। অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না।[৬]

বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে প্যারাগুয়ে অঞ্চলের লেংগুয়া ইণ্ডিয়ান এবং ব্রহ্মদেশের কায়েন আদিম সমাজের নিয়ম খুবই চিত্তাকর্ষক এবং সমর্থন যোগ্য। বিবাহিত দম্পতির ঘরে যদি কোনো সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে তবে স্ত্রীর হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হবে না। এই ধরনের রীতি পৃথিবীর অন্যত্র খুব বিরল।[৭]

প্রখ্যাত মহিলা নৃবিজ্ঞানী ব্ল্যাকউড বুকা (**Buka**) আদিম সমাজের সংস্পর্শে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে—স্বামীর জন্য রান্নায় অনীহা, গৃহকর্মে অত্যধিক আলসেমী, যৌনকর্মে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, কোষ্ঠরোগ, বহুচারিণী ইত্যাদি। অপরপক্ষে স্ত্রীরও স্বামীকে তালাক দেবার ক্ষমতা রয়েছে পুরোমাত্রায়। সে ক্ষেত্রে কারণসমূহ এইরূপ: সংসারের ভরণ পোষণ করতে অক্ষমতা, নিষ্ঠুর প্রহার ও মারধোর, যৌনকর্মে অপারগতা ইত্যাদি।[৮] উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ কারণসমূহের জন্য বাংলাদেশের আদিম সমাজেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই তালাক প্রদান বিচিত্র নয়।

শুধু আদিম সমাজ নয় পৃথিবীর সব সভ্য বা উচ্চতর সমাজেও একই নিয়ম প্রচলিত। বাংলাদেশের প্রবাদে চিরসত্যই উন্মোচিত: 'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পূত।'

২১.

আদিম সমাজের যৌন-জীবন যে বৈচিত্রময় রহস্যে আবৃত এ সম্পর্কে আগেও বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের যৌন-জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দিক যৌবন-উৎসব (**Puberty rite**). যৌবন-উৎসব বা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান (**Initiation rite**) যাই বলি না কেন এর উদ্দেশ্য বহুবিধ।

প্রথমতঃ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলে বা মেয়ে উভয়েই এমন জগতে প্রবেশ করে, যে জগৎ তাদের কাছে নবতম উন্মাদনায় ভরপুর এবং একটা নতুনত্বের ছাপ যেন তাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে শিহরণ জাগায়।

দ্বিতীয়তঃ অনুষ্ঠানের পরেই ছেলেমেয়ে উভয়েই মনে করে তারা আর শিশুমাত্র নেই—তারা সংহত সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানব-মানবী।

তৃতীয়তঃ তাদের ধারণা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপদেবতা বশ করে তারা এমন সুন্দর জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে যে জীবন যৌবনের রঙীন আবেশে মুগ্ধকর এবং বার্ধক্যের স্পর্শ সেখানে অনুপস্থিত। নৃতত্ত্ববিদ হাটন ওয়েবস্টার যথার্থই বলেছেন: '......**The new life to which he awakes after initiation is one utterly forgetful of the old; a new name, new language and new privileges are its natural accompaniment.**'[১]

যৌবন-উৎসব কিংবা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান আদিবাসী ভেদে যেমন ভিন্ন প্রকৃতির তেমনি ভিন্ন সময়েও এসব প্রতিপালিত হয়। কখনো দেখা যায় ছেলেরা বয়োপ্রাপ্ত হলে ত্বকচ্ছেদের মাধ্যমে অথবা বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে

তাদের শৌর্য বীর্ষের পরীক্ষার নিমিত্ত অথবা নিছক অপদেবতার কুনজর থেকে রক্ষা করে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। অপর পক্ষে, মেয়েদের বেলায় প্রথম রজোদর্শনে কিংবা বিবাহের পূর্বে বিবাহের প্রস্তুতির জন্য এই যৌবন উৎসব কিংবা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়।

তুলনামূলক ভাবে বাংলাদেশের ও ভারতের আদিম সমাজের যৌবন উৎসব এবং পাশ্চাত্যের আদিম সমাজের যৌবন উৎসবের মধ্যে তফাৎ প্রচুর।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান (Initiation rite) প্রভৃতিতে যে রীতি প্রচলিত তাতে যৌন স্পর্শ যতটা আছে তার চেয়ে বেশী আছে সামাজিক ব্যবস্থা। অপরপক্ষে, পাশ্চাত্যের আদিম সমাজের যৌবন উৎসবে সামাজিক ব্যবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকলেও যৌন স্পর্শই অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের উল্লেখে লুসাই, কুকি, টিপরা প্রভৃতিদের যৌবনপ্রাপ্ত ছেলের ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে দুই তিন বছর খেটে খাওয়ার রীতির ব্যাপারটি ধরা যায়। দুই তিন বছর যৌবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে জামাই বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এবং এসবই তাদের যৌবন উৎসব বলে ধরে নেওয়া যায়।

অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেন্দুজ যুবক যখন শত্রুপক্ষের মানুষের মাথার খুলি হাজির করতে পারে কিংবা বন্য জন্তু জানোয়ার শিকার করে তাদের মাথা লোক সম্মুখে আনতে সমর্থ হয় তখনই সে গ্রামবাসী কর্তৃক স্বীকৃত সাহসী যুবক এবং বিবাহের উপযোগী বলে সাব্যস্ত। এই বীরো-দ্দীপ্ত কাজের পরিচিতিও ঘটে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এটাকেই সেন্দুজ যুবকের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীদের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উল্কী অঙ্কনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যৌবনে পদার্পণ করলেই ছেলে ও মেয়েকে উল্কী অঙ্কন করতে হবে এবং এই অঙ্কন চিহ্নই প্রমাণিত করে যে তারা বয়োপ্রাপ্ত যুবক এবং এক নতুন জগতের বাসিন্দা। অবশ্যি, উল্কী অঙ্কনের মধ্যে কতকগুলো সামাজিক রীতিনীতিও জড়িত। যেমন উল্কী বিহীন অবস্থায় কোনও ছেলে মেয়ের বিয়ে হতে পারবে না। এমনকি উল্কীবিহীন

অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে যমরাজা কর্তৃক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সর্বোপরি উল্‌কী চিহ্ন থাকলে অপদেবতার হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা।

সিলেট বা আসামের খাসীয়া মেয়েদের প্রথম রজোদর্শনের পর যে উৎসব পালন করা হয় এটাকেই বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে আসল যৌবন উৎসব বলে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এই উৎসবের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেক আদিবাসীদের যৌবন উৎসবের প্রভূত মিল রয়েছে।

প্রথম রজোদর্শনের উল্লাস কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দেশে যে সব উৎসব এবং সামাজিক কড়া নিষেধাজ্ঞা পালন করা হয় সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের মুরিয়া, ওরাওঁ, গোন্দ, কোল, ভীল প্রভৃতি আদিবাসীদের যৌবন উৎসব কিংবা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শুধু উল্‌কী অঙ্কনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—আনুষ্ঠানিক ভাবে যখন তারা গোতুল, ধুমকুরিয়া, মোরাং কিংবা অনুরূপ আডডাঘরের সদস্য হতে পারবে তখনই বোঝা যাবে যে তারা বয়োপ্রাপ্ত যুবক যুবতী। আডডাঘর জীবনের সদস্য হওয়ার ক্ষমতা অর্জনই যৌবন উৎসবের দিক সূচিত করে।

উড়িষ্যার ভূইয়া আদিবাসীদের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কুটিম্ব এবং বন্ধু পর্যায়ে পেঁৗছানোর যোগসূত্রই তাদের যৌবন উৎসব।

পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিয়ন (Siera Leone) এবং লাইবেরিয়া (Liberia) অঞ্চলের মেনদি (Mendi) ও তেম্‌নে (Temne) আদিবাসীদের সঙ্গে এই উপমহাদেশের মুরিয়া, ওরাওঁ, ভীল, ভূইঞা প্রভৃতিদের সঙ্গে মিল লক্ষিত হয়। কেননা, মেনদি ও তেম্‌নে আদিবাসীরাও পোরো (Porro) নামক আডডা ঘরের সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেলে তাদের যৌবন প্রাপ্ত বলে ধরা হয় এবং এটাই তাদের যৌবন উৎসবের উজ্জ্বল দিক।[২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের আদিবাসীদের যৌবন উৎসব বৈচিত্র্যের স্বাদে বাঙ্ময়। নর্থ আমেরিকার আদিম সমাজের ছেলেদের যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার অর্থই হলো সামরিক জীবনে অনুপ্রবেশ করা। এবং যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ঐন্দ্রজালিক শিক্ষাই হলো যৌবন উৎসবের আসল উদ্দেশ্য। এই কারণে অনুষ্ঠান ক্ষণে তারা হাত পা থেকে চামড়া কাটে, নখ তুলে ফেলে এবং ভারী ওজনের জিনিস দুই হাতে উত্তোলন

করে পেশী মজবুত করে। এসব যেন সামরিক জীবনেরই সফলতার প্রস্তুতি।[৩]

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার আদিবাসী ছেলেমেয়েদেরও যৌবন প্রাপ্তিতে বিশেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সামরিক জীবন কিংবা বৈবাহিক জীবনের উপযোগী কিনা এই পরীক্ষার নিমিত্ত বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। পরীক্ষার বিষয় হলো খালি পায়ে তাকে কঙ্কর বিছানো রাস্তায় মাইলের পর মাইল দৌড়াতে হবে। পা কেটে রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত তাকে থামতে দেয়া হবে না। এই শেষ নয়। ধারালো ছুরি দিয়ে তার চামড়া কাটা হবে, সুঁচ পুড়ে নখের নীচে বিদ্ধ করতে হবে, ইত্যাদি। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সে প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক বলে সর্বজন স্বীকৃত। নইলে তার পক্ষে সামরিক জীবন কিংবা বৈবাহিক জীবন কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

দক্ষিণ আমেরিকার কারিব (Carib) আদিম সমাজ যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেদের শরীরে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষাক্ত পিঁপড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। পিঁপড়ার কামড়ে যদি সে 'উহু আহা' করে তবে সে শক্তিশালী যুবক নয় বলে স্বীকৃত। তার ভাগ্যেও কনে জুটবে না কিংবা আদিবাসী (Tribal brotherhood) ভ্রাতৃত্ব অর্জন করতে পারবে না।

ব্রিটিশ গুইয়ানা অঞ্চলের মাকুসি (Macusi) আদিম সমাজও একই নিয়ম পালন করে।. বিষাক্ত পিঁপড়া সর্বাঙ্গে ছেড়ে দেওয়া ছাড়াও তাদের হাত পা, বুক প্রভৃতির মাংস কেটে সেলাই করা হয়। এতে যদি যুবক চিৎকার করে তবে সে বিবাহের অনুপযোগী।[৪]

পূর্ব আফ্রিকার নান্দী (Nandi) এবং বোর্নিও দ্বীপপুঞ্জের ওরাং বালিক পাপান (Orang Balik Papan) আদিবাসী সমাজভুক্ত যুবকদের যৌবন উৎসব প্রতিপালন করা হয় ত্বকচ্ছেদ-এর মাধ্যমে। ত্বকচ্ছেদ কালে যদি যুবক 'উঁহু আহা' করে কিংবা ব্যথায় মুখের চামড়া কোচকায় তবে সে পুরুষ নয় বলে সাব্যস্ত। এমনকি বিবাহের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে তার ভাবী স্ত্রীও উপস্থিত থাকে। যুবক যদি ত্বকচ্ছেদের সময় কোন রকম অস্বস্তির কথা ব্যক্ত করে তবে কনে সবার উপস্থিতিতে ঘোষণা করে যে সে তাকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক।[৫]

কালিফোর্নিয়ার গোয়ালুলা (Gualula) আদিবাসী সমাজভুক্ত বয়োপ্রাপ্ত ছেলেদের দশ থেকে পনর দিন পরীক্ষামূলক ভাবে শরীরের বিভিন্ন কসরৎ দেখাতে হয়। এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই সময়কালে তাকে বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয় না এবং ঘুমানোও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সে বিয়ে করতে সমর্থ হয়।[৬]

রবার্ট ব্রিফল্ট উল্লেখ করেছেন যে, আফ্রিকার কাফির এবং বেচুয়ানা যুবকগণ অনুরূপ অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে কেউ কেউ মৃত্যুও বরণ করে। তাছাড়া তাদের মধ্যে আরও একটি নিয়ম প্রচলিত যে, যদি পরিশ্রান্ত যুবক-গণ ক্ষুধার্ত হয় তবে তাদের সেই খাবার চুরি করে খেতে হয়। চৌর্যবৃত্তির সময় যদি তারা ধরা পড়ে তবে তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে এই বলে যে, সে অনুপযুক্ত।

পলিনেশিয়া ও মিসিসিপি অঞ্চলের নাটচে (Natchez) আদিবাসীদের ছেলেদের যৌবন উৎসব উল্কী অঙ্কনের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। এই উলকী আঁকার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রণার চরম পরাকাষ্ঠা। কোন কোন ক্ষেত্রে উল্কী আঁকা হয় নাকের উপর। নাকের উপর উল্কী আঁকলেই বুঝতে হবে যে, শত্রুপক্ষের কাউকে হত্যা করে তার মাথার খুলি হাজির করতে হবে। যদি সে অনুরূপ কাজ করতে না পারে তবে সে যুবক নামের অযোগ্য। উল্কীর ঘা শুকিয়ে গেলেই নৃত্য গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।[৭]

শ্রীলঙ্কা ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভেদ্দা (Vedda) আদিবাসীদের যৌবন উৎসব ভিন্ন প্রকৃতির। ভেদ্দা ছেলে বয়োপ্রাপ্ত হলেই শত্রু পক্ষের কাউকে হত্যা করে তার চর্বি অথবা শূকরের চর্বি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলের গায়ে মালিশ করে দেবে। তাদের বিশ্বাস, বয়োপ্রাপ্ত ছেলে আরও শক্তির অধিকারী হবে এবং সব কাজে তার জয় অবশ্যাম্ভাবী।[৮]

ভিক্টোরিয়া দ্বীপের আদিবাসীরা অবশ্যি শত্রুর চর্বি তরবারি, বল্লম ও বন্দুকের গায়ে মালিশ করে এই বিশ্বাসে যে, তরবারি প্রভৃতি আরও অধিক শক্তি অর্জন করবে।[৯]

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান (Indian) আদিবাসীরা শিকারলব্ধ জন্তু জানোয়ারের প্রজনন অঙ্গ (Genital organ) বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়োপ্রাপ্ত ছেলেদের খাওয়ায়। তাদের বিশ্বাস, এতে ছেলে

বলবান হবে। তাদের মধ্যে আরও নিয়ম প্রচলিত যে, প্রজনন অঙ্গ দা কিম্বা ছুরি দিয়ে কাটা নিষেধ। সেসব ছিঁড়তে হবে দাঁত দিয়ে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, যদি পালিত কুকুর সেই প্রজনন অঙ্গ খেয়ে ফেলে তবে সেই কুকুর পাকা শিকারী হবে। আর মেয়েদের তা খেতে বারণ করা হয় এইজন্যে যে, নারী জাতি শক্তিধারিণী হবে এবং পুরুষ তাদের কাছে পদানত থাকবে।[১০]

সবস্তুতঃ একই কারণে এই উপমহাদেশের মিরি আদিবাসী মেয়েদের বাঘের মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার নারিনয়েরী (Narrinyeri) আদিবাসী সমাজের ছেলে-দের যৌবন উৎসবও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ছেলেদের দাড়ি গজাবার পর দুই ইঞ্চি পরিমাণ হলে তা টেনে তুলে ফেলতে হয়। এই ভাবে তিনবার দাড়ি তুলে ফেললেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে তারা বয়োপ্রাপ্ত যুবক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপযুক্ত। তিনবার এই দাড়ি উপড়ে ফেলার সময়কাল পর্যন্ত তারা মেয়েদের সঙ্গে একত্র খানা খেতে পারবে না। তাদের বিশ্বাস মেয়েদের সঙ্গে একত্র খানা খেলে তারা কুৎসিত এবং বুড়িয়ে যেতে পারে ('lest they grow ugly or become grey').[১১]

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজের ছেলেরা বয়োপ্রাপ্ত হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের মাথার চুল টানা হয়। তাদের বিশ্বাস এতে শুধু চুলের গোড়াই শক্ত হয় না, শরীরের গঠন আকৃতিও মজবুত হয়। শুধু তাই নয় এই চুল টানা উৎসবের পিছনে আরও যুক্তি যে, ছেলেদের মধ্যে এমন শক্তি অনুপ্রবেশ করবে যার ফলে রোগ জরা কিংবা কোন দৌর্বল্য তাদের আক্রমন করতে পারবে না।[১২]

মেয়েদের যৌবন উৎসব বা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সাধারণতঃ প্রথম রজো-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপালন করা হয়। এ সম্পর্কে আগেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রমও যে না আছে এমন নয়। প্রসঙ্গত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কউ (Kau) আদিবাসী সমাজের মেয়েদের যৌবন উৎসবের উল্লেখ করা যায়। তাদের যৌবন উৎসব পালন করা হয় বিবাহ উপযোগী হলে কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে। সি. হ্যাণ্ডি-এর মতে, 'when a girl became of marriagable age and was spoken

for as wife, she was taken to the chief who would remove her verginity. *Na Ke ali-i moe mua* (for the chief to sleep with for the first time').[১৩]

সাউথ সি অঞ্চলের সামোয়া (Samoa) আদিম সমাজভুক্ত মেয়েদের জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত হলো যৌবন উৎসব বা সতীচ্ছদ পর্দা উন্মোচন ব্যবস্থা। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক আদিম সমাজই সভ্যতার আলোকে পদার্পণ করেছে কিন্তু এখনও অনেক আদিম সমাজ রয়েছে যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে এখনও অনড়। সাউথ সি অঞ্চলের সামোয়াগণ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। এবং তাদের যৌবন অনুষ্ঠান বা সতীচ্ছদ পর্দা উন্মোচন ব্যবস্থা প্রাচীনতম নিদর্শনেরই পরিচয় বহন করে। কেননা, এই অনুষ্ঠান পালন করা হয় জনসভার মাধ্যমে। ডব্লিউ. টি. গ্রিচার্ড-এর বর্ণনা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি এইরূপ :

'উত্তম সাজে সজ্জিত করে মেয়েকে সভাস্থলের মধ্যবর্তী স্থানে (Malae) আনা হয়। সঙ্গে থাকে দুইজন বর্ষিয়সী মহিলা। মেয়েটিকে উলঙ্গ অবস্থায় একটি সাদা ধবধবে মাদুরে বসান হয়। মাদুরটি থাকে (Malae)-এর মাঝখানে। মেয়েটি বসে দুই পা আড়াআড়ি করে। অতঃপর আদিবাসী প্রধান আস্তে আস্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে মেয়েটির সম্মুখে মুখোমুখি হয়ে আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে উপবেশন করেন। অতঃপর সঙ্কটময় মুহূর্তের শুরু।

হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে মেয়েটির দিকে—তাদের মুখে কথা নেই, ধ্বনি নিস্তব্ধ।......প্রধান আস্তে করে তাঁর বাম হাত মেয়েটির কাঁধে স্থাপন করে ডান হাতের দুটো আঙ্গুল যোনি প্রদেশে সঞ্চালন করতে থাকেন। দুইজন বর্ষিয়সী মহিলা পশ্চাত দিক থেকে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে থাকে। সমস্ত জনতা অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রধানের আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এই জন্যে যে, শীগ্‌গীরই সতীচ্ছদ পর্দা ছিঁড়ে রক্তের ফোটা ঝরে পড়বে। রক্ত দর্শনই হবে উল্লসিত আনন্দের কারণ। শুধু তাই নয়—রক্ত বিন্দুর মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতির গৌরব, প্রধানের সম্মান এবং মেয়ের সতীত্বের নিদর্শন এবং তার বাপ মায়ের সুনাম।......

রক্ত বেরিয়ে আসলো আর অমনি বর্ষিয়সী মহিলা দুইজন চীৎকার করে তার সতীত্বের ব্যাখ্যা ঘোষণা করতে শুরু করলো।

সবার সম্মুখে তখন মেয়েটা উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটছে আব তার উরু প্রদেশ বেয়ে রক্ত ঝবছে। মেয়েটা এসব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু আড়ালে মেয়েটার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নোনা অশ্রু..........।

যদি এই পরীক্ষাব ফল প্রতিকূল হয় তবে মেয়ের ভাই ও বাবা প্রধানের সম্মান ক্ষুণ্ণ হওযার জন্য, জাতির গৌরব বিনষ্ট হওযাব অভিযোগে এবং সর্বোপরি তার নিজেব নষ্ট চরিত্রের জন্য তাকে অসম্ভব মারধোব কবে সমাজ থেকে বহির্গত কবে দেবে। কেননা, তার দৃষ্টিও তখন ভীতিপ্রদ।[১৪]

যৌবনাবস্থায অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েদের সতীচ্ছদ পর্দা উন্মোচনেব বীতি সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের সাকাইস (Sakais), বাট্টাস (Battas), এবং আলফোর (Alfoors) প্রভৃতি আদিবাসী সমাজেও বয়েছে। আদিবাসী প্রধানের পরিবর্তে মেয়ের অভিভাবক শ্রেণীব লোকেবা এই কাজ সম্পাদন করে থাকে, তবে জনসমক্ষে নয়, গোপনে এবং চার দেয়ালের মধ্যে।[১৫]

নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলের তিব্বতের টোডা আদিবাসী সমাজেও অনুরূপ রীতি প্রচলিত আছে। বিযের আগে এই অনুষ্ঠান পালন না করলে সামাজিক আইনে তা দোষনীয়। শক্ত সামর্থ এবং স্বাস্থ্যবান যুবককে অধিকার দেওয়া হয যৌবনবতী মেয়েদেব সঙ্গে রাত্রি যাপন এবং সহবাস করবার জন্য। এমনকি প্রচলিত আছে যে, '....... **men might refuse to marry her if this ceremony had not been performed at the proper time.'**[১৬]

সতীচ্ছদ পর্দা উন্মোচন প্রথা যে আদিম সমাজের সংস্কারবদ্ধ ধারণা-সঞ্জাত ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। এর মূল কারণ অন্বেষণে কেউ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন নি। যদি এ প্রথার প্রচলন সতীত্ব পরীক্ষার অন্যতম পন্থা হিসেবে ধরা হয় তবে সে সতীত্ব পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বামী ছাড়া অন্য লোকে অধিকার পাবে কেন? সতীচ্ছদ পর্দা ছিন্ন অবস্থা সতীত্বের আসল কারণ নয়। কেননা সঙ্গম রীতি ছাড়াও দৌড়াদৌড়ি, ঘোড়ায় আরোহণ ইত্যাদিজনিত ব্যাপারে সতীচ্ছদ পর্দা ছিন্ন হতে পারে। অপদেবতার কোপ থেকে রক্ষাকল্পে যে অনুরূপ রীতি প্রতিপালিত হয় এটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। ই. ক্রলে এই রীতিকে শিশ্ন-ক্ষোভ (**Penis envy**) এড়ানোর পন্থা বলে বর্ণনা করেছেন।[১৭]

পক্ষান্তরে ব্যাপারটি স্বপ্নের আলোক নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে ডক্টর ফ্রয়েডের চোখে। তিনি শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, '...primitive custom appears to accord some recognition to the existence to the early sexual wish by assigning the duty of defloration to an elder, a priest, or a holy man, that is, to a father-substitute.'[১৮]

যৌবন উৎসবের আবশ্যকতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ জে. জি. পারিসার্টিয়ানী কেনিয়ার আফ্রিকান নিগ্রো সম্প্রদায়ভুক্ত কিপসিগিস (Kipsigis) আদিম সমাজের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখ করেছেন যে, যৌবন-উৎসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে—যুবক-যুবতী উভয়কে শক্ত-সামর্থ্য করা, প্রকৃত যোদ্ধা রূপে মানব-জীবন গঠন করা, জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইত্যাদি।[১৯]

২২

পূর্ববর্তী আলোচনায় অবাধ মেলামেশা এমনকি অবৈধ যৌন-কর্ম (Incest) সম্পর্কে সামান্য ইংগীত দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব উপজাতীয় সমাজেই অবাধ মেলামেশার রীতি প্রচলিত আছে এবং কিছু কিছু সমাজে বিবাহ-পূর্ব কালে যৌন-সম্ভোগও তেমন দোষণীয় নয়। তবে এ কথা সত্য যে বিবাহোত্তর কালে সচরাচর কাউকে বিপথগামী হতে দেখা যায় না। বিবাহোত্তর কালে যদি কোনো নারী এমন গর্হিত কাজ করে তবে সে সমাজের চোখে নিন্দনীয়। এমনকি এসব কারণে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে।

বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো আদিম সমাজে স্ত্রীগণ স্বামীদের মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর শবদাহের হাড় কুড়িয়ে মালা গেঁথে গলায় পরিধান করে এবং বাকী জীবন ঈশ্বরের ধ্যানে কাটিয়ে দেয়। তথাপি দ্বিতীয় বারের মতো পতি গ্রহণের চিন্তা কিংবা অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার লক্ষণ তাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। খাসীয়া সমাজ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

কিন্তু পাশ্চাত্য অঞ্চলের আদিম সমাজে জন্তুদশার এমন কতকগুলো লক্ষণ এখনো বর্তমান যা বাংলাদেশের আদিম সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ স্ত্রীর ভগ্নিদের সঙ্গে অবাধ যৌন কর্ম (Sororal Polygyny), যৌন-আতিথেয়তা (Sexual Hospitality), স্ত্রী বদল (Exchange of Wifes), ভ্রাতা ভগ্নির বিবাহ, পিতা-পুত্রীর যৌন মিলন, প্রকাশ্য যৌন-সম্ভোগ ইত্যাদির নাম করা যায়।

স্ত্রীর ভগ্নিদের সঙ্গে অবাধ যৌন কর্মের উল্লেখে সাউথ ইষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার কোরনাই, আপার আমাজনের ক্যানেবো (Canebo), আফ্রিকার কাফির ও জুলু প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়াও টরেস ষ্ট্রেইট্‌স দ্বীপপুঞ্জ, জিপস্‌ল্যাণ্ড (Gippsland), উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিম সমাজভুক্ত লোকদের নাম বিশ্ব বিশ্রুত।

সাউথ ইষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার কোরনাই আদিম সমাজে নিয়ম প্রচলিত যে, কোনোও যুবক যদি কোনোও যুবতীকে নিয়ে পলায়ন করে তবে তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহের পর কনের পিতামাতা উষ্মা ভরে তাদের বাকীসব কন্যাকেও সেই যুবকের হাতে জোরপূর্বক অর্পণ করে। সে ক্ষেত্রে সেই যুবক তখন তাদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের সঙ্গে স্ত্রী সুলভ আচরণ করে। জিপ্‌স্‌ল্যাণ্ডের আদিম সমাজে স্ত্রী এবং স্ত্রীর ভগ্নিদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রীর ভগ্নিগণ একই আচরণ পেয়ে থাকে, এমনকি যৌন বিহারেও।

টরেস ষ্ট্রেইট্‌স দ্বীপপুঞ্জের আদিম সমাজে এককালে এই নিয়ম খুবই প্রবল ছিল। এমনকি বর্তমানেও তা অন্তর্হিত নয় (....'even to-day husbands normally have marital relations with wives' sisters').[১]

আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের উরেগন (Oragon), বাহোলুহোলু (Baholo-holo), ওয়াবেমবা (wabemba) প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে আরও অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত। যদি কোনো যুবকের স্ত্রী মারা যায় তবে তার স্ত্রীর ভগ্নি বিবাহিত থাকলে সেই ভগ্নির স্বামী তাকে তালাক দেবে এবং আগের ভগ্নিপতির সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

ওরাবেমবা সমাজে যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ভগ্নি অপ্রাপ্ত বয়স্কা থাকে তবে প্রাপ্ত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত তাকে ভগ্নিপতির হাতে অর্পণ করবে না। অন্তঃবর্তীকালীন সময়ের জন্য একজন দাসী পাঠানো হবে যৌন সম্ভোগের নিমিত্ত এবং বিবাহ যোগ্যা হলেই সেই ভগ্নিকে ভগ্নিপতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে।

বাহোলুহোলু আদিম সমাজে একই নিয়ম প্রচলিত। তবে তফাৎ এই যে, শালী শিশু অবস্থায় থাকলে অন্তঃবর্তীকালীন সময়ে দাসী পাঠাতে হয় না; ভগ্নিপতি নিজেই শিশু শালীর সঙ্গে ঘর করে এবং যৌন কর্মের

মহড়া দেয়('....goes through the form of imitating the sexual act with her'.)[২]

যৌন আতিথেয়তার উল্লেখে আমেরিকার কোরিয়াক (Koryak) আদিম সমাজের নাম করা যায়। তাদের মতে বহির্বিবাহ অনুমোদিত গোষ্ঠীর (Exogamous clan) সমবয়সী সব যুবকই আদিবাসী ভাই (Tribal brother) এবং তাদেরকে উপভোগ করার জন্য অনেক সময়ই নিজের স্ত্রী কিংবা ভগ্নিকে অর্পণ করা হয়। এমনকি অতিথিদের কাছে অর্পণ করার কালে স্ত্রী কিংবা ভগ্নিগণ কোন আপত্তি করতে পারে না। এমনকি রাত্রিবেলায় পুরুষগণ পর্যন্ত অতিথিদের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে অর্পিতা নারীগণ কোন আপত্তি করছে কিনা জানার জন্যে। আপত্তি করলে তাদের রীতিমত গালাগাল দেওয়া হয়।

আরবদের মধ্যেও এই রীতি এককালে খুবই প্রবল ছিল। রবার্ট ব্রিফল্ট আরব জুরিষ্ট আতা ইবন্ আবি রবাহ-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'the custom of offering one's wife to a guest was of old a universally-sanctioned custom of the Arabs. In some Arab tribes this has survived down to the present, or quite recent, times'[৩]

আদিম সমাজের এই বেশ্যাবৃত্তিমূলক আতিথেয়তার মধ্যে যা সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য তা হলো শত্রুতা ভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রীর বিনিময়ে সখ্যতা লাভ এবং এই সখ্যতা লাভের যোগসেতুও আদিম ধারণা সঞ্জাত। স্ত্রী বদল রীতি নর্থ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান এবং এস্কিমোদের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সাময়িকভাবে স্ত্রী বিনিময় তাদের কাছে মোটেই লজ্জাকর এবং দোষণীয় নয়। এটাই বন্ধু প্রীতির লক্ষণ এবং পরস্পর শত্রুতা বিনষ্টের যোগসেতু। ডক্টর মারডক লক্ষ্য করেছেন যে, কোনো কোনো সময়ে গ্রামের সবাইর হাত বদল হয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী পৌঁছতে মাসাধিক কাল লেগে যায়।[৪]

তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের আরিউই (Arioi) সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন রীতি লক্ষ্য করা যায়। যদি আরিউই যুবকেদের স্ত্রী বংশ মর্যাদায় স্বামীর চেয়ে উন্নত হয় তবে সে সহবাসের নিমিত্ত যত খুশী তত স্বামী গ্রহণ করতে

পারে কিন্তু সামাজিক রীতি অনুসারে প্রথম যার সঙ্গে বিয়ে হবে নীতিগত ভাবে তারই স্ত্রী হিসেবে টিকে থাকবে।*

অষ্ট্রেলিয়ার মারনগিন (Marngin) আদিম সমাজের স্ত্রী বিনিময় সঞ্জাত অবাধ যৌন মিলনও খুব চিত্তাকর্ষক। এই যৌনক্রিয়া প্রতিপালন করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আঞ্চলিক ভাষায় এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'গুণাবিবি' (gunabibi). দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী পুরুষ সকলেই এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এন. ওয়ারনার 'গুনাবিবি' অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেছেন, **'when a local man discovers that a certain visitor from a far clan is his tribal brother, he sends his younger brother in inform this person that he may have the local man's wife for ceremonial copulation at the end of the *gunabibi* ceremonny. He sends presents along wiih the younger brother. The recipient, either through his own younger brother or through the messenger, offers his own wife in exchange, and also sends presents.'**৬

মারনগিনদের এই 'গুনাবিবি' অনুষ্ঠান মূলতঃ স্ত্রী বিনিময়েরই স্বাক্ষর বহন করে। এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল রয়েছে মারনগিনদের সংস্কারাবদ্ধ ধারণা ও ম্যাজিক। তাদের মতে এই অনুষ্ঠানে যদি কেউ উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কিংবা যৌন-কর্মে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে তার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা—হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগবে, না হয় মৃত্যুর কবলে পতিত হবে। এন ওয়ারনার মারগিনদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ করে যা জানতে পেরেছেন তাতে গুনাবিবি অনুষ্ঠান সম্পর্কে মারগিনদের বক্তব্য এইরূপ: "গুনাবিবি অনুষ্ঠানের আনন্দ মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা বিদূরিত করে। পরবর্তী গুণাবিবি অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকের মন প্রফুল্ল থাকে। বলা যায়, এই অনুষ্ঠান বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানের সময়কাল এক বছর। এটা খুবই ভালো কথা যে প্রত্যেকে স্ত্রীসহ গুনাবিবি অনুষ্ঠানে আনন্দ-কেলির জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুক এবং বছরের বাকী সময় তাদের আর আনন্দের প্রয়োজন পড়বে না।.. ..যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে বলে যে সে এই অনুষ্ঠানে

যেতে নারাজ তবে তার স্বামী তাকে বলতে বাধ্য 'যদি তুমি ইচ্ছায় না যাও তবে তোমাকে মৃত অবস্থায় সেখানে নেওয়া হবে।' এমনকি আমরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক মহিলাকে ম্যাজিক প্রভাবে হত্যা করি এবং তাদের মুখে অবজ্ঞার বল্লম নিক্ষেপ করে থাকি।"[৭]

অষ্ট্রেলিয়ার এস্কিমো আদিম সমাজের স্ত্রী-বদলের রীতি বিশ্বখ্যাত। বন্ধুত্বকে গাঢ় করার জন্য বন্ধুর কাছে এক বছর বা ততোধিক কাল স্ত্রী রাখার নিয়ম এস্কিমো সমাজে প্রচলিত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এটা ধর্মীয় আইনের নির্দেশ বলে স্বীকার করা হয় ('is even commanded by a religious Law').[৮]

যে উদ্দেশ্যে মাবনগিনি সমাজ বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'গুনাবিবি' পালন করে ঠিক প্রায় একই উদ্দেশ্যে এস্কিমো সমাজও স্ত্রী-বদলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করে। এস্কিমোদেরও সংস্কারবদ্ধ ধারণা যে অপদেবতা তাড়ানো কিংবা মনে প্রফুল্লতা আনয়নের জন্য স্ত্রী-বদল রীতি অপরিহার্য। বছরের একসময়ে তাদের রীতি অনুসারে '..... ..arises a cry of surprise and all eyes are turned forward a hut out to which stalk two gigantic figures. They wear heavy boots, their legs are swelled out a wonderful thickness with several pairs of breeches, of the shoulders of each are covered by a woman's over-jacket and the faces by tattooed marks of seal skins....Silently, with long striaes, the *puailertangs* (shamans) appıoch the assembly, who screaming press back from them. The pair solemnly lead the men to a suitable spot and set them in a row, and the women in another opposite them. They match the men and women in pairs and these pairs run, pursued by the *puailertangs*, to the hut of the women, where they are for the following day and night as man and wife.'[৯]

মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার বাহিমা, মাসাই, বাকুন্তা, আকাম্বা, নান্দী, চাগ্গা, ওয়াতাবেতা প্রভৃতি আদিম সমাজেও স্ত্রী-বিনিময় রীতি লক্ষ্য করা যায়। মাসাইদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত যে, 'At marriage all individuals in an age-grade can demand intercourse with the bride. The groom faces dishonour if he refuses. Throu-

ghout the marriage full sexual hospitality can be claimed, and not refused by members of an age-grade...'[১০]

অবাধ যৌন মিলনেব চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য কবা যায় পলিনেশিযার মারকোয়েসা দ্বীপের আদিম সমাজের লোকদের মধ্যে। এই অবাধ যৌন সম্ভোগকে আনুষ্ঠানিক পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয। এই অনুষ্ঠান প্রতি-পালিত হয় প্রত্যেক বিবাহ উৎসবে। বিবাহের পর নববধূর সঙ্গে উপস্থিত অতিথিবৃন্দেব যৌন ক্রিয়া এক চিত্তাকর্ষক ব্যাপাব। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এল. এফ. তউতেইন-এর বর্ণনা অনুযায়ী: ......at a sign from the bridegroom all the men present assembled, forming a que, and each in turn passed before the bride, who lying in a corner of the *Paepae* with her head one the bridegroom's knee, received them all as husbands. The procession was headed by the oldest man and those of the lowest birth, then came the great chief and last of all the husband......when one thinks of the great number of man who took part in these festivities......one may well-think that the proceedings were only symbolic. But they were not......A newly married woman was sometimes half-dead and obliged to keep her bed for several days afterwards.[১১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বি. ড্যানিয়েলসন উল্লেখ করেছেন যে, এই রীতি তাদের কাছে মোটেই লজ্জাজনক কিংবা অপমানকর নয়। বরঞ্চ এটা নববধূর পক্ষে সহনশীলতা ও শক্তির পরীক্ষা। এমনকি যে যতবেশী অতিথির মনোরঞ্জন করতে পারবে তত বেশী তাব পক্ষে গৌরবজনক ব্যাপার।[১২]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদশক আগে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার গ্রাম অঞ্চলের কোনো এক বিবাহে অতিথি হওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। সেখানে বিয়ের পর অন্দব মহলে নববধূকে অতিথি-বৃন্দের কোলে বসানোর রীতি লক্ষ্য করেছি। তবে তাতে অশ্লীলতার কোনো স্পর্শ নজরে পড়েনি। রীতিটি যে মার্জিত আকারে মারকোয়েসা আদিম সমাজের অবশেষ, তা বলাই বাহুল্য।

নব বধূর সঙ্গে অবাধ যৌন সম্ভোগ রীতি পূর্ব আফ্রিকার ওয়াতাবেতা (**Wataveta**), ওয়া টেইটা (**Wa-teita**) প্রভৃতি আদিম সমাজেও লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত যে, বিবাহের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নববধূ পলায়ন করে। এই পলায়নপর নববধূকে খুঁজে বের করা স্বামীর একার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এ কারণে তার কম পক্ষে চারজন সহকারী বন্ধুর দরকার। তাদের সহযোগিতায় নববধুকে খুঁজে বের করে এবং তাদেরকে শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ নববধুর সঙ্গে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করার অধিকার দেওয়া হয়।[১৩]

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার কোরনাই আদিম সমাজে একই নিয়ম প্রচলিত। কোরনাই বরও তার বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় নববধূকে পালাবার পর গহীন অরণ্য থেকে খুঁজে বের করে আনে এবং পরে তাকে বন্ধুদেরকে ভোগ করবার জন্য অর্পণ করে।[১৪]

আমাদের দৃষ্টিতে এটা অশোভন, অশালীন এবং বিশৃঙ্খল মনোবৃত্তির পরিচায়ক হতে পারে কিন্তু তাদের কাছে 'এটা ধর্মীয় অনুবেদন' (**'religious service.'**) [১৫] .

গ্রীনল্যাণ্ডবাসী আদিম সমাজও স্ত্রীর সঙ্গে অন্যদের সহবাস রীতি অনুমোদন করে। তবে সবার সঙ্গে নয়—সমাজের সিদ্ধপুরুষ পদবাচ্য ওঝা বা **angekok**-এর সঙ্গে। তাদের বিশ্বাস ওঝার সঙ্গে সহবাস করার ফলে যে সন্তানের জন্ম হবে সেই সন্তান অবশ্যি ভালো হবে (**'the child of such a holy man is bound to be better than others'.**)[১৬]

বাংলাদেশের আদিম সমাজে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িত হতেও দেখা যায় না। সামাজিক আইন অনুসারে মা, দাদী, ফুফু, খালা, সহোদর বোন, ভাই ঝি, ভাগ্নি, মেয়ে প্রভৃতি ছাড়াও সগোত্রভুক্ত বোনশ্রেণীর মেয়ে এবং টোটেম সম্পর্কিত গোষ্ঠির মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ। এ কারণে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনও ধর্মীয় অনুশাসনের বহির্ভুত কাজ। বিয়ে করতে হলে যেমন গোত্রের বাইরে থেকে মেয়ে আনতে হয় তেমনি প্রেম বা যৌন লিপ্সা পরিতৃপ্ত করতে হলেও বাইরের গোত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

পাশ্চাত্য দেশে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে এই উপমহাদেশের আদিম সমাজ পাশ্চাত্য অঞ্চলের আদিম

সমাজের চেয়ে মার্জিত রুচির অধিকারী। ইতিপূর্বের বিভিন্নধর্মী আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট।

মানব সমাজ যখন জন্তুদশায় আবদ্ধ ছিল তখনকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আধুনিক কালের শিক্ষিত ও সভ্য জগতেও জন্তুদশার পরিচয় যখন আমাদের গোচরীভূত হয় তখন ভাবতে অবাক লাগে, কি করে এসব সম্ভব?

বাংলাদেশের আদিম সমাজের সামাজিক জীবনের রীতি নীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের আদিম সমাজের সামাজিক জীবন প্রবাহের তুলনা করলে এই মন্তব্যে আশা করি কারো সন্দেহ থাকবে না যে, এই দেশের আদিম সমাজ অনেক সভ্য এবং সভ্যতার সূত্রপাত এখানেই আগে শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য অঞ্চলের আদিম সমাজে জন্তুদশার পরিচয় কি রকম বিধৃত নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে আশা করি।

জন্তুদশা কিংবা একান্ত বর্বর অবস্থায় পিতা পুত্রীর অবৈধ যৌন মিলনের কথা জানতে পারা যায়। উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ইফারট (Effertz)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সিয়েরা মাদ্রে (Siera Madre), মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম সমাজে পিতা পুত্রীর অবৈধ মিলন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ('is of daily occurrence). অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার ভ্রাতা ভগ্নির অবৈধ মিলন রীতি সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, পিতা পুত্রীর অবৈধ মিলনের অন্তরালে অর্থনৈতিক কারণও জড়িত। কেননা, তারা অরণ্য অভ্যন্তরে শস্য উৎপাদনের জন্য দূরবর্তী অঞ্চলে গমন করার সময় মেয়েকে সঙ্গে নেয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে রাত্রি যাপনের জন্য একটিমাত্র কম্বলই তাদের অবলম্বন। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে তাদের অবৈধ মিলন অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি যদি কন্যা সাথী না হয় তবে অন্য কোন নারীকে অবশ্য সঙ্গে নিতে হবে এবং ফসলের অর্ধেক ভাগ তাকে দিতে হবে।[১৭]

পূর্ব আফ্রিকার তেইতা (Teita) সমাজে আরও জঘন্য রীতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে বিবাহ হলো ভয়ানক খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। এ কারণে বিধবা মা কিংবা ভগ্নিকেও বিয়ে করতে দেখা যায়।[১৮]

আফ্রিকার নিয়াম নিয়াম (Niam Niam) আদিম সমাজের আদিবাসী প্রধানরাও নিজেদের কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ('**take their daughters to wife**'.)[১৯]

একই অঞ্চলের অসেটেস (Ossetes) আদিম সমাজ মায়ের বোন বা খালার সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করে কিন্তু পিতার বোন বা ফুফুর সঙ্গে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মাতৃগোষ্ঠীর মেয়ের সঙ্গে বিবাহে বিধি নিষেধ নেই কিন্তু পিতৃগোষ্ঠীর মেয়ের সঙ্গে বিধি নিষেধ বা টাবু জড়িত আছে। তাছাড়া একই সঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করা বেশী সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে বিবেচিত **('It is an especially fortunate marriage to take two sisters together.')**[২০]

ভ্রাতা ভগ্নিতে বিবাহ রীতি আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং রাশিয়ার অনেক আদিম সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। মাদাগাস্কার অঞ্চলের সাকালাভা (Sakalava) আদিম সমাজে ভ্রাতা ভগ্নিতে বিবাহ প্রচলিত।[২১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ল্যাংসডরফ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায় যে, কোডিয়াক দ্বীপের আলেওট (Aleut) আদিম সমাজেও ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও সেখানে ভ্রাতা ভগ্নির বিবাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।[২২]

আফ্রিকার ভেদ্দাহ (Veddah) সমাজে বড় বোনের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদনীয় নয় কিন্তু ছোটবোনের সঙ্গে বিবাহে কোন বাধা নেই।[২৩]

অনুরূপভাবে কাম্বোডিয়ার আনামাইট (Anamites) আদিম সমাজেও ভ্রাতা ভগ্নির বিবাহ সামাজিক আইনে স্বীকৃত।[২৪]

বলীদ্বীপ পুঞ্জের আদিম সমাজ যমজ ভাই বোনের বিবাহ অনুমোদন করে। তাছাড়া যমজ দুই বোন একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রীতিও তাদের মধ্যে প্রচলিত।[২৫]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিহাস খ্যাত তৈমুর লং একই সঙ্গে সহোদর দুইবোনকে বিয়ে করে নৃতাত্বিক জগতে চিহ্নিত হয়ে আছেন।[২৬]

বাংলাদেশের চাকমা সমাজে একই সঙ্গে স্ত্রীর সহোদর বোনকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত। রাঙ্গামাটির চেঙ্গী বড়দাম মৌজার শ্রীপান্নালাল দেওয়ান বড় কাটলী মৌজার সাবেক হেডম্যান শ্রীশশীমোহন দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেওয়ানকে বিয়ে করেন। এর পর কয়েক বছরের মধ্যেই পান্নালাল দেওয়ান আগের স্ত্রী জীবিত থাকতেই শ্রীশশী মোহনের ঔরসজাত অপর দুই কন্যাকে একই সঙ্গে বিয়ে করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের গারো উপজাতীয় সমাজেও

একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক সহোদর বোন বিয়ে করার নিয়ম দৃষ্টি গোচর হয়।

আদিম সমাজ ছাড়াও তথাকথিত 'সভ্য' সমাজে পিতা পুত্রী, মাতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নি, ভাই ভাইঝি ইত্যাদি কেন্দ্রিক যৌন সংসর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতিতে অনেক রাজবংশেই এসবের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

টেনেরিফ (Teneriffe) রাজবংশের রাজপুত্রগণ সমমর্যাদার বা অনুরূপ রাজকীয় পরিবারের মেয়ের অভাবে সহোদর বোনদেরকেই বিবাহ পাশে আবদ্ধ করতো। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস খ্যাত রাজদম্পতি আইসিস (Isis) এবং অসিরিস (Osiris)-ও ছিলেন ভ্রাতা ও ভগ্নি। সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং সম্রাট প্রথম সামেটিকও (Psammetik I) নিজ কন্যার পানিগ্রহণ করেন। এসব বিয়ের অন্তরালে ছিল রাজ্যলোভ অথবা সিংহাসন চ্যুতির ভয়।[২৭]

টলেমী (Ptolemies) রাজবংশেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ গালটন উল্লেখ করেছেন: 'Indicating the Ptolemies by numbers according to the order of their succession, II married his niece and afterwards his sister ; IV his sister, VI and VII were brothers and they consecutively married the same sister ; VII also subsequently married his niece ; VIII married two of his own sisters consecutively ; XII and XIII were brothers and consecutively married their sisiter, the famous Cleopatra.'[২৮]

'হোমার'-এ বর্ণিত অমর প্রেম উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা জিউস এবং হেরাও ছিল ভ্রাতা ভগ্নি এবং এই 'হোমার'-এ মাতা পুত্রের মিলনকে দুঃখ-জনক বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। গ্রীক কাহিনীর নায়ক-নায়িকা ইডিপাস ও তার মায়ের মিলন ছিল ভুলের ফলশ্রুতি এবং এ জন্য তার পরিণামও ভয়াবহতায় রূপলাভ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিও ব্রহ্মদেশের সিয়াম রাজবংশে সিংহাসন চ্যুতি এড়াবার জন্য ভ্রাতা ভগ্নির বিবাহের নিয়ম লক্ষ্য করা গেছে।[২৯]

বৈদিক সংস্কৃতিতেও পিতা পুত্রী এবং মাতা পুত্রের যৌন সংসর্গের উল্লেখ বর্তমান। বৈদিক যুগের প্রাথমিক অবস্থায় পিতা পুত্রী এবং মাতা

পুত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন যৌন সম্ভোগ প্রচলিত ছিল। এমনকি ভ্রাতা ভগ্নির যৌন মিলনও বেদে উল্লেখিত আছে। উদাহরণস্বরূপ যম রাজা ও যমী রাণীর নাম করা যায়। বেদের সূত্র অনুযায়ী ভগ্নি যমী ভ্রাতা যমকে যৌন পিপাসা নিবৃত্তির জন্য আহ্বান করছেন:

কিং ভ্রাতা সদ্যদনা যং ভবাতি কিমুস্বসা
যন্নির্ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামভুতাবহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং
সং পি পৃদ্ধি॥
(ঋগ্বেদ ১০।১০।১১)

[ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও যদি ভগ্নি অনাথা হয় তবে সে কিসের ভ্রাতা? ভগ্নি থাকা সত্ত্বেও যদি ভ্রাতার দুঃখ মোচন না করতে পাবে তবে সে কিসের ভগ্নি? আমি কাম যন্ত্রণায় অস্থির হযে আবেদন করছি যে, তোমার তনু আমার তনুতে অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও।]

যাহোক, যম ও যমী পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। সেদিন থেকে একই গোত্রে বিবাহ রীতি রহিত হলো তার পর থেকেই ভ্রাতা ভগ্নির বিবাহ নিষিদ্ধ হযে গেল।

পিতা পুত্রীর যৌন সম্ভোগের চিত্রও বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে:

পিতা দুহিতুগর্ভমাধাৎ।
(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৩)
[পিতা কন্যার গর্ভ সঞ্চার করেন।]

অবশ্যি বেদের ব্যাখ্যাকারগণ এর ভিন্ন অর্থ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা এবং অন্তরীক্ষ দুহিতা। স্বর্গ এবং অন্ত-রীক্ষের মিলন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ঋগ্বেদের অন্যত্র উল্লেখিত আছে:
পুনস্তদা বৃহতি যৎ কনায়া দুহিতুরা অনুভূতমর্ববা।
(ঋগ্বেদ ১০।৬১।৫)

মধ্যা যৎ কর্ত্ত্বমভবদভীকে কামং কিণ্বানে পিতরি যুবত্যাং।
মনানগ্রেতো জহুতুর্বিয়ং তা সানো নিবক্তং সকৃতস্য যোনা।।
পিতা যৎস্বাং দুহিত রমমধিস্কণ ক্ষ্ময়া রেতঃ সং জন্মানো।
স্বাধ্যোহস্থ জনয়ন ব্রহ্ম দেবা বাস্তোস্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষণ।।

(ঋগ্বেদ ১০।৬১।৬-৭)

["পিতা নিজের রূপসী দুহিতার শরীরে শুক্রপাত করলেন। যখন পিতা যুবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে রতিলোলুপ হলেন তখন উভয়ের মধ্যে সঙ্গমজনিত ব্যাপার ঘটলো এবং পরস্পরের সঙ্গমের ফলে প্রচুর শুক্রপাত হলো। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হলো।

যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে শুক্রপাত করলেন। বুদ্ধিদীপ্ত দেবতারা তা থেকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোস্পতিকে নির্মাণ করলেন।"]

সৃষ্টির আদি পর্যায়ে আমরা পিতা কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নি ইত্যাদি কেন্দ্রিক যৌন সংসর্গের উল্লেখ লক্ষ্য করেছি। তখন ছিল মানব জাতির জন্তুদশা, অজ্ঞানাবস্থা অথবা অপরিপক্ক জ্ঞান। তদুপরি নারীজাতির স্বল্পতার জন্যও এরূপ ঘটনা বিচিত্র বা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানেও যেসব আদিম সমাজ অনুরূপ চর্চায় নিমগ্ন তারা যে এখনও প্রাচীন ধারায় আটকে আছে তাতে সন্দেহ নেই। তাদের মতে সৃষ্টির মূল যেখানে যৌন সম্ভোগ সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক গৌণ।

২৩

আদিম সমাজের ধারণায় চন্দ্র সর্প এবং নারী ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের পরস্পরেব মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন। যেহেতু নারীর সঙ্গে সপের যোগ আছে সেহেতু নারী ও সর্পের সঙ্গে চন্দ্রেরও নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে।

সর্পের সঙ্গে যে নারীর যোগ রয়েছে একথা বিশ্ববিশ্রুত এবং এর ইতিহাস সুপ্রাচীনকালের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীষ্টান ও মুসলিম মতে পৃথিবীর আদি মানব মানবী আদম ও ইভ বা হজরত আদম (আ:) এবং হজরত হাওয়া (আ:)-এর বেহেশত চ্যুতিও ঘটে সাপের প্ররোচনায়। বাইবেল ও পবিত্র কোরাণে বর্ণিত 'গন্দম' খাওয়ার ফলেই তাঁরা বেহেশতে বসবাসের অযোগ্য বলে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন; ফলে তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বসবাসের জন্য।

আদম (আ:)-কে 'গন্দম' খাওয়াবার মূলে সাপেরই ছিল একমাত্র ভূমিকা। মুসলমানগণ অবশ্যি এই সাপকে 'জিন' বলে চিত্রিত করেন। হজরত আদম (আ:) এবং হজরত হাওয়া (আ:)-এর বেহেশত চ্যুতির ফলশ্রুতিই হলো পৃথিবীতে মানব জাতির উদ্ভবের কারণ। এবং মানব জাতিব উদ্ভবের মূলেই হলো যৌন-সংসর্গ। কাজেই এ ব্যাপারে সর্পের ভূমিকা লক্ষ্য করবার মতো।

সর্প যে ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী এবং এর ফলে যে সে কখনো নারী কখনো পুরুষে রূপ লাভ করতে পারে এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও ইংগীত দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে সর্পের প্রাধান্য বর্তমান।

মহাভারতে বর্ণিত পাতাল পুরীর 'নাগারাজ্য' বা 'নাগানম আলয়ম' তারই উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

নাগ বংশ, সোম বংশ ইত্যাদির উদ্ভব যে সর্পকেন্দ্রিক তা রামায়ন মহাভারত ও জাতকের বিচিত্রধর্মী কাহিনীতে সুস্পষ্ট। তাছাড়া মানব-কুলের সঙ্গে সর্প কন্যার বৈবাহিক সম্পর্কের নজিরও পাওয়া যায় প্রচুর। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার অন্যতম বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুনের বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সর্পকন্যা উলুপীকে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এমনকি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশ' গ্রন্থেও মানব ও সর্পকুলের বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ কুমুদবতী নাম্নী যে রমনীর পাণিগ্রহণ করেন তিনিও নাগরাজ কুমুদের অনুজা ছিলেন।

কল্হন কৃত 'রাজতরঙ্গিনী'তেও অনুরূপ উল্লেখ বর্তমান। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ বিশাখা চন্দ্রলেখা নাম্নী যে রমনীর প্রেম পরিণয়ে আবদ্ধ হন তিনিও ছিলেন নাগরাজ সুশ্রবার কন্যা। বৌদ্ধধর্ম মতে 'বুড়িদত্ত জাতকের' কাহিনীতেও জানা যায় যে, কি করে এক বিধবা নাগ কন্যা বেনারসের এক বনবাস প্রাপ্ত রাজকুমারের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হন এবং তাদের মিলনে যে কন্যার জন্ম হয় তাঁকেই সর্পকুলমণী ধৃতরাষ্ট্র বিয়ে করেন।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্তর অবতারণা করা যায়। চীনা পরিব্রাজক হীউয়েন সাং সোয়াত উপত্যাকার উদ্দয়নের শাক্য বংশ সম্ভূত এক রাজ-কুমারের যে উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন তার অন্তরালেও সর্পকন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনীপুরের রাজা পাখাংবা কিংবা গরীব নওয়াজও সর্পবংশ সম্ভূত বলে জানা যায়। এমন কি ভারতের বাইরেও হিন্দু ভাবাপন্ন রাজবংশও যে সর্প থেকে উদ্ভূত এমন নজিরও ইতিহাসে আছে। উদাহরণস্বরূপ কাম্বোডিয়ার খের (Khmer) রাজ্যের সোমবংশের উল্লেখ করা যায়। সোমবংশের উদ্ভবও সর্প কেন্দ্রিক এবং চিত্তাকর্ষক কাহিনী আশ্রিত। কথিত আছে যে, কৌদিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ নাগকন্যা সোমকে বিবাহ করেন এবং সেই সোম-এর নামানুসারেই 'সোম' বংশের উৎপত্তি। এখানেই শেষ নয়। কাম্বোডিয়ার রাজাও যে অলৌকিক সর্প কন্যার প্রেমে নিমগ্ন ছিলেন সেটাও কাহিনী ভিত্তিক।

কাহিনীটি এইরূপ: সুরম্য রাজপ্রাসাদ। রাজ প্রাসাদের উপরে স্বর্ণখচিত কক্ষ। রাজা সেখানে ঘুমান। সবারই ধারণা সেখানে বাস করেন নয় মাথা বিশিষ্ট এক সর্প দেবী।....প্রত্যেক রাত্রেই তিনি নারীরূপে আবিভূর্তা হন। প্রথমে রাজা তাঁকে নিয়ে শয়ন করেন। এমন কি রাজার আসল স্ত্রীও সেখানে প্রবেশ করতে সাহস করেন না। রাত্রির শেষ পর্যায়ে সর্প নারী চলে গেলে রাজা তাঁর আসল স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করতে সমর্থ হন।......যদি এই সর্পকন্যা না আসেন তবে ধরে নিতে হবে যে, রাজার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। এ ভাবেই রাজা প্রত্যেক রাত্রিতে সেই সর্প কন্যার সঙ্গে কামলিপ্সা পরিতৃপ্ত করতেন।[১]

এসব তো গেল হিন্দু শাস্ত্র মতে সর্প সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। আদিবাসী সংস্কৃতির এক বিস্তৃত অংশ জুড়েও সর্পের ভূমিকা বর্তমান এবং তা যৌন সম্পর্ক থেকে মুক্ত নয়।

বাংলাদেশের আদিম সমাজ কেন, গ্রাম্য সংস্কৃতিতেও সর্প সম্পর্কিত নানা ধরনের গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন রাত্রি বেলা সর্প কর্তৃক গাভীর দুধ খাওয়া, নারীর স্তন পান ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এমনকি কোন কোন নারী সর্প সন্তান প্রসব করে এমন নজিরও যথেষ্ট রয়েছে।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে এবং টাঙ্গাইল জেলার ভণ্ডেশ্বর গ্রামে সর্প সন্তান প্রসবের কথা বেশ কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম। ১৯৭০ সালের দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) নামক দৈনিক পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় অনুরূপ একটা সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। যাহোক ভণ্ডেশ্বর গ্রামের ঘটনাটি ছিল চিত্তাকর্ষক। উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকার রৌহা গ্রামের বন্ধুবর কাজেম উদ্দীন আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এইরূপ:

এক মহিলা পর পর ছয়টি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সব শেষে তার গর্ভে জন্মলাভ করে এক সর্প। এই সর্প প্রসবের খবর মা ছাড়া আর কেউ জানতো না। গভীর রাত্রে সেই সর্পপুত্র এসে মায়ের দুধ পান করে চলে যেত।

দিনে দিনে ছেলেরা সব বড় হলো। সবাই বিয়ে শাদী করলো। সংসারের লোক সংখ্যা বেড়ে গেল বহুল পরিমাণে। একান্নবর্তী পরিবার-

ভুক্ত হয়ে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কাজেই পৃথক হওয়ার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বাবা মাও বাধা দিল না। সবাই একমত. পৃথক হবে।

নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম্য মাতব্বরদের ডাকা হলো। তাঁরা এলেন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব ভাগ করে দিতে। মাতব্বরগণ সবকিছু ছয় ভাগ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা যায় সাত ভাগ হয়ে আছে।

আশ্চর্য! কয়েকবার এরূপ করেও দেখা গেল একই অবস্থা, সাত ভাগ হয়ে আছে।

মাতব্বরগণ কোন প্রকারেই এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবং এ নিয়ে রীতিমত ভাবাচিন্তা শুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ ছেলেদের মা অন্দর মহল থেকে সভাস্থলে এসে বললো, 'আপনারা সাত ভাগ করেছেন, ঠিকই করেছেন। কেননা, আমার ছেলেরা ছয় ভাই নয়, ওদের আরও এক ভাই আছে। সে জঙ্গলে থাকে। 'এই বলেই মা ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্প ছেলে এসে হাজির হলো এবং একটি ভাগের উপর বসে রইলো।......

যাহোক সর্প যে নারীর স্তন কিংবা গাভীর দুধ পান করে এরূপ ঘটনা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রত্যক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়. রবার্ট ব্রিফল্ট উল্লেখ করেছেন যে, **'In Southern Italy it is a current saying that serpents make love to all women—a belief familiar from the most ancient times, for the fauns of primitive.......The Eskimos have stories of reptiles falling in love with women and of serpents caressing women clinging to their breasts. The North American Indians likewise have neumerous stories of serpents having connection with women and falling in love with then. Among the Dene, as among the Jews and Persians, tradition relates that first woman mated with a serpent'.**[২]

আদিবাসী ধারণায় সর্প এবং নারীজাতি যেমন সম্পর্কিত তেমনি চন্দ্রের সঙ্গে নারী ও সর্পও সম্পর্কিত। আদিম সমাজের মতে চন্দ্র সবচেয়ে শক্তিশালী দেব অথবা দেবী। চন্দ্রের গতি প্রকৃতিই নারী জাতির ঋতুবতী

হওয়ার কারণ। এমনকি সমুদ্রের জোয়ার ভাটাও চন্দ্রের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাজেই চন্দ্র, নারী ও সমুদ্র পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

কক্সবাজার অঞ্চলে জোয়ারের সময় সমুদ্রের ফেনা কুড়াতে দেখেছি স্ত্রীরোগের ঔষধের নিমিত্ত। তাছাড়া এতদ্‌ঞ্চলে গাভী ও ছাগীর পাল দেওয়ার সময় হলে 'জোয়ার' এসেছে বলে আখ্যায়িত করা হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, এসবও যে চন্দ্র কর্তৃক প্রভাবান্বিত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

চন্দ্র ও সর্পের সম্পর্কের অন্তরালে আরও কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা যায়। যেমন চন্দ্র প্রতিমাসে নবজন্ম লাভ করে। অনুরূপভাবে সর্পও খোলস পাল্টালে নবজন্ম প্রাপ্ত হয়। উভয়ই অমর। সর্প কেউ না মারলে তার মৃত্যু নেই এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্তও চন্দ্রের বিনাশ নেই। এবং এসব কারণেই গ্রীকগণ সর্পকে চন্দ্রের প্রতিভূ বলে বিশ্বাস করে।

এমন কি গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলেছেন যে, চান্দ্রমাসে যত দিন আছে ঠিক সাপের পাঁজরে ততগুলো হাড় আছে। ঠিক একই বিশ্বাসে আমেরিকার পউনি (**Pawnee**) আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করে যে সর্প হলো চন্দ্রের প্রজা।

উগাণ্ডার আদিম সমাজ অনুরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই প্রতি পূর্ণিমায় সর্প উৎসব প্রতিপালন করে। এমন কি হিন্দু সমাজেও যারা সর্প বংশোদ্ভব তাদেরকে 'চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাছাড়া ভারতের আর্য সমাজ কিংবা হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজ যেমন ভীল, ওরাওঁ, মুরিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে যে সর্প পূজার প্রচলন রয়েছে তাতেও চন্দ্রদেবী বা চন্দ্রদেব সম্পর্কযুক্ত।

ভারতের বাইরেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, হেলেনিক সংস্কৃতি ইত্যাদিতেও সর্প এবং চন্দ্রের নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। হেলেনিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য একটি দিক এই যে, আরতেমীস্ (**Artemis**), হেকাতে (**Hekate**), পারসিফোন (**Persephone**) প্রমুখ চন্দ্রদেবীগণ তাঁদের হস্তে সর্প ধারণ করেন। অনুরূপ ভাবে এরিং (**Erings**), গরগণ (**Gorgons**), গেরেইয়া (**Graia**) প্রমুখ চন্দ্রদেবীদের

চুলই হলো সর্পরাজি। এই কারণে মধ্য ইউরোপের আদিম সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত যে, ঋতুবতী মেয়েদের চুল যদি মাথা আঁচড়ানোর সময় পড়ে যায় তবে তা মাটিতে পুঁতে রাখলে সর্প হয়ে যাবে।[৩]

ব্রিটেন উপকথায়ও ডাইনীর চুল যে সর্পে পরিণত হতে পারে এরূপ উল্লেখিত আছে। চন্দ্র সর্প এবং নারী যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এর আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। চন্দ্রদেবী (The Moon Goddess) যে বৃষ্টি এবং জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করেন এটা সব আদিবাসীই বিশ্বাস করে। এই উপমহাদেশের আদিম সমাজ এমন কি হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক ছাড়াও পৃথিবীর অন্যত্রও বিভিন্ন সমাজে অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মেক্সিকোর আলগনকিন (Algonkin) আদিম সমাজের ধারণা যে, চন্দ্র এবং জলরাশি বা সমুদ্র একই। কেননা তারা মনে করে যে, চন্দ্রেও সর্পের আবাসভূমি বর্তমান এবং সমুদ্রও সর্পরাজির বাসস্থান। চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম সমাজও একই বিশ্বাস পোষণ করে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে চন্দ্র ও সর্প পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

অপর পক্ষে, সর্পের মাথার মণিরও উদ্ভব ঘটেছে চন্দ্র থেকে অর্থাৎ চন্দ্র কর্তৃকই এই মণি প্রদত্ত করেছে বলে হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজের ধারণা। মণিধারী সর্পের ফণাকে বলা হয় 'ভগ'। ডক্টর ভোগেলের মতে 'ভগ' এর দ্বিবিধ অর্থ—সর্পের ফণা এবং নারীর প্রজনন অঙ্গ (Snake's coil and Enjoyment.)[৪]

২৪

আদিম সমাজের যৌন জীবনে প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের (Love - Charm) প্রভাবও একেবারে উপেক্ষাব নয়। বাংলাদেশের সব আদিবাসীর মধ্যেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্ত্র প্রযোগেব রীতি লক্ষ্য করবার মতো। তবে আমরা এখানে প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের প্রতিই আলোকপাত করবার চেষ্টা করব।

প্রেম উত্তেজক মন্ত্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক যুবতীদেব মিলন অভিপ্সায় ব্যবহার কবা হয়। এ ব্যাপাবে ওঝার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক যুবতীদেব মধ্যে যুবকই সাধাবণতঃ অগ্রণী থাকে এবং ওঝাব নির্দেশ ক্রমে যুবক বিশেষ কতকগুলো নিয়ম পালন করে।

মন্ত্র প্রয়োগের বিষয়বস্তুর মধ্যে গাছের শিকড়, পাখিব পালক, মেয়েদের চুল ও নখ, গায়ের ময়লা, পরিধানের কাপড়ের আঁচল, কূপ বা স্রোতস্বতীর জল, ধুলো, ইঁদুরের মাটি, ঋতুস্রাবের ন্যাকড়া, তেল, বীর্য, ইত্যাদি প্রধান। এইসব বস্তুতে মন্ত্রপুত করে বিশেষ কতকগুলো নিয়মের মাধ্যমে দযিতাকে বশ করার ফলপ্রশ্রুতিই প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমাজে লক্ষ্য কবেছি যে, প্রেমে উন্মত্ত যুবক তার দায়িতার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেযে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে ওঝার কাছে গমন করে নিজের অভিপ্সা সিদ্ধির জন্য। ওঝা কি আর করবেন। তিনি যুবকের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে না পেলে যে যুবকের জীবন ব্যর্থ সেই ব্যর্থতার

সফলতা আনার জন্যই ওঝা উঠে পড়ে লেগে যান। ওঝা সূর্য ওঠার আগে নদীর ঘাটে নতুন মাটির পাত্র নিয়ে চলে যান এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাত্র ভর্তি করে জল তুলে তাতে মন্ত্র পূত করে যুবকের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে দয়িতার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন। সুখের কথা, যুবক তার প্রেম অভিযানে সফলকাম হয়। রাঙ্গামাটি সার্কেলের শিয়ালবুক্কা গ্রামের শ্রীহিরন্ময় চাকমার কাছ থেকে সংগৃহীত একটি প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের উল্লেখ করছি :

উঁ হুঙ্কার........
(দয়িতাব নাম) এর বাঁধম দশমীর দশ দুয়ার।
আঠার মোকাম ভিরম নিরাঞ্জন,
হুগুম করিবে কালিকা চন্দ্রিকা........

হিতে বাধম পিতে বাধম
বাধম চৌচালা
চক্ষেতে চক্ষু বাধম
বাধম যম রাজার পোলা।......

আকাশের ইন্দ্র বাধম
পাতালের বাধম উন কোটি নাগ
(যুবকের নাম) এরে ছাইড়্যা যদি
অন্য দিগে চাস
দোহাই লাগে মা কালীর মাথণা খাস।..........

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলের প্রখ্যাত গারো ওঝা শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকারকে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রেমাকাংখী যুবককে তার দয়িতার মাথার চুল, গায়ের ময়লা, নখের মাথা ইত্যাদি সংগ্রহ কবতে বলেন। এইসব জিনিস সংগৃহীত হলে তিনি সাতটা কিংবা পাঁচটা বড়শীর মাথা উক্ত জিনিস সমূহের সঙ্গে একত্র করে তাবিজের মধ্যে ভরে চুলোর পাড়ে কিংবা যে ঘবে দয়িতা শয়ন করে সেই ঘরের দরজার নীচে পুতে রাখতে নির্দেশ দেন। চুলোর পাড়ে রাখলে যুবকের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যুবতীর শরীরে জ্বালা ধরে যাবে। দরজার নীচে

পুতে রাখলে সেই দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় পুতে রাখা স্থানে পা পড়লে যুবককে ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারবে না।

রংপুর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজের ওঝাকে তেলের মধ্যে মন্ত্রপুত করে সেই তেল যুবকের চোখে মুখে মেখে যুবতীর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিতে লক্ষ্য করেছি। দেখা করার আগে যুবক কম পক্ষে তিন দিন স্নান করতে পারবে না। চুলে তেল লাগাতে পারবে না। এইসব নিয়ম পালন করার পর ওঝার পড়া তেল চোখে মুখে মেখে যুবক যুবতীর সঙ্গে দেখা করে চোখে চোখ রেখে নিজেও ওঝার শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্র কমপক্ষে তিনবার পড়বে:

এক.
দুই চক্ষে দেখিলাম,
চাইর চক্ষে বাধিলাম।
(অমুকের) করলাম নষ্ট,
ঘর ছাড় দুয়ার ছাড়
আমার অঙ্গে ভর কর
দোহাই মা কালী
আমার এই নজরবন্ধী যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা খসে
ভূমিস্থানে পড়ে।

দুই.
দুই চক্ষে দেখিলাম
চাইর চক্ষে বাধিলাম।
(অমুকের) করলাম নষ্ট
ঘর ছাড় দুয়ার ছাড়
আমার অঙ্গে ভর কর।
আমারে ছাইড়্যা যদি
অন্য কারে চাস
দোহাই তোর কার্তিকের গণেশের মাথা খাস।
নজরে নজর বন্দী
হিদে অঙ্গ জ্বলে,

আমাকে না দেখিলে
পাঁচ পরাণ জ্বলে।
হাত নড়ে পাও নড়ে
নড়ে মাথার কেশ,
আমাকে না দেখিলে
তনু হবে শেষ।
দোহাই মা কালী
আমার তেল পড়া যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা খসে
ভূমিস্থানে পড়ে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিম সমাজেই মন্ত্র প্রভাবে যুবতীদের বশীকরণ ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করার মত।

আসামের মিশমী, মিরি, লাখের, আওনাগা, লোহতা নাগা এবং রেংগমা নাগা প্রভৃতি আদিবাসী সমাজ পাখীর পালক সহযোগে নারী বশীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাছাড়া গাছের শিকড় এবং পাথরও বশীকরণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পাথরে মন্ত্রপূত করে শুধু নারী বশীকরণই সম্ভব নয়, এতে সৌভাগ্যও আনয়ন করা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করে।

পাথরের চেয়ে সাপের মণি আরও কার্যকরী বলে রেংগমা নাগাদের ধারণা। যদি সাপের মণিতে মন্ত্রপূত করে তা তামাক পাতা কিংবা রসুনের মধ্যে রাখা হয় এবং বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে তামাক পাতা অথবা রসুন প্রেমাকাংখী যুবতীর গায়ে স্পর্শ করানো যায় তবে সেই যুবতী প্রেম উন্মত্ত যুবককে ছাড়া বাঁচবে না। আর যদি সেই পাতা বা রসুন যুবতী খেয়ে ফেলে তবে তার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা।[১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ থার্সটন দক্ষিণ ভারতের পানিযান **(Paniyan)** সম্প্রদায়ের মধ্যে বশীকরণ মন্ত্রের যে রীতি লক্ষ্য করেছেন তা অত্যন্ত মারাত্মক। সেখানে মন্ত্র প্রভাবে পুরুষ কুকুর বা ষাঁড়ে রূপলাভ করে কিন্তু নারীর সান্নিধ্যে লাভের পর সেই নারী মৃত্যুবরণ করে।

ঘটনাটি এইরূপ: কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর প্রেমে উন্মত্ত হয় তবে সে বাঁশের চোংগায় মন্ত্রপুত করে গভীর রাত্রে সেই নারীর বাসগৃহের চারপার্শ্বে তিনবার ঘূর্ণন করে। ফলে যুবতী বাইরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু আশ্চর্য! যুবতী বাইরে এসে দেখে যে সেখানে মানুষ নেই-- সেখানে রয়েছে ষাঁড় অথবা কুকুর। সেই ষাঁড় বা কুকুর যুবতীর সঙ্গে মনের বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াস পেলেই যুবতী ভয়ে মৃত্যু বরণ করে।[২]

ভেরিয়ার এলুইন মধ্য প্রদেশের গঁড় আদিম সমাজের বশীকরণ ব্যবস্থার যে উল্লেখ করেছেন তাও বেশ কষ্টসাধ্য এবং বিপদজ্জনক। কোনও ধনী বা শিক্ষিতলোকের মৃত্যু ঘটলে রবিবার রাত্রে তার কবরের পাশে পাঁচবার ঘুরতে হবে। অতঃপর সেই কবরস্থ মৃত ব্যক্তির বুকের কাছ থেকে মাটি এনে জ্বলন্ত বাতির উপর স্থাপন করতে হবে। তৎক্ষণাৎ একদল প্রেতাত্মা চলে আসবে সেই মাটি চুরি করে নিতে। তখন ভয় পেলে মৃত্যু অনিবার্য। সাহসের সঙ্গে তাদের প্রতিহত করতে হবে। অতঃপর তারা চলে গেলে সেই মাটির কিছু অংশ তেল মিশ্রিত করে আকাংক্ষিত যুবতীর গায়ে ছিটিয়ে দিলে সেই যুবতী বশ হবে।[৩]

বাংলাদেশের দিনাজপুর অঞ্চলে সাঁওতালদের কাছ থেকে যে নারী বশীকরণ ব্যবস্থার নিয়ম সংগ্রহ করেছিলাম তার সঙ্গে ভারতের মধ্য প্রদেশের গঁড় আদিম সমাজের কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। সে সামঞ্জস্য শুধু প্রেতাত্মার ভয়ের ব্যাপারে। শনিবার কিংবা মঙ্গলবারে চামচিকে মেরে তা পুতে রাখতে হবে মাটির নীচে। তিনদিন পর সেই পচা চামচিকে ধুতে হবে স্রোতবতী কোনও নদীতে। নদীর জলে চামচিকের পচা মাংস ধুয়ে শুধু চামচিকের হাড় রাখতে হবে। এই হাড়ই আসল। এতে মন্ত্রপুত করে গভীর রাত্রে যেতে হবে প্রেমাকাংখী যুবতীর বাড়ীতে তা রেখে আসতে। গভীর রাত্রে যাওয়ার সময় তার পেছন থেকে ডাকতে থাকবে অগণিত প্রোতাত্মা। ডাক শুনে যদি যুবক পেছন ফিরে তাকায় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। ডাক উপেক্ষা করে যদি সে নির্ভয়ে যেতে পারে তবে সে যে সফলকাম হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।........

বশীকরণ মন্ত্রের অন্তরালে যা সবচেয়ে ক্রিয়াশীল তা হলো এই যে, মন্ত্রপ্রভাবে যুবক এমন শক্তি অর্জন করবে যে শক্তি তাকে সুন্দর, সুঠাম

এবং মায়াময় করে গড়ে তুলবে এবং সেইসব গুণাবলী যুবতীর অন্তরাত্মায় স্থানান্তরিত করতে পারলেই যুবতীর চোখে সে মায়াময় যুবক বলে প্রতিভাত হবে এবং এটাই সফলকাম হওয়ার প্রধান অবলম্বন।

অষ্ট্রেলিয়ার অরুণতা (Arunta) আদিম সমাজভুক্ত যুবকদের বশীকরণ মন্ত্র লক্ষ্য করলেই উপরিউক্ত মন্তব্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে। অরুণতা যুবক মন্ত্রপুত করে যে কড়ির মালা গলায় ব্যবহার করে কিংবা মাথায় যে পাখীর পালকের মুকুট পরিধান করে তা যুবতীর চোখে সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হয় এবং 'তার অন্তরাত্মা ভাবাবেগে মুগ্ধ হয়' ('her inwards shake with emotion')।[৪] ফলে যুবতীর পাণিগ্রহণ করা যুবকের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য বলে প্রতীয়মান হয় না।

সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের ম্যাকিসার (Makisar) সম্প্রদায় মেয়েদের পদাঙ্কের ধুলিতে মন্ত্রপুত করে তাদের বশীভূত করার প্রয়াস পায়। একই অঞ্চলের অন্যান্য আদিম সমাজে পান গুপারীতে মন্ত্রপুত করে যুবক কিংবা যুবতীকে বাধ্য করার নিয়ম প্রচলিত।[৫]

ম্যাকিসার সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের চাকমা, খাসীয়া ও টিপরা উপজাতীদের মিল লক্ষিত হয়। কেননা এসব সমাজও পানগুপারীতে মন্ত্র প্রয়োগ করে নারী বশীভূত করার প্রয়াস পায়। সাঁওতালদের মধ্যে কিন্তু নারী বশীভূত করার মাধ্যমে হিসেবে ফুলের আশ্রয় নেওয়া হয়।

সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের টেনিমবার অঞ্চলে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায়। এই অঞ্চলের আদিম সমাজ মেয়েদের বাধ্য করার প্রয়াসে মরিচ-চূর্ণ ইত্যাদিতে মন্ত্রপুত করে প্রস্রাবখানায় পুতে রেখে আসে। তাদের বিশ্বাস এতে মন্ত্রপুতকারী যুবকের সঙ্গে যুবতী উন্মত্ত প্রেমে আবদ্ধ হবে।[৬]

কেন বা কি কারণে যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রেম-উত্তেজক মন্ত্রের আশ্রয় নেয়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা চলে একজন যখন আর একজনকে না পেলে জীবন নিরর্থক মনে করে তখনই প্রেম-উত্তেজক মন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রশ্নটির সুন্দর জবাব খুঁজে পাওয়া যায় প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ জে. বেদিয়ারের মন্তব্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন:...... **Love pressed them hard, as thirst presses the dying stag to the stream, love dropped upon them from high heaven, as a hawk**

slipped after long hunger falls right upon the bird. And love will not be hidden....But in every hour and place every man could see love terrible, that rode them, and could see in these lovers their every sense over flowing in the vat.'[৭]

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশের মগ উপজাতীয় সমাজে তামাক পাতা এবং চুরুটে মন্ত্রপূত করে নারী বশীভূত করার প্রচলন আছে। প্রায় একই ধরনের নিয়ম লক্ষ্য করা যায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জের বুকা (Buka) আদিম সমাজের মধ্যে। বুকা সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক যদি কোনোও নারীর প্রতি আসক্ত হয় তবে তাকে বশীভূত করার জন্য এক প্রকারের গাছের ছাল (rarakot) এবং এক প্রকারের চূর্ণ (sisiwa) প্রয়োজন। এই দুই বস্তু ভালো করে মিশিয়ে তামাকের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। অতঃপর সেই তামাক দিতে হয় সেই মেয়েকে। এখানেই শেষ নয়। কিছু চূর্ণ জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে সেই মেয়েকে স্মরণ করতে হবে। ওদিকে মেয়েটি তামাক পান করতে থাকবে এবং এদিকে জলন্ত আগুনে বিশেষ চূর্ণ গরম হতে থাকলে মেয়েটি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত উন্মত্ত হয়ে প্রেমিকের কাছে ছুটে আসবে। তখন তাকে যা খুশী তাই করা যাবে এবং শেষ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হলে সেই বিশেষ চূর্ণ পানিতে ফেলে দিলেই মেয়েটির ক্ষিপ্রতা কমে যাকে। এই বিশেষ চূর্ণ (sisiwa)-এর দ্রব্যগুণ খুবই প্রবল।[৮]

বৃক্ষ বা বৃক্ষের শাখার (অবশ্যি যাদুগুণ সম্পন্ন বিশেষ বৃক্ষ) প্রভাবে সর্প বশীভূত করার রীতি বাংলাদেশ এবং আসামের সর্বত্র প্রচলিত। সর্প ও নারীতে যে নিবিড় যোগ রয়েছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই নারী বশীভূত করার মাধ্যম হিসেবে বৃক্ষ বা বৃক্ষের শাখাও বিশেষ কার্যকরী। বাংলাদেশের লুসাই-কুকী সমাজ এ ব্যাপারে বিশেষ বৃক্ষ-শাখা ব্যবহার করে। একই নিয়ম-পদ্ধতি ব্যবহার করে পশ্চিম প্যাসিফিক অঞ্চলের দোবো (Dobu) আদিম সমাজ। তাদের অঞ্চলের কোইওয়াগা (koiwaga) নামক এক প্রকারের সুগন্ধী কষযুক্ত বৃক্ষ শাখায় মন্ত্রপূত করে কাংক্ষিত নারীকে ঘ্রাণ নিতে দিলেই সে বশীভূত হয়। দোবো লোক কাহিনীতে জানা যায় যে, 'কোইওয়াগা' বৃক্ষ জন্ম-গ্রহণ করে মৃত ব্যক্তিদের কবরের পাশে। এই বৃক্ষ নাকি এককালে

মেয়ে ছিল এবং সুগন্ধী যুক্ত কষ সেই মেয়ের কান্নার প্রতীক। সেই মেয়ে তার পাষাণ হৃদয় প্রেমিককে না পেয়ে আর্তনাদ করে মারা যায়। এবং পরবর্তী সময়ে বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এটা যাদুগুণ সম্পন্ন বৃক্ষ। উভয়পক্ষই অর্থাৎ ছেলে মেয়ে উভযেই তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার অভিলাষে 'কোইওয়াগা' বৃক্ষের আশ্রয় নেয়।[৯]

প্রেম-উত্তেজক মন্ত্র ব্যবহার দোবো আদিম সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সংসারের যাবতীয় কাজে সফলতা অর্জনের জন্য তারা মন্ত্রের আশ্রয় নেয়। পুরুষগণ মেয়েদের উপর মন্ত্রপ্রয়োগ করে, অপর পক্ষে মেয়েরাও পুরুষ বশীভূত করতে মন্ত্রের উপর নিভর করে। দোবোদের সম্পর্কে বি. ব্ল্যাকউডের মন্তব্য খুবই অর্থবহ: 'Men and women mate only because men are constanty exerting magical power over women and women over men...A man without love magic is not a real man only half a man.'[১০]

মেয়েরা যে ছেলেদের উপর তুকতাক, ম্যাজিক বা মন্ত্র প্রয়োগ করে এরূপ রীতি বাংলাদেশের আদিম সমাজ ও গ্রাম্য সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার চেরোকী (Cherokee) সমাজের মেযেরা ছেলেদের বশীভূত করার জন্য ঋতুস্রাবের রক্ত মন্ত্রপুত করে ছেলেদের চুলে মেখে দেয়। এতে তারা বশ হয়ে বলে বিশ্বাস।[১১]

বাংলাদেশের আদিম সমাজ এমনকি গ্রাম্য লোকেরা বিশ্বাস করে যে সর্প-সঙ্গম কালে কেউ যদি কাপড় বিছিয়ে দিতে পারে এবং সর্প যদি সেই কাপড়ের উপর সঙ্গম-ক্রিয়া করে তবে সেই কাপড় দিয়ে অনেক ফল লাভ হয়। এমনকি নারী বশীভূত করাও চলে। ব্যাপারটি খুবই বিপদজনক। কেননা, সাপে কামড়ে দেবার ভয় আছে। তবে শোনা যায়, এই সময় সাপ নাকি সাধারণতঃ কামড় দেয় না। এবং অনেকে যে এই কাজে সফলতা অর্জন করে এরূপ নজিরও অনেক রয়েছে। সাপের বীর্যস্খলন সম্পৃক্ত কাপড় যাদুগুণ সম্পন্ন বলে সবার ধারণা।

প্রায় একই ধরণের বিশ্বাস মধ্য সুমাত্রার আদিম সমাজে বদ্ধমূল। তাদের মতে সাপের বীর্য নয়, হাতীর বীর্য অত্যধিক যাদুগুণ সম্পন্ন বস্তু। হাতীর সঙ্গম কালে যদি তারা কোনো প্রকারে হাতীর বীর্য সংগ্রহ করতে পারে তবে অসাধ্য সাধন করতে পারে। মেয়ে বশীভূত তো দূরের কথা;

তবে এ ব্যাপারেও ভয়ের কারণ আছে। হাতী যদি কোনো প্রকারে টের পায় তবে রক্ষে নেই।[১২] উল্লেখযোগ্য যে, হাতী যদি বুঝতে পারে যে, তার সঙ্গমক্রিয়া কেউ দেখেছে তবে তার রক্ষে নেই। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে হাতীর সঙ্গম দেখতে গিয়ে কতজন যে মৃত্যুবরণ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাংলাদেশের গ্রামীন সংস্কৃতিতেও অনুরূপ রীতি লক্ষ্য করা যায়। এসব আদিবাসী প্রভাব না হিন্দু প্রভাব তা অবশ্যি গবেষণা সাপেক্ষ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দুশাস্ত্র যেমন 'বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ', 'কথা সরিৎসাগর', 'ঋগ্বেদ' ইত্যাদিতেও নারী বশীকরণ ব্যবস্থা ও মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাজেই এসবের ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের।

বর্তমান কালের প্রেমোন্মত্ত এবং সংসার বিরাগী যুবকদের মতো তৎকালেও রূপসী কুমারীর তনুশ্রীতে মুগ্ধ হয়ে যুবকগণ মন্ত্রের আশ্রয় নিত। 'বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে বর্ণিত চতুর্থ ব্রাহ্মণের কাহিনী তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। 'কথা সরিৎ সাগরে' উল্লেখিত আছে যে রাজা বাৎসও মন্ত্র প্রভাবে রূপসী কুমারী বাসবদত্তের অন্তর জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বৈদিক সমাজেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে অনেক জায়গায়। রূপসী কুমারী নারীর প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রেমে অন্ধ যুবক শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন বশীকরণ মন্ত্রের। যুবক তখন তাঁর প্রেমিকার বাসগৃহের সম্মুখে গিয়ে মন্ত্র উচচারণ করেছেন :

> সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ।
> সসংতু সর্বে জ্ঞাতয়: সস্তয়মভিতো জনঃ।।

[ঋগ্বেদ : ৭।৫৫।৫]

"যেমন গাভী বৎসরের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্ন পথে ধাবিত হয়, তোমার মন যেন তেমনি আমার প্রতি ধাবিত হয়। তোমার মাতা নিদ্রা যান, পিতা নিদ্রা যান, কুকুর নিদ্রা যাক, বিশপতি নিদ্রা যান, জ্ঞাতিরা নিদ্রা যান, চারদিকে জনগণও নিদ্রা যাক।"

[অনুবাদ : মনোরঞ্জন রায়]

প্রেমোন্মত্ত যুবক শুধু রূপসী কুমারীকেই বশীভূত করার চেষ্টা করে নি, সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে মন্ত্রপ্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে নিজের মনের বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে।

বলা যায় যে, মন্ত্র প্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে স্বার্থসিদ্ধির উদাহরণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট রয়েছে। কালু ডোম ও লক্ষার কাহিনী তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। মা কালীর প্রভাবান্বিত ইন্দ্রের মন্ত্রবলে সমস্ত মৈনা রাজ্যের সবাই কিরূপ ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে নরসিংহ বসুর কাব্যে তার চিত্র কি সুন্দর আকার ধারণ করেছে:

মন্ত্র পইড়্যা মাটি ছড়াইল চারি পানে।
ধরিল অঘোর ঘুম সবার লোচনে॥
কুমার ঢলিয়া পড়ে পিঠে ছিল হাঁড়ি।
ধূলায় ধূসর তার ভগ্নি কাঁচা রাড়ী॥
জয়া বুড়ি বাত্যে জাগে বসেছে কাটনে।
ধরিল পুটল্যা ঘুম তাহার লোচনে॥
ঢলে পড়ে হাতে করি চরখায় কাটি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় কামড়ায় মাটি॥
উননে ছুতোর বুড়ি দিতেছিল ফুক।
ভূমে ঢল্যা পড়িল আখায় দিয়া মুখ॥
রান্ধুনী রন্ধন শালে ঘুমেতে অজ্ঞান।
পার্শ্বে গড়াগড়ি যায় শালা দশ বান॥
যুবতী যুবক সঙ্গে ঘেষাঘেষী গা।
নিদ্রা যায় স্বামীর গায়েতে ফেলে পা॥
বোঝারি মাথায় বোঝা পথে যায় চল্যা।
ইন্দার নিন্দাটি ধরি গড়ায়ে পরল্যা॥
হাটারি বাজারি দেশে ছিল যত জন।
দোকান রহিল পড়ি ঘুমে অচেতন॥

যাহোক, প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের প্রভাব যে শুধু আদিম সমাজেই রয়েছে তাই নয়; বাংলাদেশের জনজীবনও যে তা থেকে মুক্ত নয় উপরের আলোচনায় তা স্পষ্ট।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিম সমাজের প্রবীণদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, এই বশীকরণ ব্যবস্থায় যুবক যুবতীর মিলন অজ্ঞাতসারেই সাধন করা হয়। তাছাড়া বশীকরণ ব্যবস্থার বিবাহ রীতির অন্তরালে সংস্কারবদ্ধ ধারণাও নিহিত রয়েছে। সংস্কারাবদ্ধ ধারণা এই যে, এ ধরনের মিলনের ফলশ্রুতিতে যে সব সন্তানের জন্ম হয় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করে। এমনকি স্ত্রীরও অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা। এতোসব সত্বেও আদিম সমাজে এখনও প্রেম উত্তেজক মন্ত্রের প্রভাব বর্তমান। এর একমাত্র কারণ কুমারী কন্যার দেহশ্রীর মায়া যুবককে অন্ধত্বের সীমায় উপনীত করে।

২৫

আদিম সমাজের যৌন জীবনের চিন্তা জগতে এমন একটি দেশের অস্তিত্ব বর্তমান যেখানে কেবল নারীসমাজই বসবাস করে। সে এক মায়া-রাজ্য—মায়াবিনী নারীরাই তার অধিবাসী। তাদের একমাত্র পেশা ম্যাজিক বিদ্যা এবং এই ম্যাজিকের প্রভাবে কোনোও পুরুষ যদি সেখানে গমন করে তবে তাকে ভেড়া বানিয়ে রাখে—সে আর দেশে ফিরে আসতে পারে না।

এখন এই মায়ারাজ্যের অবস্থান কোথায় সেটা অবশ্যি গবেষণা সাপেক্ষ। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার গারো, হাজং ইত্যাদি আদিবাসী-দের জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি যে, এই 'মায়ারাজ্য' আসামের কামরূপ কামাখ্যায় অবস্থিত। শুধু গারো-হাজং কেন ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের গ্রাম্য জনসাধারণও একই ধারণা পোষণ করে। তাদের মতে কামরূপ কামাখ্যা যাদুর দেশ এবং সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী—সেখানে পুরুষ গেলে তাদের মায়াজালের ব্যূহ ভেদ করে কোনো পুরুষই আর ফিরে আসতে পারে না।

ঘটনাক্রমে একবার কামরূপ-কামাখ্যা যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও এমন কোন মায়ারাজ্যের সন্ধান সেখানে পাইনি। পেয়ে-ছিলাম কামাখ্যা মন্দিরে অবস্থানকারী ঠাকুর, দেবদাস প্রমুখের অনাবিল স্নেহ যত্ন যা সত্যিই ম্যাজিকের মতোই আমাদের আকর্ষণ করেছিল।

কুমিল্লার গ্রাম্য জনসাধারণের কল্পনায়ও এমন একটি দেশের অস্তিত্ব বর্তমান। কুমিল্লায় একটি প্রবাদ আছে, 'যে যায় পানাম সে আসে না

আনাম।' অর্থাৎ 'পানাম' নামক স্থানে গেলে সে আর 'আনাম' মানে 'পূর্ণ' অবস্থায় ফিরে আসতে পাবে না।

এখন এই 'পানাম' অঞ্চলের অবস্থিতি কোথায় কেউ আজ পর্যন্ত তা স্থির করতে পাবে নি। কল্পনার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাবা বলতে চায় যে, এই অঞ্চল পার্বত্য ত্রিপুরার আরণ্য ভূমিতে অবস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, টিপরা প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণায় এই মায়াবাজ্য' লুসাই পাহাড়ের গহীন অরণ্যে অবস্থিত। লুসাই ও কুকী সমাজেব ধাবণা যে তাদের স্বর্গরাজ্য 'মিথিখুআ'-এর কাছাকাছি অনুরূপ একটি বাজ্য অবস্থিত এবং সেখানে নাবীদেরই প্রাধান্য। কোনো পুরুষ সেখানে যেতে পারে না। যদি বা কোন পুরুষ ব্যক্তি কৌশলে সেখানে গমন কবে তবে সে আর ফিরে আসতে পারে না। সেখানকার অধিবাসী নাবীদের একমাত্র পেশা যাদু বিদ্যা।

সাঁওতাল বিশ্বাসেও অনুরূপ একটি রাজ্যের অস্তিত্ব বর্তমান। তাদের মতে মহান গুরু কমরুব দেশ এই মায়ারাজ্য। সুতরাং এটা কমরু-দেশ নামে খ্যাত। ফাদাব পি. ও. বোডিংও আসামের কামরূপকে কমরু-দেশ বলে ধাবণা কবেছেন। তাঁব মতে, 'কমরু-দেশ আজব শক্তিসম্পন্ন আজব মানুষেব বাস স্থান। তাবা মন্ত্র প্রভাবে পুরুষ জাতিকে মুহূর্তে কুকুর গরু ভেড়া ছাগল ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করতে পাবে।........এখানকার অধিবাসী সবাই নাবী; তাবা ভয়ঙ্কররূপিনী এবং অসম্ভব শক্তির অধিকারিণী।....'

বোডিং সাহেব আবও উল্লেখ করেছেন যে, 'একবার এক সাঁওতাল যুবক কমরু-দেশে গমন কবেছিল। সেখানকার মহিলারা তাকে পাঁচ বছর আটকিয়ে বাখে। এই অন্তবীণ কালে দিনের বেলা সেই যুবককে বাঁশের খাঁচায় পুবে বাখা হতো এবং রাত্রি বেলায় তাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। একবাব তাকে মন্ত্রবলে চিলে রূপান্তবিত কবা হয় এবং সেই সুযোগে সে নিজ দেশে উড়ে আসতে সমর্থ হয়, এবং নিজের যাদুবিদ্যা বলেই পরবর্তী সময়ে মনুষ্যরূপ ধারণ করতে তার পক্ষে কষ্টকর হয়নি।'

বোডিং সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত আরও একটি সাঁওতাল কাহিনীতে জানা যায় যে, একবাব এক শকুন এক সাঁওতাল শিশুকে কমরু-দেশে নিয়ে ফেলে দেয়। সেখানে সে আস্তে আস্তে বড়ো হয় এবং পরবর্তী কালে সেখানকার এক নারীর সঙ্গেই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।

সে পালিয়ে আসবার বহু চেষ্টা করে কিন্তু যতবারই সে পালাবার চেষ্টা করে ততবারই দেখে যে সে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল ঠিক সেখানে গিয়েই আবার হাজির হয়েছে। পরিশেষে এক বৃদ্ধ রমণী বললো যে, সে সেই দেশের কোন কিছু সঙ্গে রাখলে কোনক্রমেই সে পালাতে পারবে না। অতএব, সবকিছু পরিহার করে অবশেষে সে পালাতে সমর্থ হয়েছিল।[১]

আসামের আংগামী নাগারাও বিশ্বাস করে যে পশ্চিম অঞ্চলে এমন একটি দেশ অবস্থিত যেখানে কেবল নারীরাই বসবাস করছে। তিন চার গ্রাম মিলে একজন পুরুষ পাওয়া যায় এবং সেখানে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে গরম জল ঢেলে মেরে ফেলা হয়।

এমনকি উল্লেখিত আছে যে, যদি ভুলক্রমে কিংবা কৌশলে কোন পুরুষ সেখানে যায় তবে তাকে নিয়ে নারীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। ডক্টর হাটন উল্লেখ করেছেন যে, তাদের গর্ভ সঞ্চারের জন্য কোন পুরুষের দরকার হয় না। ভীমরুলের কামড়জনিত ব্যাপার থেকেই নাকি সেখানকার নারী সমাজ গর্ভ ধারণ করে বলে তাদের বিশ্বাস।[২]

ভারতের মধ্য প্রদেশের গঁড়, বৈগা, আগারিয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণা এই 'মায়ারাজ্য' বাংলাদেশে অবস্থিত।

তাদের মতে বাংলাদেশে 'বড় ভাটি বাংলা' নামে এমন এক অদ্ভুত অঞ্চল আছে, যেখানে কেবল নারীদেরই প্রাধান্য এবং তাদের একমাত্র পেশা যাদুবিদ্যা। যাদুর প্রভাবে তারা মানুষকে কুকুর বিড়ালে পরিণত করতে পারে। এবং তাদের মায়াজাল ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। তাদেরকে পরাভূত করতে হলে যাদুবিদ্যায় তাদের চেয়েও পারদর্শী হতে হবে। নইলে পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী।

শুধু এই উপমহাদেশে কেন পৃথিবীর অন্যত্রও 'মায়ারাজ্য' (**The Land of Women**)-এর অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। হীউয়েন সাং, মারকো পোলো প্রমুখ বিশ্ব পরিব্রাজকদের বর্ণনায়ও অনুরূপ দেশের অস্তিত্ব বর্তমান।

হীউয়েন সাং পো-লো-হিহ্-মো-পো-লো অথবা **The Coutry of Eastern Women** নামে যে দেশের উল্লেখ করেছেন সেখানেও নারীর প্রাধান্য বর্তমান এবং তা পুরুষ বিবর্জিত দেশ।[৩]

ডক্টর বি. ম্যালিনৌস্কী তাঁর 'The Sexual Life of Savages' গ্রন্থে **The Erotic Paradise of the Trobrianders** শিরোনামায় যে কল্প-রাজ্যের উল্লেখ করেছেন তাও মায়ারাজ্যের ইংগীত বহন করে।

তাছাড়া আমাজান, ব্রাজিল, নিউগিনি প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের ধারণায়ও পুরুষ বিবর্জিত দেশের উল্লেখ রয়েছে।[৪]

'মায়ারাজ্য' বা রমণীয় দেশ-এর ইতিহাস সুপ্রাচীনকালের। মহাভারত, মৎস্য পুরান, বিষ্ণু পুরান ইত্যাদি হিন্দু পৌরাণিক শাস্ত্রেও অনুরূপ দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মুহূর্তে যে অশ্বকে মুক্ত করা হয় সে অশ্ব যখন সেই রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানেও ছিল কেবল রমণীগণ এবং তাদের রাণী ছিলেন পারমিতা। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যখন এই দেশে আগমন করেন তখন নারীর হাতেই প্রথম বারের মত তিনি পরাজয় স্বীকার করেন এবং পরিশেষে তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের রাণীকে বিয়ে করে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন।

'মৎস্য পুরানে'র আখ্যান বস্তুতেও জানা যায় যে, শিব এবং পার্বতী রাসলীলা উপভোগ করার জন্য এমন এক স্থানে উপনীত হন যেখানে ছিল কেবল নারী আর নারী। তাছাড়া সেখানে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ শোভিত এক মায়াময় বাগান তাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট করেছিল। বৃক্ষের ছিল আশ্চর্য যাদুগুণ। যে কোন পুরুষ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতেই তারা নারীতে রূপান্তরিত হতো। মৎস্য পুরানে বর্ণিত রাজা ইলার ভাগ্যেও নারীতে রূপলাভ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

যাহোক, মায়ারাজ্য বা রমণীদের দেশ-এর অবস্থিতি কোথায় এ সম্পর্কে কেউই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তবে আদিম সমাজ ও গ্রামীন জনসাধারণের কল্পনায় যে এমন দেশের অস্তিত্ব বর্তমান তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

আদিম সমাজের যৌন জীবন যে কতটা প্রাধান্যের দাবীদার এসব কল্পনা প্রসূত ধারণা তা সপ্রমাণ করে। মায়ারাজ্য বা রমণীদের দেশ আদিম সমাজের যৌন জীবনের বিস্তৃতির এক ইংগীতপূর্ণ দিক। কেননা, পুরুষ ব্যক্তিরা 'রমণীদের দেশে' গমন করে শুধু নারী সান্নিধ্য লাভেই সমর্থ হয় না—সেখান থেকে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ফিরে এসে দেশের যুবক যুবতীদের মিলনেও ওঝার ভূমিকা পালন করে যাদবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখায়।

২৬

আদিম সমাজের যৌন জীবনের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক নারী ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গ (Genital organ) কেন্দ্রিক ধারণা। শুধু আদিম সমাজ কেন পৃথিবীর সভ্য সমাজেও উভয় প্রজনন অঙ্গের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, উভয়েই বংশোদ্ভবের মূল উৎস এবং সৃজনশীল শক্তির একমাত্র আধার।

মনুষ্যজগত ছেড়ে প্রাণী জগতেও লিঙ্গ ও যোনীর প্রাধান্য সমানভাবেই প্রযোজ্য। এবং এই কারণেই আদিম সমাজ এই দুটো বস্তুক বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং কোন কোন আদিম সমাজ এসবের পূজাও করে।

এমনকি কোন কোন আদিম সমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রজনন অঙ্গ স্পর্শ করে শপথ করতেও দেখা যায়। আফ্রিকার জুলু. কাফির, মাসাই, ইত্যাদি আদিম সমাজ তার উল্লেখযোগ্য প্রামাণ।

হিন্দু সমাজে প্রজনন অঙ্গের পূজা পদ্ধতির ইতিহাস সুপ্রাচীনকালের। মহাভারতের আখ্যান বস্তুতে জানা যায় যে, শিব ও পার্বতী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন করলে তাঁদের মৃত্যু ঘটে এবং যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনীর অবতার হিসেবে পৃথিবীতে তাঁরা পুনঃর্জন্মলাভ করেন। কাজেই হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে লিঙ্গ ও যোনীর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা উপরিউক্ত মন্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট।

হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজ যেমন হাজং, দালুই, হদি, রাজবংশী, টিপরা, মুরিয়া, গোন্দ, গঁড় প্রভৃতিদের মধ্যেও লিঙ্গ পূজার প্রচলন দৃষ্টিগোচর

হয়। ভারতের মধ্য প্রদেশের মুরিয়াদের শক্তির দেবতা লিঙ্গু আসলে পেন লিঙ্গ নাম অনুসারেই পরিচিত। মুরিয়াদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে লিঙ্গু পেনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এক কথায় তাঁকে সৃষ্টির আধার বলে ধারণা করা হয়।

যাহোক পুরুষ প্রজনন অঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার সম্পর্কিত বিচিত্র ধরনের কাহিনীর অবতারণা অনেক নৃতত্ত্ববিদই করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিম সমাজ থেকে প্রজনন অঙ্গ সম্পর্কিত যে সব কাহিনী সংগ্রহ করেছিলাম তা লিপিবদ্ধ করা অবান্তর মনে করে এখানে বিরত রইলাম। কেননা, হ্যাভলুক এলিস[১], ম্যাকক্রিণ্ডল[২], মারগারেট মীড[৩], আর্চার[৪], মিল্‌স[৫], ভেরিয়ার এলুইন[৬], গোরার[৭] প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ সমগ্র পৃথিবীর আদিম সমাজ থেকে লিঙ্গ সম্পর্কিত যে সব কাহিনীর উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের আদিম সমাজে প্রচলিত কাহিনী সমূহের সঙ্গে সে সবের বিষয়বস্তুতে হুবহু মিল লক্ষিত হয়, কেবল বর্ণনাভঙ্গিতে কোথাও কোথাও সামান্য তফাৎ নজরে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলের পিলাচালা গ্রামের শ্রীঅমল বর্মণের কাছ থেকে সংগৃহীত গারো সমাজে প্রচলিত কাহিনীটির উল্লেখ করা যায়। তাদের মতে প্রাচীন কালে পুরুষদের প্রজনন অঙ্গ ছিল খুব দীর্ঘ। ফলে, এর দ্বারা গাছ থেকে আম ইত্যাদি পেড়ে খাওয়া যেত। এমন কি এর অগ্রভাগে দা বেঁধে দূরবর্তী অঞ্চলের জঙ্গল পর্যন্ত পরিষ্কার করা সম্ভব হতো। শুধু তাই নয়, নারী সমাজকেও তারা বিব্রত করে তুলেছিল। কেননা, পুরুষদের যন্ত্রণায় তারা সর্বদা অস্থির থাকতো। ফলে নারী সমাজ ভগবানের কাছে প্রতিবাদ জানাল। ভগবান তাদের অভিযোগ শ্রবণ করলেন এবং পুরুষদের অভিশাপ দিলেন। ফলে তাদের প্রজনন অঙ্গ সঙ্কোচিত হয়ে এক মুঠো হয়ে আছে।

মার্গারেট মীড, গোরার প্রমুখের বর্ণনায় একই বিষয়বস্তুর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রজনন অঙ্গ দ্বারা সেতু তৈরী করে নদী বা খাল পারাপার এবং তা কোমরে পেচিয়ে রাখার কথা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। এবং একই কারণে গারোদের ধারণা অনুযায়ী তা সঙ্কোচিত হয়ে বর্তমানের পর্যায়ে আছে। নৃতত্ত্ববিদ গোরার আসামের লেপচাদের কাছ থেকে যেসব কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তাতেও একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

অনুরূপভাবে আদিম সমাজে স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ (Vulva) সম্পর্কিত কেচ্ছা-কাহিনীরও অন্ত নেই। তবে দাঁত বিশিষ্ট স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের কাহিনী (The Vagina Dentata Legend) সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এবং এর বিস্তৃতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী।

এ প্রসঙ্গে সি. জি. সেলিগম্যানের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: 'The essential unity in the psychoses makes it unlikely that neurotic symbolization—is different in the different races. There is in fact one fear, the neurotic dread of sexual intercourse, which is symbolized in the same manner as the Vagina Dentata by many people in many countries.'[৮]

স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে যে এককালে দাঁত ছিল এবং এর কবলে পড়ে যে পুরুষ পক্ষের মৃত্যু ঘটেছে এই তথ্য বাংলাদেশের প্রায় সব আদিবাসী কাহিনীতেই স্পষ্ট। কখন থেকে এই দাঁত উৎপাটিত হলো আদিবাসী ভেদে সেসব কাহিনী ভিন্ন রকমের। বাংলার পৌরণিক কাহিনীতে 'বিষকন্যা', 'নাগিনী কন্যা', 'রাক্ষসী কন্যা' ইত্যাদির যে ভূমিকা ছিল আদিম অবস্থায় নারী সমাজেরও সে ভূমিকা ছিল বলে আদিবাসীদের ধারণা।

সম্ভোগের নিমিত্ত 'বিষকন্যা' ইত্যাদির সান্নিধ্যে গেলে পুরুষ জাতির মৃত্যু অবধারিত জেনেও পুরুষরা বিষ কন্যার সংসর্গে যেতে বাদ দেয় নি। এর কারণ নারীর অঙ্গশ্রীর মোহ মায়া এবং পুরুষ পক্ষের কামযন্ত্রণার তাড়না। পতঙ্গ যেমন অগ্নির মোহে পড়ে নিজেকে পুড়িয়ে মারে, আদিকালে পুরুষদের ব্যাপারও ছিল তাই। তারা জানতো দাঁত বিশিষ্ট প্রজনন অঙ্গওয়ালা নারী সম্ভোগ ওদের মৃত্যুর কারণ, অথচ সেই মোহজাল তারা ছিন্ন করতে পারে নি এবং হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছে।

এভাবে পুরুষ জাতি যখন নিশ্চিহ্ন হতে চললো তখন নারী প্রজনন অঙ্গের দাত ভাঙ্গার নির্দেশ তারা কেউ পেলো স্বপ্নের মাধ্যমে, কেউ পেলো দেবতাদের সহায়তায়। আবার কোথাও দেখা যায় সহানুভূতিশীল প্রাণীকুলও এই দায়ভার গ্রহণ করে এগিয়ে এলো পুরুষ জাতিকে সাহায্য করতে। এ প্রসঙ্গে খাসীয়া সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায়। মাকড়সা এবং বোলতা খাসীয়া পুরুষদের দুর্ভোগ লক্ষ্য করে তারা দেবতার কাছে প্রার্থনা করে

নিজেরাই মৃত্যু বরণ রীতি মেনে নিল। সেই থেকে মাকড়সা এবং বোলতা যথাক্রমে স্ত্রী মাকড়সা এবং স্ত্রী বোলতার সঙ্গে প্রথম সহবাসেই মৃত্যু বরণ করে। আর দেবতার নির্দেশে এক শক্তিশালী খাসীয়া যুবক অগ্নিদগ্ধ শাড়াশীর সাহায্যে নারী প্রজনন অঙ্গের দাঁতভেঙ্গে দিতে সমর্থ হলো। সেই থেকে নারী প্রজনন অঙ্গে আর দাঁত রইলো না। আর বোলতা এবং মাকড়সা হয়ে রইলো খাসীয়াদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র। তাই বোলতা ও মাকড়সা হত্যা করা খাসীয়া সমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিবাসীভেদে এই দাঁত উৎপাটনের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির এবং এর বর্ণনায়ও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এফ. বোয়াস উত্তর আমেরিকার এ্যারাপাহো (Arapaho), বেল্লাবেল্লা (Bellabella), বেল্লাকোলা (Bellacoola), ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান (Blackfoot Indian), ক্রো ইণ্ডিয়ান (Crow Indian), কোমক্স (Comox), কোস (Coos), ডাকোটা (Dakota), পউনি (Pawnee), শোশোন (Shoshone) প্রমুখ আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রায় পঁচিশটি বিচিত্র ধরনের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। কাহিনীগুলো বিভিন্নধর্মী হলেও বিষয়বস্তু (motif) এক।

আর. এইচ. লবী অবশ্য এই দাঁত ভাঙ্গার প্রথম পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে 'পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা' (Test-Theme) বলে অভিহিত করেছেন। এবং লবী এই পরীক্ষায়ও প্রথম ব্যক্তির কার্যকলাপের তথ্য সংগ্রহ করেছেন উত্তর আমেরিকার শোশোন আদিম সমাজ থেকে। এই কর্মের নায়ক কয়োটে (Coyote) দেবতাদের সাহায্যে প্রস্তরের মাধ্যমে দাঁত ভেঙ্গে পুরুষ জাতিকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়।[১০]

ডোরসে বর্ণিত এ্যারাপাহো আদিম সমাজের কাহিনীতেও জানা যায় যে, এক সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক প্রস্তরের সাহায্যে স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের দাঁত ভেঙ্গে পুরুষ জাতিকে বিপদমুক্ত করে।[১১]

অনুরূপভাবে বোগেরাস[১২] ব্রিফল্ট[১৩] ওয়েস্টার মার্ক[১৪], ল্যাণ্ডম্যান[১৫] ডিকিনসন[১৬], এলুইন[১৭], জ্যাকবস[১৮], হুইলার[১৯] এবং ডোভাল[২০] প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদদের সংগৃহীত কাহিনীতে বিচিত্রধর্মী পদ্ধতিতে দাঁত ভাঙ্গার তথ্য পাওয়া যায়।

দাঁত ভাঁঙ্গার পরের অবস্থার ব্যাখ্যাও নৃতত্ব বিজ্ঞানে রয়েছে যথেষ্ট। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদদের মতে স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের দাঁত ভাঙ্গা হয়েছে বটে কিন্তু সেই উত্তেজনার স্পর্শ এখনও নারী সমাজের যৌন চেতনায় সম্পৃক্ত। কেননা, যৌন আবেগের তীব্রতা এখনও নারী সমাজে পুরুষদের চেয়ে অধিক মাত্রায় লক্ষ্যযোগ্য। ফলে, যৌন উত্তেজনায় তারা পুরুষ জাতিকে কামড়িয়ে তাদের অবলুপ্ত স্মৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ স্যাভেজ ল্যাণ্ডের আমেরিকার আইনু (Ainu) সমাজভুক্ত এক মেয়ের প্রমের উপাখ্যান ব্যক্ত কবেছেন। এক ছেলে তার প্রেমে পড়ে তার কামড়ের শিকার হয়েছিল ('was bitten all over by an Ainu girl who was in love with him).[২১]

১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন মহকুমার ৩০৮ মৌজার উত্তর হাঙ্গার গ্রামের জনৈক মুবং যুবকের বিয়ের পরের দিন তার মুখ মণ্ডলে কামড়ের দাগ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এই দৃশ্য স্বভাবতই প্রায় একশ' বছর পূর্বের স্যাভেজ ল্যাণ্ডর সাহেবের বর্ণিত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়েছিল।

ভেরিয়ার এলুইনও উল্লেখ করেছেন যে, 'প্রেমের কামড়' এবং 'প্রেমের আচড়' ('love-bite and love-scratch') আদিম সমাজভুক্ত নারীদের নৃশংসতাব নিদর্শন। তিনি এই ব্যাপারটি বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের পবধান আদিম সমাজে লক্ষ্য করেছেন অধিক মাত্রায়।[২২]

এসব কাবণেই ব্লুক নাবী পুরুষের যৌন মিলনকে অনেকক্ষেত্রে 'দুঃখজনক' (sadic) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৩]

নাবী যেখানে উত্তেজনাব তীব্রতাব পুরুষ জাতিকে কামড়িযে যৌন লিপ্সা নিবৃত্তি করছে পুরুষও সেখানে শিশ্ন আঘাতে ('Penis-envy') নাবী প্রজনন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত বা রক্তাক্ত করে ফেলছে। এই নৃশংসতা যে পাশবিক পর্যায়ের তাতে সন্দেহ নেই।

পশু জগতে বরঞ্চ এই রীতি লক্ষ্য করা যায় উষ্ট্র ও উষ্ট্রীর যৌন মিলনে। এদের যৌন মিলনে দেখা যায় সঙ্গম কালে উষ্ট্রী ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁত দিয়ে উষ্ট্রকে এমন কামড় দেয় যে তখন তার পক্ষে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি থাকে না। পশু জগত বা মনুষ্য জগত যাই বলি

না কেন এ ধরনের যৌন চেতনা যে আরামের পরিবর্তে দুঃখেরই নামান্তর তা বলাই বাহুল্য।

ইতিপূর্বে বর্ণিত 'প্রেমের কামড়' (love-bite) বা 'প্রেমের আচড়', (love-scratch) বাৎসায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থেও উল্লেখিত দেখা যায়। 'কামসূত্রের' বর্ণনা অনুযায়ী আট প্রকারের কামড়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এক একটি দাগ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিত্রিত করা হয়েছে—যেমথ 'বাঘের কামড়' 'শূকরের চিবানো' ইত্যাদি। অবশ্য, এসবের মধ্যে পশুসুলভ মনোবৃত্তিই সম্পৃক্ত; কাজেই চিহ্নগুলোও পশুর হিংস্রতার পরিচয়বাহী নামে আদৃত। মানব জাতির যৌন-জীবনে এও এক ধরনের অদ্ভুত মানসিকতা!

হিন্দুমতে নারী জাতিকে যে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন পদ্মিনী, চিত্রানী, শংখিনী এবং হস্তিনী—আসলে এসব নারীজাতির শ্রেণী বিভাগ নয়—এসব নারী প্রজনন অঙ্গের শ্রেণীবিভাগ।

বাৎসায়নের 'কামসূত্র' অনুযায়ী পদ্মিনী নারীই সর্বশ্রেষ্ঠ; কেননা তার ভগদেশ সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতোই সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং সুঘ্রাণযুক্ত। অনুরূপভাবে চিত্রানী নারীর ভগদেশ চিত্রের মতো সমুজ্জল; শংখিনী নারীর ভগদেশ শামুকের মতো বক্রাকৃতি এবং হস্তিনী নারীর ভগদেশ হস্তির বিশেষ অঙ্গের মতো স্থূলাকার। এবং এইসব অঙ্গও নারী জাতি তাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী প্রকৃতি অথবা জন্তুজগতের সঙ্গে বিনিময় করে নিয়েছে বলে কামসূত্রের তথ্য অনুসারে জানা যায়। কাজেই তাদের প্রবৃত্তি মাফিক নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করা মোটেই কষ্ট-সাধ্য নয়। কেননা, নামের মাধ্যমেই তাদের কাম ভাবের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং পরিচয় বিধৃত।

২৭

নারীর সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্য-চেতনা উভয়ই পুরুষের চক্ষে বিশেষ করে যৌন-জীবনে এক আকর্ষণীয় বস্তু। সৌন্দর্য-চেতনা বলতে পোষাব-পরিচ্ছদ ফুল-মালা, খোঁপা-অলঙ্কার ইত্যাদি সমভিব্যাহারে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে পুরুষের চক্ষে প্রতিভাত হওযার কথাই বোঝানো হয়।

নারীর সৌন্দর্য পুরুষের চির আকাংখিত বস্তু। তাই মোহগ্রস্ত নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কতো পুরুষ উন্মাদ হয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে, এমনকি সাম্রাজ্য পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। হেলেনের জন্য ট্রয় নগরী ধ্বংস ইতিহাস-খ্যাত কাহিনী। আবাব এই নারীই সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস, উর্বশী প্রমুখের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে পুরুষ জগতে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। তাই আবহমান কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীগণ তাদের রূপ বর্ণনার অমর স্বাক্ষর রেখেছেন। পঞ্চম শতাব্দীর আরবী কবি নারীর রূপ বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেনঃ 'ছন্দময় তনুলতা অপরূপ সুন্দরী সে নারী/লোভনীয় দেহ-রেখা আর তার যুগল স্তনের/মাঝখানে মনে হয় স্বচ্ছতম আয়না বসানো/অথবা নিটোল উটপাখীর ডিমের প্রতিচ্ছবি/কাঁচা হলুদের আভা বিচ্ছুরিত যেন তার থেকে/মধ্যভাগে প্রবাহিত ঝর্ণার জলধারা।'[১]

নারীর রূপ বর্ণনায় 'আরব্য উপন্যাসের' কবিরাও কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। শুধু আরবরাই এতে আকৃষ্ট হয়নি সারা বিশ্বের পুরুষদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছে। যেমন, 'তার সুডৌল কোমর মিশরীয়দের মতো

দোলানো, চেহারা আলিফের মতো খাড়া, বেবীলনীয় ঔজ্জ্বল্যভরা চোখ, মেঘের মতো কালো চুল, রূপোর খনিতে চাকচিক্য ছড়ানো দেহের রং, বাদামের দানার মতো নিটোল শরীর ইত্যাদি। তার পোশাকের বাহার শরতের আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতো ঝলমলে, সুডৌল লাউয়ের মতো উরুযুগল, সারা দেহের চত্বরে কস্তুরী কিংবা মৃগনাভীর ঘ্রাণ; ইত্যাদি* আরব্য উপন্যাসের বর্ণনায় নারী সৌন্দর্যের যথার্থতা।

বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকগণও নারীর রূপবর্ণনায় কম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'; ইত্যাদি। নারী সৌন্দর্যই যুগে যুগে আকৃষ্ট করেছে পুরুষ জাতিকে। নারী ও পুরুষ—এই দুইয়ে মিলিই হয়েছে সৃষ্টির সার্থকতা।

নারীর দৈহিক অবয়বই যৌন-উত্তেজনার অন্যতম প্রধান কারণ। এই দৈহিক অবয়ব দেশ, সমাজ এবং জাতি ভেদে পৃথক পৃথক এবং এক একজনের চোখে এক এক ভাবে প্রতিভাত হয়। যেমন আদিম সমাজের নারী হয়তো সভ্য সমাজের চোখে ভালো না লাগতে পারে—তাই বলে কি তারা তাদের পুরুষদের চক্ষে অবজ্ঞেয়?

কখনোই নয়।

নারীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার পক্ষে তাদের প্রয়াসও উপেক্ষার নয়। রবার্ট ব্রিফল্ট লক্ষ্য করেছেন: 'Among the Tuareg the beauty of the girls of good family is promoted from an early age, they are entrusted, when six or seven years old, to energetic slaves, who compel them to swallow several times a day large quantities of milk foods and flour...the young aspirants to beauty are, moreover, every evening rolled in the sand and vigourously massaged in order to distribute uniformly the acquired fat and suppress all angles and concavities. Thanks to this regimen and complete idleness they are, towards the age at eighteen, monastrously beautiful. They are then unable to rise or discipline themselves without the aid of two vigorous slaves; and all the warriors vie for their favours.'*

পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরীয় অঞ্চলের আদিম সমাজের চোখে কি ধরনের নারী আকর্ষণীয় এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মঙ্গো পার্ক উল্লেখ করেছেন: 'Corpulence and beauty seem to be terms nearly synonnymous. A woman of even moderate pretensions must be one who can not walk without a slave under each arm to support her, and a perfect beauty is a load for a camel.'[৪]

উপরের দুটি উদ্ধৃতিতে রবার্ট ব্রিফল্ট ও মঙ্গো পার্ক বর্ণিত নারী হয়ত অনেকের চোখেই সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হবে না। কিন্তু টোয়ারেগ এবং নাইজেরীয় সমাজের কাছে তাঁরা সৌন্দর্যের আধার।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশ, জাতি এবং সমাজভেদে নারী সৌন্দর্যও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। যৌন-আকর্ষণ উদ্রেকের জন্য কি অবয়বের নারী পছন্দনীয় টরেস স্ট্রেইট-এর ট্রবরিয়াণ্ডারদের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর বি ম্যালিনৌস্কী উল্লেখ করেছেন: 'Vigour, vitality and strength, a well proportioned body, a smooth and properly pigmented, but not too dark skin are the basis of physical beauty......In all the phases of village life I have seen admiration drawn and held by a graceful, agile and well balanced person...it is notable fact that their main erotic interest is focussed on the human head and face...The outline of the face is very important ; it should be full and well rounded ....The forehead must be small and smooth ...Full cheeks, a chin neither protruding nor too small, a complete absenee of hair on the face, but the scalp hair descending well on to the forhead, are all *desiderata* of beauty.'[৫]

এভাবে বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ, পরিব্রাজক এবং গবেষকগণ বিভিন্ন দেশের আদিম সমাজের নারী সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছেন। কেউ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সুঠাম সুন্দর তন্বী দেহের উপর, উন্নত নাসিকা ও সুডৌল স্তনের উপর, চর্বিযুক্ত মোটা শরীরের উপর এবং মাংসল থলথলে উরুর উপর। আবার কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'সাদা' এবং 'কালো'-এর তফাৎ বিশ্ব-খ্যাত। হাওয়াই, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম সমাজভুক্ত

নারীদের গায়ের রং সাদা এবং অটুট স্বাস্থ্য এবং উন্নত যৌবনের অধিকারিণী। অপর পক্ষে আফ্রিকার বুশম্যান, হটেনটট, নিগ্রো প্রভৃতি আদিম সমাজ অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তাদের গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণেরও যে একটা আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আছে ডি. পিয়ারসন-এর মন্তব্যে তা ধরা পড়ে: **She is in many cases an individual of remarkable beauty. Typically, she has dark brown eyes and dark hair, quite wavy, perhaps even curly, and Caucasian features, her colour is *cafe com leite* (literally, coffee with milk ; i. e. like that of one "heavily tanned") and she has a healthy appearance.**[৬]

বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের মধ্যে মনিপুরী, খাসীয়া, চাকমা, মারমা, টিপরা, মগ, হাজং, গারো প্রভৃতিদের গায়ের রঙ ফর্সা, নাক খাদা, শারিরীক গঠন মাঝারি ধরনের এবং পেটা শরীর। অথচ শারিরীক অবয়ব দেখলেই একটি থেকে আর একটিকে পৃথক করে চেনা যায়।

অপরদিকে সাঁওতাল, ওরাও, হো, মুণ্ডা এবং পালিয়াদের শরীরের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। একমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ই সবচেয়ে কৃষ্ণবর্ণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং অন্যান্যদের গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ হলেও সে যেন 'কফির সঙ্গে দুধ' মিশ্রিত ভাব।

স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশী নৃতত্ত্ববিদ এবং পর্যটকগণ বাংলাদেশে আগমন করেছেন এবং এখানকার উপজাতীয় সমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু কেউই নারী-সৌন্দর্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন বলে নজরে পড়েনি। লেখাপড়া শেখেনি কিংবা সভ্যতার কোনো আলোক তাদের অবয়বে রেখাপাত করেনি বলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই অনীহা। কিন্তু উপজাতীয়গণ যে বাংলাদেশের বিস্তৃত অরণ্যের বাগানে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পস্বরূপ তা বলাই বাহুল্য।

তন্বী দেহ, সামান্য লম্বাটে মুখ, সুডৌল শরীর, ছোট ছোট স্তন এবং আজানু লম্বিত চুল যদি নারী-সৌন্দর্যের প্রধান আকর্ষণ হয় তবে মগ রমণীরা খুবই সুন্দরী বলতে হবে। তদুপরি রয়েছে ফর্সা গায়ের রঙ —এ যেন সোনার উপরে সোহাগা।

টিপরা রমণীর রূপ বর্ণনায় টিপরা লোক-কবির কৃতিত্বকেই আমরা

এখানে উল্লেখ করবো। শ্রীবরেন ত্রিপুরা সংগৃহীত গানটি বাংলা অনুবাদ-সহ নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

মাখাং আনি ফাতৈ লাই, খোকচি আনি উরিবার,
খোঁজুর আনি বাই খাং বার, বুকুং আনি ছিবিংবার।
বুয়া আনি শশাকল্, মকল আনি মাছৈ কল,
ইয়াসা আনি ছবাই খায়, ইযাকতোক আনি ময়াচোক্
ইয়াকা তোক আনি মুলাই কং, খাচার আনি মাইরাংখং
বাচাং আনি চাংরা রাই, মাইনি পযাসা বাছাংছা।

অনুবাদ:

পানেব পাতার মতো তোমাব ও মুখ শোভা পায়,
তোমার ও দুটি ঠোঁটে আরক্তিম জবা খেলা করে।
লতানো কানের বৃন্তে বাতাসে দুলছে শিম ফুল;
দু'পাটি দাঁতের লগ্নে চিরল চিবল শশা-বীচ
হরিণীর কাছ থেকে চুরি কবা তার দুটি চোখ,
শঙ্খের বিস্ময় তার যুগল স্তনেব সমারোহে।

টিপরা বমনীর রূপ বর্ণনায় উপরের ক্যাব্যাংশই যথেষ্ট বলে মনে করি।

চাকমা বমণীরাও সুন্দরী। তাদের গায়ের রঙ ফর্সা, সুন্দর সুঠাম তন্বী দেহ, মুলোর মতো সুডৌল হাত, কালো চুল, লাল মাছেব মতো ঠোট এবং সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় বস্তু।

বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের একমাত্র সাঁওতাল রমণী ছাড়া অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের মেয়েদেরই স্তন ছোট এবং থেতলানো। এর একমাত্র কারণ সবাই বুকে খুব কষে কাপড় বেঁধে রাখে। যে জন্যে স্তন ফুলে উঠার সুযোগ পায় না। এমনকি কয়েকজন সন্তান হওয়ার পরেই তা পেণ্ডুলামের মতো ঝুলে পড়ে।

আফ্রিকার বুশম্যান, নিগ্রো মাসাই, হটেনটট মেয়েদের মতো স্থূলাকার দেহধারী মেয়ে বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজে খুব নজরে পড়ে না। একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় পাবত্য চট্টগ্রামের মুরং সমাজে। মুরং সমাজের কিছু সংখ্যক রমণী স্থূলাকার ও ভারী দেহ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য দেশে যেমন 'সাদা' ও 'কালোর' বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশেও তেমনটি রয়েছে। মগ, চাকমা, মণিপুরী, টিপরা, হাজং, গারো প্রভৃতিদের পাশে সাঁওতাল রমণী ঠিক উল্টো। সাঁওতাল রমণীদের গায়ের রঙ মিশ কালো, সুঠাম সুন্দর যৌবনের অধিকারিণী, উন্নত স্তন, শক্ত বাহু, লম্বা চুল, এবং হরিণীর মতো চোখ—ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি। কালো-এরও যে একটা রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে সাঁওতাল রমণী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

নারীদের সৌন্দর্য-চেতনাও যৌন-আকর্ষণের অন্যতম দিক। নারী সৌন্দর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিচিত্র চুল বিন্যাসে খোঁপা সাজানোর রীতি। তদুপরি কোনো কোনো আদিম জাতির মেয়েরা খোঁপাকে আরও সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ফুল অলঙ্কার কড়ি পুঁতির মালা ইত্যাদি ব্যবহার করে। পাকিস্তানের কালাস উপজাতীয় মেয়েরা যে বিচিত্র ধরনের কড়ি দিয়ে খোঁপার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তা শুধু আকর্ষণীয় নয়, তৃপ্তিকরও বটে। অনুরূপভাবে আফ্রিকার জুলু ও হউসা, জাঞ্জিবারের সোয়াহিলি, বলিভিয়ার কুইচোয়া, সুদানের ফোলাহ, উচ্চ নীলের সিলুক, পূর্ব আফ্রিকার মাসাই এবং চীনের নুসু প্রভৃতি আদিম সমাজের মহিলারা যেসব বিচিত্র ধরনের খোঁপা বাঁধে তা দেখলে রীতিমত বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। পূর্ব আফ্রিকার মাসাই মহিলারা খোঁপার চুল আরও সুদৃশ্য করার জন্য মাথার দুই পাশে দুটি মহিষের শিং ব্যবহার করে; উচ্চ নীলের সিলুক রমণীরা কড়ি পুঁতির মালা ছাড়াও পাখীর পালক খোঁপার সঙ্গে আটকিয়ে রাখে। বলিভিয়ার কুইচোয়া মেয়েরা অজস্র বেণীর মাধ্যমে চুলগুলো খোঁপার আকৃতিতে না বেঁধে পিঠে এবং দুই পাশে অজস্র দড়ির মতো করে রাখে। আসামের মিশমী, আবর, লাখের, মিরি, দিমাসা প্রভৃতি সমাজের রমণীরাও খোঁপায় পাখীর পালক ব্যবহার করে থাকে। মোটকথা, চুল নারীদের সৌন্দর্যের অন্যতম অঙ্গ। এই চুলের যত্ন এবং একে সুদৃশ্য করার রীতি এদের আবহমান কালের। বিশ্বের কবি সাহিত্যিকরাও নারীদের চুলের বর্ণনায় আনন্দ-মুখর হয়েছেন।

বাংলাদেশের সব উপজাতীয় রমণীরাই চুলের যত্ন করে। চুলের যত্নের জন্য মঘ, চাকমা, কুকি ও লুসাই রমণীদের খ্যাতি সুবিদিত। খোঁপাকে সুন্দর ও সুদৃশ্য করার জন্য অনেকেই পরচুলা (**false-hair**)

ব্যবহার করে। এমনকি কুকি ও লুসাই রমণীরা খোঁপা নষ্ট হওয়ার ভয়ে গোসল করার সময় মাথায় পানি দেয় না। তাছাড়া বর্ষাকালে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা ছোট ছোট হ্যাট-সদৃশ মাথাল ব্যবহার করে। চাকমা ও মগ মেয়েদের খোঁপার জাল বা নেট সমানভাবেই আকর্ষণীয়।

বনজোগী মেয়েরা খোঁপা বাঁধে ঠিক মাথার উপরে। খোঁপাকে সুদৃশ্য করার জন্য তার চার পার্শ্বে গুঁজে রাখা হয় চিরুণী, বিভিন্ন ধরনের চুলের কাটা এবং লাল ফিতা। আফ্রিকার মাসাই রমণীরা যেমন খোঁপার দুপাশে মহিষের শিং গুঁজে রাখে বনজোগী মেয়েরাও খোঁপার চতুর্দিকে সজারুর কাঁটা সন্নিবেশিত করে। বনজোগীরা কেন মাথার উপরে খোঁপা বাঁধে সে সম্পর্কে একটি সংস্কারমূলক কাহিনী আছে :

'একবার এক ফিঙ্গে ও কাঠঠোকরার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয়। ফিঙ্গে কাঠঠোকরার মাথায় এমনভাবে আঘাত করে যে কাঠঠোকরার মাথা রক্তাক্ত হয়ে যায়। রক্ত দেখেই ফিঙ্গে ভয়ে পালিয়ে যায়। কাঠঠোকরা দমবার পাত্র নয়। সে ফিঙ্গের বাসায় গিয়ে তার সব বাচ্চা খেয়ে ফেলে।

বনজোগী সম্প্রদায়ের খোজিং সম্ভূত একজন কোবাং বা সিদ্ধপুরুষ এই ঘটনা অবলোকন করেন। তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে বললো যে সে যা দেখেছে তা খোজিং দেবতার কীর্তি এবং পবিত্র কর্ম। সিদ্ধপুরুষটি সেই সংবাদ বনজোগী সমাজে প্রচার করে দিলেন। তখন থেকেই বনজোগীরা চুলের খোঁপা মাথার উপরে বাঁধে এবং খোঁপার চারপাশে রক্তের চিহ্ন স্বরূপ একটি লাল কাপড়ের টুকরা বা ফিতা পরিব্যাপ্ত করে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তারা এই অবস্থাকে আরও পবিত্র জ্ঞান করে। কারণ বিপরীত দল তাদেরকে কাঠঠোকরা ভেবে ফিঙ্গের ন্যায় আঘাত করে ভয়ে পালিয়ে গেলে বিপরীত দলকে তারা সর্বশান্ত করে ফিরে আসবে।'

সাঁওতাল রমণীরাও খোঁপা সাজাতে পটু ও সিদ্ধহস্ত। এদের খোঁপা খুব সুবিন্যস্ত ও গোল। খোঁপা নষ্ট হওয়ার ভয়ে এরা কখনও মাথায় ঘোমটা দেয় না। ফুল দিয়ে খোঁপা সাজানো সাঁওতাল সমাজেই বেশী প্রচলিত রীতি।

আদিম সমাজের যৌন আকর্ষণের আর একটি দিক অলঙ্কারের সাজ-সজ্জা। বাংলাদেশের আদিম সমাজের অধিকাংশ রমণীদের অলঙ্কারের মধ্যে পুঁতির মালা রূপোর টাকার মালা ও হার, কড়ির মালা ; নাক, কান

কোমর, বাহু এবং পায়ে ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের রূপোর অলঙ্কার ইত্যাদি প্রধান। পুঁতির মালা, রূপোর টাকার মালা ও কড়ির মালা ব্যবহারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরুং, পাংখো, বনজোগী, লুসাই-কুকী,* তংচঙ্গ্যা প্রভৃতিদের খ্যাতি সুবিদিত। কুকি ও লুসাইরা বাঁশ-নির্মিত অলঙ্কারও পরিধান করে। সাঁওতাল রমণীরা রূপোর মোটা মোটা অলঙ্কার ছাড়াও হাতে রাঙ, লোহা কিংবা শাঁখের বালা ব্যবহার করে। মেয়েরা এতো সব ভারী অলঙ্কার পরিধান করে যে অনেক সময় অলঙ্কারের ওজন মেয়েদের চেয়েও ভারী বলে মনে হয়।

সাঁওতাল-ওরাওঁ প্রভৃতি মেয়েরা যে উল্কী অঙ্কন করে তাও সৌন্দর্য-বর্ধক অলঙ্কার বলে গণ্য করা হয়। বলা আবশ্যক যে, আদিম মানব প্রথম পর্যায়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ফুল-লতা ইত্যাদি চিহ্নিত বিচিত্রধর্মী উল্কী অঙ্কন করে কেবল শোভা বর্ধনই করতো না--তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের অভাবও মেটাতো। পরবর্তী সময়ে যখন তারা কাপড় পরা শিখলো তখন তাদের উল্কীচিহ্ন আশ্রয় নিল মুখ মণ্ডল, হাত-বুক ইত্যাদি স্থানে। যাহোক, সাঁওতালগণ উল্কীকে আনন্দ কিংবা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাকচিক্য বাড়ানোর প্রতীক বলে মনে করে। এমনকি তারা প্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবেও উল্কীর উপমা দেয়। কেননা, প্রেমাকাংক্ষী যুবতীর মুখে কখনো কখনো বলতে শোনা যায় যে, সে তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে বলছে: 'তোমার কথা উল্কীর মতোই আমার হৃদয়ে চিহ্নিত হয়ে আছে।'

আদিম সমাজের বৈচিত্র্যময় পোষাক-পরিচ্ছদও যৌন-আবেগ উদ্রেকের আরেক দিক। পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে অবশ্যি শালীনতাবোধের প্রশ্নটিও জড়িত। সমগ্রবিশ্বের আদিম সমাজের তুলনায় অন্ততঃ পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে বাংলাদেশের আদিম সমাজ অনেক সভ্য এবং শালীনতার অধিকারী। ব্যাপারটি একটু তুলনামূলক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যেহেতু নারীসমাজ পুরুষের চক্ষে এক ভিন্নতর বস্তু সেহেতু তাদের যৌন-অঙ্গ পরিবেষ্টনকারী পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

অবাধ মেলামেশা যেমন যৌন-কর্মের সহজতর পথ উন্মুক্ত করে, তেমনি নগ্নতাও যৌন-আকর্ষণের পথকে আরও সুগম করে দেয়। লজ্জা, শিষ্টতা এবং সম্ভ্রম প্রভৃতি নারীসুলভ গুণাবলীকে আরও দৃঢ়তর করার

জন্যই পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক আদিম সমাজ রয়েছে যারা নামেমাত্র পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। প্রসঙ্গত গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের উল্লেখ করা যায়। তারা নারী-পুরুষ উভয়েই বাইরে ঘোরা ফেরার সময় গাছের বাকল এবং লতাপাতা পরিধান করলেও গৃহে অবস্থানকালে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। এমনকি বাইরের অতিথিদের সম্মুখে আসতেও তখন তারা দ্বিধা প্রকাশ করে না।

দক্ষিণ আমেরিকার ওনা (Ona), সুদানের নান্দী (Nandi), সুক (Suk) প্রভৃতি আদিম সমাজও পশু-চামড়া দিয়ে কেবল লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে এবং অবশিষ্ট শরীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। উচ্চ নীল অঞ্চলের আচোলী (Acholi) এবং ঘানার আদিম সমাজের রমণীরা পত্র-গুচ্ছ এবং কড়ির সমারোহ দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করে; ব্রাজিলের টুপিস (Tupis), কঙ্গো অঞ্চলের মঙ্গবেত্তু (Mangabettu) ও বাসুংগে (Basonge) সম্প্রদায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তারা পত্র-গুচ্ছ কিম্বা কড়ির পরিবর্তে উল্কীচিহ্ন অঙ্কিত করে অথবা গাঢ় রঙ ব্যবহার করে লজ্জাস্থান পরিবেষ্টন করে। অবশ্য, এ ব্যাপারে তাদের সংস্কারবদ্ধ ধারণাও রয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস, ছিদ্রযুক্ত স্থান, যেমন নাক, কান, প্রজনন অঙ্গ ইত্যাদি দিয়ে অপদেবতা (Evil spirit) প্রবেশ করে বন্ধ্যাত্ব কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকর ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটাতে পারে। এ জন্যে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকার পরিবর্তে সামান্য কাপড়, গাছের বাকল, পত্র-গুচ্ছ, কড়ি কিংবা উল্কী চিহ্নের ব্যবহার করতে উৎসাহী।

প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের পোনাপে (Ponape) আদিম সমাজের রমণীদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার ব্যাপারটি আরও চিত্তাকর্ষক। তারা স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের চতুর্দিকে নানা বর্ণের চিত্র শোভিত অঙ্কন দিয়ে এর শোভাবর্ধন করে। এমনকি বিবাহের পর মেয়ের স্বামী তার স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ কি ধরনের শোভায় মণ্ডিত হয়েছিল এ সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে।

বক্ষ-উন্মুক্ত রাখার রীতি পাশ্চাত্য দেশের অনেক আদিম সমাজের রমণীদের মধ্যেই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঘানা, ব্রাজিল, পশ্চিম আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ সি, প্যাসিফিক অঞ্চল প্রভৃতির নাম করা যায়। বাংলাদেশের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মুরু, মুরং, পাঙ্খো; বনজোগী, সেন্দুজ,

বম প্রভৃতিদের রমণীগণ বক্ষ নগ্ন রাখে। এই নগ্নতার জন্য কিন্তু তাদের নিজ নিজ সমাজের পুরুষগণ তাদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। আমাদের শিক্ষিত সমাজে যেটা বস্ত্র-আবরণ তাদের কাছে এই নগ্নতাই পোষাক-পরিচ্ছদের নামান্তর। বলা আবশ্যক যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজে আজকাল হাতা কাটা, নাভী-বের করা যেসব জামা মহিলারা পরিধান করে সে সব কি আদিম সমাজের অবশেষ নয়?

বাংলাদেশের অন্যান্য উপজাতীয় মহিলাদের মধ্যে মনিপুরী নারীরা বুক আবৃত করে লুঙ্গী পরিধান করে। এটা বিবাহিত নারীদের জন্য প্রয়োজ্য। অবিবাহিত মেয়েরা পুষদের মতো লুঙ্গী পরলেও বুক আবৃত করে এক ধরনের কাপড় দিয়ে এবং একে 'নাগ-পোশাক' বলে। এ ব্যাপারেও তাদের ধর্মীয় সংস্কার রয়ে গেছে। কথিত আছে যে, বভ্রুবাহনের হাতে অর্জন নিহত হলে তাঁকে জীবিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চিত্রাঙ্গদাকে নাগরাজ্য থেকে উলুপীকে আনয়ন করতে বলেন। যথাসময়ে উলুপীর কাছে সংবাদ পৌঁছল। কিন্তু তিনি নাগপোষাক পরিহিত অবস্থায় মনিপুর আসতে অমত প্রকাশ করলেন। একথা শুনে চিত্রাঙ্গদা নিজে মেখলা পরিত্যাগ করে নাগপোশাক পরিধান করলেন এবং সমস্ত মনিপুরী মহিলাকে এই পোশাক ব্যবহার করতে অনুরোধ জানালেন। হলোও তাই, অতঃপর উলুপীর মনিপুর আসতে আর কোনো বাধা রইলো না। তিনি এসে অর্জুনকে সামন্তমণি দ্বারা জীবিত করলেন। এ কারণে মনিপুরী মহিলারা এই পোশাককে খুব গৌরবময় ও পবিত্র মনে করে।

খাসীয়া রমণীরা নিজেদের তৈরী এক প্রকারের ব্লাউজ ব্যবহার করে। খাসীয়া ভাষায় একে বলা হয় 'কা জিমপিন'। কাপড়ের বেল্ট দিয়ে তারা কোমর বাঁধে এবং কোমরের নীচে পা পর্যন্ত লম্বা 'কা জৈনসেম' বা লুঙ্গী পরে। এসব লুঙ্গী মুগা বা সিল্কের তৈরী।

চাকমা মেয়েরা লাল বর্ডার ওয়ালা কালো রঙের এক প্রকারের কাপড় পরিধান করে। এটা পরতে হয় কোমরে প্যাচ দিয়ে। চাকমা ভাষায় এটাকে বলা হয় 'পিনন'। নানা ধরণের ফুল অঙ্কিত কাপড় দিয়ে এরা বুক বাঁধে এবং এটাকে বলা হয় 'খাদী'। খাদী দুই প্রকারের—রাঙা খাদী ও ফুল খাদী। বিবাহিত মেয়েরা পরে রাঙা খাদী এবং অবিবাহিত মেয়েরা ব্যবহার করে ফুলখাদী।

মগ মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুঙ্গী ও এনিজ্যি প্রধান। এনিজ্যি ব্লাউজের অনুকৃতি তবে এটা তৈরী করা হয় খুব ফিনফিনে পাতলা সাদা দামী কাপড় দিয়ে। উপজাতীয় মহিলাদের মধ্যে মগ মেয়েরাই সম্ভবতঃ অধিক বাবুগিরি পছন্দ করে এবং স্নো-এসেন্স মাখতে ভালোবাসে।

পাখো, বনজোগী, সেন্দুজ, খুমী এবং মুরং রমণীরা নামেমাত্র কাপড় পরিধান করে। এটার নাম ওয়াংলাই। ওয়াংলাই দিয়ে শুধু লজ্জাস্থান ঢাকা যায়। বাকী অংশ সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। মুরংদের ওয়াংলাই নয় থেকে এগার ইঞ্চি চওড়া। এই কাপড় দিয়ে নাভির কাছ থেকে বড়জোর লজ্জাস্থান ঢাকা চলে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এদের কাপড় পরার ব্যাপারটি এতই চমৎকার যে কোন প্রকারেই লজ্জাস্থান দেখবার জো থাকে না। ওয়াংলাই পরিধানের পরও বামদিকের কোমরের কাছে চার থেকে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা খালি রাখা হয়। এ ব্যাপারে তাদের সংস্কার রয়ে গেছে। মুরং সমাজ তাদের সৃষ্টিকর্তা তুরাই-এর কাছ থেকে কাপড় পরবার কোনো নির্দেশ পায়নি বলেই তারা নামেমাত্র কাপড় পরিধান করে এবং কোমরেব কাছে কিছু জায়গা খালি রাখে। কোমরে প্যাচ দেওয়া সুতোর মধ্যে ওয়াংলাই আবদ্ধ থাকে। এটার রঙ কালো এবং খুব মোটা সুতো দিয়ে তৈরী।

সাঁওতাল মেয়েরা পরিধান করে মোটা শাড়ী। এই শাড়ী দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশ দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করে এবং অপর অংশ দিয়ে দেহের উপরিভাগ আবৃত করে। তবে কখনো ঘোমটা দেয় না। যে অংশ দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে তা থাকে হাঁটুর সামান্য নীচে অবধি।

গারো মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গির মতো করে টুকরো কাপড় পরিধান করে। কাপাস থেকে সুতো তৈরী করে এবা নিজেরাই নিজেদের ব্যবহার-যোগ্য কাপড় তৈরী করে।

লজ্জা, সম্ভ্রম ও শিষ্টতা রক্ষার্থে বাংলাদেশেব উপজাতীয় মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদের সামান্য বিবরণ পেশ করা হলো।

উপজাতীয় মহিলাদের সৌন্দর্য-চেতনার বিচিত্ররূপ যেমন অলঙ্কার, উল্কীঅঙ্কন, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি একদিকে যেমন যৌন-আকর্ষণেব উদ্রেক করে, অপরদিকে তেমনি যৌন-শিষ্টাচারেরও জন্ম দেয়। প্রখ্যাত

নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর কার্ডিনাও হেনরীক যৌন-শিষ্টাচারের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে :

'Sexual modesty can be defined as an inhibitory mechanism which controls the desire for sexual display on the part of man. As an aspect of the natural human sexual drive, display has as its corollary—modesty. Both can be regarded as innate in the sense that the tendency towards the exercise of the one or the other is part of the ordinary biological endowment of man...But in fact . . . display and modesty are opposed to each other and complete simultaneous satisfaction would appear to be impossible. If sexual modesty be considered as innate, its manifestation, on the other hand, is entirely dependent upon factors external to the biological sex drive. That is, factors which are essentially social or cultural control the particular forms which sexual modesty will take in any given society.'[৭]

২৮

আদিবাসী সমাজের সঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্পকলায়ও যৌন-স্পর্শ বা প্রেম বর্তমান। তবে সঙ্গীতের মধ্যেই প্রেমের আবেদন অত্যধিক। কেননা, এতে নর-নারীর মনের গভীরতম প্রদেশের আর্তিই ব্যক্ত হতে দেখা যায়। আদিম সমাজের ধারণায় জীবনে সফলকাম ও দেবতা-অপদেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য যেমন সঙ্গীতের সৃষ্টি তেমনি জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই প্রেম সঙ্গীতের উদ্ভব। নর-নারী যখন পরস্পরকে সান্নিধ্যে পাবার আগ্রহে অধীর এবং একজন অপরজনকে না পেলে জীবন দুঃসহ মনে করে তখন তাদের সেই মনোভাব বিকাশের অভিব্যক্তিই প্রেম সঙ্গীতের নামান্তর। তাই প্রেম সঙ্গীত দুটো হৃদয়কে একীভূত করবার একমাত্র যোগসূত্র।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলাদেশের প্রেম-সঙ্গীত ও আদিম সমাজের প্রেম সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, 'বাংলার প্রেম-সঙ্গীত সাধারণতঃ একক (solo) গীতি, আদিবাসী সমাজের মধ্যে নৃত্য সমন্বিত সমবেত গীতির সহায়তায় ইহা প্রকাশ পাইলেও বাংলাদেশে সাধারণতঃ ইহা এককই গীত হয়। তবে আঞ্চলিক প্রেম-সঙ্গীত গুলি কোনো কোনো সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বাংলাদেশের প্রেম সঙ্গীতের সঙ্গে আদিবাসী অঞ্চলের প্রেম সঙ্গীতের আর একটি স্থূল পার্থক্য আছে—বাংলার অধিকাংশ প্রেম সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই নারীমনের অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু সাধারণতঃ নারী ইহার গায়িকা নহে—পুরুষ ইহার গায়ক, নারী মনের নিগূঢ় অনুভূতি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পুরুষই এখানে ব্যক্ত

কবিতেছে। একমাত্র বিবাহ সঙ্গীত ও কোনো কোনো ভাদু সঙ্গীত ব্যতীত নাবী সমাজে প্রেম সঙ্গীত এদেশে প্রচলিত নাই। কিন্তু আদিবাসীব প্রেম সঙ্গীতেব মধ্যে সাধাবণতঃ পুরুষই পুরুষেব এবং নাবীই নাবীব মনোভাব ব্যক্ত কবিয়া থাকে। বাংলাদেশে এই বৈসাদৃশ্য দূর কবিবাব জন্য কোথাও পুরুষ নাবীব বেশ গ্রহণ কবিয়া থাকে—ঘাটু তাহাব নিদর্শন।[১]

আদিম সমাজেব প্রেম সঙ্গীত কখনো এককভাবে, কখনো সমবেতভাবে আবাব কখনো প্রশ্নোত্তব পদ্ধতিতে গীত হতে দেখা যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই পবস্পবেব মনেব ভাব প্রকাশেব তৎপবতায় তাবা মুখব।

বাংলাদেশেব একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামই সবচেয়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এখানকাব চাকমা, মগ, টিপবা, লুসাই-কুকী, মুবং প্রভৃতিদেব প্রেম সঙ্গীত শুধু নাবী ও পুরুষ মনেবই আকুতি প্রকাশ কবে না—এগুলো লোকসাহিত্যেবও অমূল্য সম্পদ।

চাকমা সমাজে প্রশ্নোত্তব হিসেবে যেসব সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং যেগুলোব অন্তবালে যৌন আবেগ ও প্রেম প্রচ্ছন্ন তাদেবকে 'উবাগীত' বলা হয়। শ্রীসলিল রায় সংগৃহীত এবং বাংলায় অনূদিত নিম্নোক্ত 'উবাগীত' গুলো জলন্ত প্রেমেব স্বাক্ষব :

॥ এক ॥

গাভুব ॥ চিগন ছবা চিগন চেই
খুঁজি ডাঙ্গবব চিগন বেই।
ছবা ছবি বিল হবো
তোব হাতব পান খিলি হিল হবো ?

যুবক ॥ নদীতে পাতা মাছ ধববাব ফাঁদ,
তোমাকে খুঁজি হৃদয়ে ধরবো বলে।
জলেব লগ্নে মাছেব আনন্দ ঢের,
আমাব খুশী তোমাব হাতেব পান।

মিলা ।। ইঁজর মাদাৎ বই চান চাগৈ,
খাদি মেলি দিয়ম পান খাগৈ ।।
যুবতী ।। ওঠানে বসে দ্যাখো পূর্ণিমার চাঁদ,
বুকের 'খাদি' সেইতো তোমার পান।

গাভুর ।। ধুন্দা বাজেই ত দি
এতক মাগিলুং ন দিলি।
যুবক ।। তোমাকে দেখে বাঁশীতে তুলি যে সুর,
এতো যে চাই দিলে না তোমার মন।

মিলা ।। শিলব কাণ্ডারা কলে ধব,
পরানে মাগিলে বলে ধব।
যুবতী ।। বাসনা যদি কৌশলে ধরো না তুমি!
এতোই সখ শক্তিতে ধরো না তুমি!

গাভুর ।। শিলব কাণ্ডাবা ডব গবে
বলে ধর্তুম লাজ গবে।
যুবক ।। কৌশলে ধরা ভয়ের অধিক জেনো,
শক্তিতে ধরা লজ্জার অধিক জেনো।

মিলা ।। মইন সবৎ খের ঝাবি
মুই যেইম বেরা ঘাজি।
যুবতী ।। গোয়াল ঘরে থাকবো কাজের ছলে,
বেড়ার পাশে আমাকে পাবে যে তুমি।

গাভুর ।। বেইল্যা নিগলো তিতি পেইক
গবাক বাজ্যেমবই নিছি রেইত।
যুবক ।। গভীর রাতে তিতির ডাকার ক্ষণে
দেখবে আমি রয়েছি গাছের নীচে।

মরদ অর কদা ।। বাঝী বেইন্যায় রু রু রু......
আগে সালাম দ্যং মর গুরু।
ভাবর পানিনে লামনি গাং
মনর কদা নি কদুং চাং।
বাঝর বাঝীরে তর গুণে
যে শুনইয়্যা তে শুনে।।

পুরুষ কণ্ঠ।। বাঁশি বাজাই রু রু রু.....
প্রথম সালাম দেই মোর গুরু।
ভাবনার পানি সে নীচে যায়
মনের কথা সে বলতে চায়।
বাঁশের বাঁশী, তোর গুণে
যে শুনতে চায় সেই শুনে।

মিলা কদা ।। ধবল্যা রঙিলা আগাজে
আনে কি কদা বাদাজে।
পুনং চানত্ মাচ্ ভরে
হাজিদুং মাজিদুং লাজ গরে।

নারীর কণ্ঠ: ধরেছে রং আকাশে
আনে কি কথা বাতাসে।
পূর্ণিমা চাঁদে মাঠ ভরে
হাসতে বলতে লাজ করে।

মরদ অর কদা ।। জল অর উর্ধ্যে গরল স্থল
বানেনে গোজেনে জীব সগল।
দিলো মিলারে কি দোল সাজ
মনত্ ক্ষুধা নে মুহত্ লাজ।

পুরুষ কণ্ঠ ।। জলের উপরে গড়ল স্থল
বানালো ঈশ্বর জীব সকল।
দিলো নারীরে কি সুন্দর সাজ
মনেতে ক্ষুধা মুখেতে লাজ।

মিলাব কদা ।। বানে গেংকুনী দুগে হে গীত,
মিলার মেইয়্যা দীঘল চিত।
পুরুষ ভংরা জাত, নানা ফুলত মন,
যিয়ত ফুলর মধু সিয়ত তগন।

নারীব কণ্ঠ ।। বানায় গায়ক সে দুঃখে গান,
নারীব প্রেম সে বুক ভরা তান;
পুরুষ ভোমরা যেন নানা ফুলে মন,
যেখানে ফুলের মধু সেখানে তখন।

মবদ অব কদা ।। গোজেন গোজেন ভজং নাং,
শুনিছ মা লক্ষ্মী শবদ নাং।
কদাব কদা নে অনর্থক,
মবে ন ভাবিচ ব্যাগব ধক।

পুরুষ কণ্ঠ ।। ঈশ্বব, ঈশ্বর; জপি নাম,
শোনো মা লক্ষ্মী, শপথ নিলাম।
কথাব কথা বা ব্যর্থ এ নয়
'আমাকে ভেবো না সবার মতন।

মিলাব কদা ।। অজল পাগর্য্যা নীজ অ ঝোপ,
দিনা দিনা পরেল্লে কলিব যুগ।
কলির যুগত সত্য নেই,
বুক চিড়ি দেগেলঅ পত্য নেই।

নারীব কণ্ঠ ।। উন্নত বটের বৃক্ষ, নীচে ঝোপ,
দিনে দিনে ঘনালো কলির যুগ।
কলি যুগে সত্য নেই,
বুক চিড়ে দেখালেও বিশ্বাস নেই।

মরদ অর কদা ।। ছড়া উজানি দোজর পোল,
মেইয়্যা জরেলং বঝর হোল।
পানি খেইয়্যা নে পনখুন
নিত্য ন যাচু মনখুন।

পুরুষ কণ্ঠ ।। নদী উজিয়ে দোসর পার
আমার এ প্রেমে বছর যায়।
স্বচ্ছ ঝিলের খাই যে পানি
ভুলতে পারি না তোমাকে জানি।

মিলার কদা ।। ধারা হরিংঅর লাম্বা খুচ
মনান জাগুলাক নপাং বুঝ।
পাড়ে পক্ষীএ চাড় বড়া
ভাঙি কলে নি সার কদা।

নারীর কণ্ঠ ।। ছুটন্ত হরিণের লম্বা লাফ,
পারি না বুঝতে, মনে বিলাপ।
পাখীর ডিমের শক্ত খোসা,
ভেঙে বলো না আসল কথা।

মরদ অর কদা ।। চিরিদ গাজৎ বোল দেগং
তবে লক্ষ্মী মুই দোল দেগং
সাক্ষী ধর্ম গোজেন নাং
কলুং তবে মুই পেরার চাং।

পুরুষ কণ্ঠ ।। মহুয়ার গাছে ফুটেছে ফুল,
তোমার রূপ-এ চোখে অতুল।
সাক্ষী ধর্ম ও ঈশ্বর নাম,
'তোমাকে চাই'—এই বললাম।

মিলার কদা ।। ধরল্যা গাজৎ নতুন বোল
আগন ছেত্তারা মতুন দোল,
ভনুন শালূত্ তান পিলা—
মবে ন কন ক্য দোল মিলা।

নারীর কণ্ঠ ।। ধরেছে গাছে নতুন ফুল
আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী আছে,
উনুনশালায় কালো সে হাড়ি,
কে বলে আমাকে সুন্দরী নারী ?

মরদ অর কদা ।। পিদলি ডাবা বৈদক অ দ্যা,
তুই দ্যা ম চোগত চদগ্যা।
চাম অ রঙত পুক পরে
মন অ রঙত না বুক ভরে।।

পুরুষ কণ্ঠ ।। পিতলের হুকো বৈঠক ঘরে জ্বলে,
আমার চোখেতে তুমি বাঁধানো হুকো ;
চামড়ার সৌন্দর্য, সে তো পোকায় কাটে
মনের রঙ কভু ভরায় না বুক।

মিলার কদা ।। কলে যে কদা মন ডাঙব,
শুনি বুগত নে বল পাঙর।
পেলুং জন মনে এই জ্বালা
মনান রাঙা মর রঙ কালা।

নারীর কণ্ঠ ।। বললে যে কথা মন খুলে,
শুনে বুকেতে পাই বল অনেক।
পেয়েছি জন্ম থেকে এই জ্বালা,
মনটা রাঙা মোর, রঙ কালো।

মরদ অর কদা ।। আগাচ কালা, চানান দোল,
জুন অ ফরঅত্, মন পাগোল।
কালা মিলার কালা দ্বিবা চোখ
মর পরান রাঙেই দ্যোক।

পুরুষ কন্ঠ ।। আকাশ কালো, চাঁদ সুন্দর,
জ্যোৎস্নার আলোকে মন পাগল,
কালো মেয়ের কালো দুই চোখ,
আমার এ প্রাণ রাঙিয়ে দিক।

মিলার কদা ।। বান অ পানিত পার ভাঙে,
দিলুং সবি মন তর নাঙে।
ঝগেইয়া হরিঙি ডর পেইয়্যা
রাখেচ জনমান তর মেইয়্যা।

নারীর কণ্ঠ ।। বন্যার পানিতে পার ভাঙে,
দিলাম সঁপে মন তব নামে।
ধর্ষিতা হরিণীর সদা ভীত মন,
রাখবো তোমাব প্রেম সারা জীবন।

মবদ অর কদা ।। মেইয়্যাত বানি মেইয়্যা থোক,
আমা ঙিয়ান মন এক্কান হোক।
মানেই জনমন অভাব দুঃখ
মন অ স্বগত ত পেবং সুখ।

পুরুষ কণ্ঠ ।। প্রেমের বাঁধনে প্রেম জেগে থাক,
আমাদের দুটি প্রাণ এক হয়ে যাক্।
মানব জন্ম মাথে অভাব ও দুখ,
মনে যদি থাকে সুখ, পাবো সুখ।

মিলাব কদা ।। বাঢ়া ডাঙর অজল বুক
তরে দেলে মন মনতু সুখ।
আব অ আগে তর মেইয়্যা মন
না চাং মানিক, রাজার ধন।

নারীর কণ্ঠ ।। সুডৌল বাহু, আর উন্নত বুক,
তোমাকে দেখলেই মনেতে সুখ।
আরও আছে তোমার মায়াবী মন,
চাই না মানিক—রাজার ধন।[২]

উপরোক্ত গানগুলো প্রতীকধর্মী এবং প্রতীকসমূহ অরণ্যের চকমকি পাথরের ঔজ্জ্বল্যে স্বভাবতঃই আমাদেরকে বিমোহিত করে। তাদের ছোটো ছোটো ভাবনা, কথা, কথাসমূহ এক একটি চকমকি পাথর; আর সুর ও নৃত্যের মাধ্যমে সেই কথার খই যখন ফুটতে থাকে তখন আরণ্য

প্রেমেব যে স্বতস্ফূর্ত আনন্দ ও সুখানুভূতিব সৃষ্টি করে তা সম্যক উপলব্ধি না করলে বুঝবার উপায় নেই।

আদিম সমাজে প্রচলিত ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, পালাগান, বারোমাসী ইত্যাদি সঙ্গীতেও যৌন-আবেগ ও প্রেম প্রচ্ছন্ন। রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায় ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী সঙ্গীতের জন্য বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংসার বিরাগী এক শ্রেণীর বাউল সাধক দৃষ্টিগোচব হয়। আঞ্চলিক ভাষায় তাদেরকে 'বাউদিয়া' বলা হয়। এই বাউদিয়াগণ বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে যে গান পরিবেশন করে তাই 'ভাওয়াইয়া' নামে খ্যাত। ভাওয়াইয়া গানে প্রেম ও বিরহ সোচ্চাব। বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুর এবং ভারতের কোচবিহার অঞ্চলে এই গানের প্রচলন অধিক মাত্রায লক্ষ্য করা যায়। ভাওয়াইয়া গান যে কেবল রাজ-বংশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এ কথা জোর করে বলা যায় না। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের সর্বত্রই ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন রয়েছে এবং সকল সম্প্রদায়ই ভাওয়াইয়া গানের ভক্ত গায়ক। নিম্নে একটি ভাওয়াইয়া গানের উল্লেখ করছি :

নদীর পারের কুরুয়া রে মোর
জামের গাছের কোরা।
আজি কেনে কান্দেন গো
চোখের জল ফেলেয়া রে।।
কোরা রে মুই ও কাদোং
চিটুল বিধুয়া হয়য়া
চাল কাউয়াটার কান্দন শুনি
মনের আগুন জ্বলে।
ওরে পতি যে মোর মরি গেইচে
আর নাইও ঘরে রে।।
ওরে কোরা রে মুইত কান্দোং
চিটুল বিধুয়া হয়য়া।।
ভাঙ্গিবে মোর মনের আশা
ভাঙ্গিবে মোর বাসা,

আজি ভরা যৌবন কেমনে রাখিম
পতিকে হারেয়া রে।।[৩]

বারোমাসী সঙ্গীতেও যৌন-স্পর্শ বর্তমান। এবং এই সঙ্গীত বিরহ সঙ্গীতেরই নামান্তর। প্রেমিকের অভাবে বিরহিনী নারীর বারোটি মাস কি করে অতিবাহিত হয় তারই পূর্ণ চিত্র বারোমাসী সঙ্গীতে স্পষ্ট। বারোমাসী সঙ্গীতের উল্লেখে চাকমা সমাজে প্রচলিত 'বির্বাবির বারোমাসী', 'শেষ্যোগা কন্যার বারোমাসী', 'রঞ্জনমালার বারোমাসী', 'তান্যাবির বারোমাসী' 'মেযাবির বারোমাসী, 'কালিন্দী রাণীর বারোমাসী' ইত্যাদির নাম করা যায়। নিম্নে 'মেযাবি' বারোমাসী থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

প্রথম বৈশাখ মাসে দেবায গর্জ্য কালা
আমারে ছাইড্যা মেযা কারে দেখ ভালা।
তুমি ছাড়িলে মেযা আমি না ছাড়িব,
রাত্রিকালে নিদ্রা গেলে স্বপনে দেখিব।।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মেযা গাছে পাকে আম
মন করে গলায কলসী বাঁধি জলে দিতাম ঝাম।
ঝম্ফ দিযা তেজেদু' বন্ধুহীন জীবন
তোমা বিনে অন্ধকার এই তিন ভুবন।।

শ্রাবণ মাসেতে মেযা ধানে হইলো খুব,
কি লাগি মোরে মেযা করহ নিঠুর।
জোযারে ভরিযা গঙ্গা—পড়ি গেল ভাটা
যৌবন ফুরাইযা গেল তোমার নাই আর আশা। ইত্যাদি।[৪]

ইতিপূর্বে উল্লেখিত চাকমা সমাজের 'উবাগীতের মতো সাঁওতাল সমাজেও যুবক-যুবতীর প্রশ্নোত্তর জাতীয় গান রয়েছে প্রচুর। গানগুলোতে শুধু যৌন-আবেগই প্রচ্ছন্ন নেই—নারীর রূপ বর্ণনাযও গানগুলো অতুলনীয়। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি গানে তার প্রমাণ মিলবে:

॥ ১ ॥

কোড়া ॥ উল বেল-এ হবমো তাম হো
বেল সিঁজো তু আ তাম হো,
নো-আ হবমো নো আ তো আ দো
ওকু-এ লাগাত কোন ?

যুবক ॥ তোমার শরীর যেন সুপক্ক আমের মতো রসাল,
তোমার স্তন দুটি যেন সুডৌল বেল ফলের বিস্ময়,
কার জন্যে তোমার এই রূপসী দেহ
কার জন্যে তোমার ওই স্তন জোড়া ?

কুড়ি ॥ না লো বাবু জাম বোর আছে
না লো বাবু জাম বাগ আছে।
নো আ হবমু নো আ তো আ দো
না আ দো আম লাগাত গে।
নো আ কাচা নো আ পাচি নো আ কদু,
তু কু এ কুচুক, উয়ো আতেত্ হো।

যুবতী ॥ হে প্রিয়তম, আমার সম্পর্কে কিছু বলো না,
হে প্রিয়তম, আমার দেহ নিয়ে আক্ষেপ করো না
আমার এই নরম শরীর
আমার এই সুডৌল স্তন
এসব কেবল তোমারই জন্য,
আমার এই স্তনাচ্ছাদন
আমার এই পাতলা কাপড়
এসব তুমি ছাড়া কে ব্যবহার করবে ?

কোড়া ॥ না লো মৌরেম যোর আছে
না লো মৌরেম বাগ আছে
নো আ কাচা, লো আ পাঁচি
নালাংগে দো লাং উয়ো আতেত্ হো।

যুবক ।।　　হে প্রেয়সী, এমন কথা তুমি বলো না।
হে প্রেয়সী এমন করে তুমি আক্ষেপ করো না।
তোমার ওই স্তনাচ্ছাদনের কোমলতা
তোমার ওই পাতলা কাপড়ের উষ্ণতা
আমরা দু'জনে ব্যবহার করবো।

।। ২ ।।

কোড়া ।।　　দেসে হিলি হো কোরাম তো আ তে
তি দো হিলি হো রাকাপ তিন মে।
যুবক ।।　　হে প্রেয়সী, আমার এ হাত দুটি তোমার স্তনের নরমে রাখো,
হে প্রেয়সী, আমার এ হাত দুটি আস্তে করে উঠিয়ে নাও।
কুড়ি ।।　　তিদো বাবু জাঁয় রাকাপ কেতামগে
পালে বাবু খা সাকোম সাদে তিন;
পালে বাবু যা পায়নি সাদে তিন,
সাপে বাবু যা দামাম বাবু জা
দাদাম বাবু যায়ে দোরা লাল।
যুবতী ।।　　হে প্রিয়তম, তোমার ওই হাত আমার বুকে রাখতে পারি,
কিন্তু যদি আমার গলার মালা ঝনঝন করে ওঠে ?
যদি আমার পায়ের খাড়ু বেজে ওঠে
শব্দ শুনে তোমার ভাই এসে কি বলবে ?
শব্দ শুনে তোমার ভাই যদি আমাকে ধবে ?
তখন কেমন হবে ?
কোড়া ।।　　বাঁদী হোরো বাঁশে হিলি হো,
সাইকা হোরো বাঁশে হিলি হো
দাদাইন হিলি হো চিনদি-এ নেলা হো ।।
যুবক ।।　　তুমি ধান নও যে কাপড়ে বাঁধা আছে,
তুমি ধান নও যে ছালায় ভরা আছে;
আমার সামনে তুমি নারী,
কেউ কিছু জানবে না, কেউ কিছু করবে না,
কেউ তোমাকে ধবরে না।'[৫]

উপরোক্ত গান দুটিতে যে শুধু নারীর রূপমাধুর্যের চিত্রটি পরিস্ফুট তাই নয়—প্রেমিক প্রেমিকার আত্ম-সমর্পণের দিকটিও লক্ষ্য করার বিষয়। তা-ছাড়া সাঁওতালদের যৌন-চেতনা সম্পর্কিত একটি ধারণাও গান দুটির অন্তরালে নিহিত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু সাঁওতাল নয়, অধিকাংশ আদিবাসীর যৌন-সম্পর্ককে খাদ্য ও পানীয়ের চেয়ে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং সে প্রেম ধারার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনাদর্শের পূর্ণরূপ।

সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিম সমাজের ঝুমুর গানও প্রেম সম্পৃক্ত। ঝুমুর গান যে শুধু সাঁওতাল ও ওরাওঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাই নয়—কুর্মী, মাহাতো, ভূমিজ, ভুইঞা প্রভৃতি আদিম সমাজেও ঝুমুর গানের প্রচলন রয়েছে। গান গুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রেম ও রূপকধর্মীতা। রূপকের মাধ্যমে প্রেমের বিকাশ গানগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বগুড়া জেলার আটাপুর থানার অধীন কদমপুর নিবাসী শ্রীকমলা মিনজী সংগৃহীত একটি ঝুমুর গানের উল্লেখ করছি :

ভালাকের মাঝে বাসাকে পিছে
ভালাকের বাসা নাহি মানায় রাজা নারীর গৈ ॥

হায় হায় রে বাসা বাড়ি
নাহি মানায় ছাড়িবে তোমারে ॥২

ভালাকের খাবার বাসাকের বাগান
হায় হায় রে দুনিয়া জুড়ি
ভালাকের বাসা বাসাকের হাটের ॥

বাসাকের হাটিরে গলায় দেয় ফাঁস রে
হায় হায় রে রাধাকৃষ্ণ
ঘর ছাড়ায় বাজায়ে বাঁশরীরে ॥২

চাওী আর দাসে বড়শীরেতে যায় রে
রজনীকে ভালোবাসে কাপড়া কাচিযারে।।২

আহায় আহায় রে বড়শী রে
মিলন হইল সোনার সোহাগায় রে।।২

মনে নে ডুকায় মারে লক্ষ টাকা বুঝায় রে
হায় হায় রে মানির রাজা নাহি মাঙ্গায়
মাঙ্গায় মারচা পোড়ারে।।২

প্রেম আর ভালোবাসা নাহি খোঁজায় রূপরে
হায় হায় রে দুধ কলা
ছেরে দিয়ে যায় শাগ ভাতরে।।২
বাসা আর আশা আশা আর বাসা
বাসা আশা দিয়ে ছায়ালা দুনিযা ভবাল গৈ।

হায় হায় রে বাসা আশা
নাহি মানায় জাত আর পাত রে।।২

উপরোক্ত গানটিতে যে প্রেমের মহিমা কীর্তিত হযেছে তা বলাই বাহুল্য। ভালোবাসার কাছে রাজা, প্রজা ধনী, দরিদ্র, হাড়ি, ডোম সব সমান। এই পৃথিবীটাই যেন ভালোবাসার বাজার। রাধাকৃষ্ণ, চণ্ডিদাস, রজকিনী প্রেমের শিকার হযে পৃথিবীতে অমর হযে আছেন। ভালোবাসার কবলে পড়ে রাজাও 'মাঙ্গার মারচা পোড়ারে' অর্থাৎ মরিচ পোড়া ভাত খেতেও কুণ্ঠিত নয়। ভালোবাসার কাছে রূপের প্রশ্ন অবাস্তব। এমনকি দুধকলা ছেড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা শাক-ভাত খেযেও খুশী। ভালোবাসা এবং কুহকিনী আশার মাযাজাল দিয়েই মানব জাতি পৃথিবীটা ভরিয়ে রেখেছে। ভালোবাসার কাছে জাতের প্রশ্ন অনুল্লেখিত।

টিপরা গানেও যৌন-আবেগ ও প্রেমের স্পর্শ বর্তমান। আদিবাসী সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আদিম-সমাজ জীব জগৎ ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীযতা অনুভব করে। সেক্ষেত্রে মানুষ, প্রকৃতি এবং জীব জগতের মধ্যে কোনো তফাৎ নির্ণয় করা যায় না। পশু-পাখী, দৈনন্দিন ব্যবহার্য

জিনিস, প্রকৃতি সবই তাদের সহচর-সহচরী হিসেবে সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়। নিম্নোদ্ধৃত টিপরা গানটিতে এর প্রমাণ মিলবে:

লখি ঐ লখি বাং সাকমা সোনা কাইন্যা মা
সাকাং হিম পাই দে ইযালুক মা ॥

দিঁগল বাই কেশর
ফাইদি থানা নো বাযা বিবি নৈ বিনাতি দেশের
গরা ডুশা গ টেত্রেমা পুরং
আনি লখি ন সব খা বুদ্ধি ফুরং
সাকাং হিম পাই দে ইযালুক মা ॥

ননদে নুং যা-খালে সৈতের
ইযাপা খোক চাক্‌যা কালাই ণ মোক্‌ তোম
বাজানি দাঁইযা
বছর থাংখালে খালি থাংখালে
আর পুনবার খানদে মাইযা
সাকাং হিম পাই দে ইযালুক মা ॥

কপাল নি চিঠি
নাওক র বাওক দিযা সুই র সুই দিযা
আ নি লখি বাং মালাইনি বিধি
আংলে ভাবি গনন নথানি তালসা
নুং তমানি উংখালে তিনি
ফুযা বাচুং নাই ফুঁযা বা থিনাই সিযাঁরো বাছা
সাকাং হিম পাই দে ইযালুক মা ॥

মানয়া খালে নন থাং গৈর বছর
দেশি ছাড়ি গৈ রাজ্য ছাড়ি গৈ
লাখিনি বাগৈ উংনান করব
সাকাং হিম পাই দে ইয়ালুক মা ॥

অনুবাদ : ওরে ও সোনার বরণ মাইয়া
আইস কইন্যা চইল্যা যাইবো
প্রেমের নাওখান বাইয়া ।।

ভাঙ্গা বাঁশের গোড়ায় বইস্যা
ঝিল্লি ডাকে থাইকা থাইকা
তেমনি কইরা কে দেয় তোরে
'ভাঙনি' কথা কইয়া ।।

তোমার লাইগা কাইন্দা মইলাম
নয়ন জলে বুক ভাসাইলাম
তুমি কইলা ওগো কইন্যা
বছর গেলেই ঘর বাঁধিবা
ভিন গেরামে যাইয়া ।।

কপাল মন্দ না হইলে কইন্যা
আশা ভাঙ্গে কি?
চান্দ ভাইবা ধইরলাম তোরে
হইলা জোনাকী।
ক্ষণে নিভ্যা ক্ষণে জ্বইল্যা
দুঃখ বাড়াইলা
অমনি কইরা অভাগ্যারে
দিওয়ানা বানাইলা ।।

আমি দেশান্তরি হইব কইন্যা
তোমার গাওয়া ভুইলা যাওয়া
বাসি গানটি গাইয়া ।।'[৬]

২৯

সঙ্গীতের মতো নৃত্যেও রয়েছে যৌন-আবেগ। আদিম সমাজের নৃত্য তাই সঙ্গীতের চেয়েও প্রাচীন। এমনকি ভাষার চেয়েও নৃত্য প্রাচীন-তার দাবী রাখে। কারণ মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখন সে নৃত্যের বৈশিষ্ট্যময় অঙ্গভঙ্গিতে প্রেম নিবেদন করতে প্রয়াস পেতো। এবং [illegible] সমগ্র বিশ্বের আদিবাসী নৃত্যের কোনোটা না কোনোটাতে যৌন-আবেগ কিংবা প্রেম নিবেদনের স্পৃহা বর্তমান।

বাংলাদেশের যে সব উপজাতীয় নৃত্যে যৌন-আবেগ লক্ষ্য করা যায় তন্মধ্যে গারোদের 'দোককরুয়া', সাঁওতালদের 'লাগরেঞ' ও কাঠি নাচের ঝুমুর এবং রাজবংশীদের বাট্টু ইত্যাদি প্রধান।

গারোদের দোককরুয়া নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে দু'জন মহিলা। এতে কোনো পুরুষের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ বা টাবু। এই নৃত্যে প্রদর্শিত হয় পায়রার প্রেম অভিনয়ের দৃশ্য এবং প্রেমিক-প্রেমিকার সোহাগ করা খাদ্য গ্রহণের রীতি। দু'জন মহিলা পায়রা-পায়রীর ভূমিকা গ্রহণ করে দু'দিক থেকে নাচতে নাচতে মুখোমুখী হয়ে প্রেম-বিনিময়ের রীতি প্রদর্শন করে এবং সেই সঙ্গে সোহাগভরা খাদ্য গ্রহণের রীতিও দেখায়। বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গী এই নৃত্যের প্রধান আকর্ষণ।

সাঁওতালদের 'লাগরেঞ নাচ' বছরের যে কোনো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে পূর্ণিমা রাত্রি এই নাচের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত। একমাত্র যুবক-যুবতীই লাগরেঞ নাচের শিল্পী। অরণ্য সংলগ্ন স্থানই এই

নৃত্যের জন্য উপযোগী। ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকড়া মাদল বাঁশী ইত্যাদির শব্দ শুনলেই যুবক যুবতীরা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয় নৃত্যের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করতে। বিশ থেকে ত্রিশ জন যুবক-যুবতী এতে অংশ গ্রহণ করে। নৃত্যে প্রত্যেকের পদক্ষেপ এবং হস্ত সঞ্চালন একই ধরণের। বৃত্তাকারে নৃত্য চলতে থাকে এবং দলের প্রথম যুবক ও যুবতীকে অনুসরণ করাই সকলের ধর্ম। বৃত্ত গঠিত হয় বাম দিক থেকে এবং যুবক ও যুবতী জোড়া অনুসারে নৃত্যের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে। আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী এই নৃত্যে দেহ সঞ্চালনের মাধ্যমে আনন্দ-স্ফূর্তি করাই লাগরেঞ নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। নৃত্য শেষে যার যার পছন্দ মতো যুবক-যুবতী জোড়া বেঁধে গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে হৃদয় বিনিময় করার জন্য। এটাই এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্যময় দিক। চারুলাল মুখার্জী বলেছেন :... Lagreng dance is a very stimulating dance and on these occassions the youths and maids of the tribe get plenty of opportunities for love-making Even the steps of the dance provide facilities for courtship, as the couples face side-ways and talk as they dance And after the dances, parties in love retire into the woods ১

'নাচনী ঝুমুর নাচ বছরের যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে উৎসব-অনুষ্ঠান কেন্দ্র করেই এই নাচের আয়োজন করা হয়। এই নাচে দর্শক ও শ্রোতাগণ বৃত্তাকারে বসে। মাঝখানে থাকে একজন গায়েন ও তিন চারজন বায়েন বা বাদ্যকর। বাদ্যকরদের ঢোল, বাঁশি, মন্দিরা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নাচনী বৈচিত্র্যময় যৌন-আবেগ উত্তেজক পোষাক পরে সেখানে প্রবেশ করেন। তার 'কালো কুচকুচে রং, সুগন্ধী তেলে জবজবা খোঁপা বাঁধা চুল। খোপাতে রুপোর পানকাটি সিঁথিতে সিঁথনী কপালে টিকলী, নাকে নোলক কানে কানপাশা, চিবুকে উল্কী, বাহুতে বাজু, হাতে চুড়, গলায় চাপাকুড়ি, কোমরে বিছে-গোট বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার, সবই প্রায় রূপোর। গায়ে সেমিজ পরণে পাতলা শাড়ী হাতে সস্তা আতর মাখানো রুমাল।' ২

ঢোলে বাড়ি পড়লেই গায়ক দেবদেবী ও আসর বন্দনা করবে গানের মাধ্যমে। নাচনেওয়ালীও হাতজোড় করে নমস্কার জানাবে সবাইকে।

অতঃপর গায়ক গাইবে ঝুমুরের সুরে গান আর নর্তকী তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচবে। গানগুলো এই ধরনের:

'আইল সখী বসন্ত সময়
না আইল আমার শ্যাম রসময়
কুথা রহিল ভুলিয়া
দিন গেলো যত বহিয়া ॥
ও গ.....রাত গেল তো চলিয়া
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া ॥
আ........আ...... .আ........

কোকিল কুহবে সারা রাতিয়া
মধুরসে রইল মাতিয়া
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া ॥
আ........আ .. ..আ........

আহা, দেশে দেশে যান বসন্ত না পান
যে দেশেতে যান, বসন্ত না পান
তাই রইলো মোরে ভুলিয়া
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া ॥
আ. ......আ .. আ........[৩]

নর্তকী মাজা বাঁকিয়ে, বুক দুলিয়ে, মাথা উঁচু করে, রুমাল নেড়ে, শরীরের বিভিন্ন কসরৎ দেখিয়ে নাচতে থাকবে আর দর্শকগণ চেঁচাবে বাহবা বাহবা বলে। এখানেই শেষ নয়, কেউ হাতে টাকা রাখবে, কেউ কপালে পয়সা আটকিয়ে রাখবে আর নর্তকীকে ডাকবে ইশারায়। নর্তকী নেচে নেচে হাত থেকে টাকা তুলে নেবে, দর্শকের কপালে কপাল ঠেকিয়ে তুলে নেবে পয়সা। এমনিভাবে চলতে থাকবে সারা রাত নাচ আর গান এবং নর্তকী নিয়ে দর্শকদের হইহুল্লোড়। ভোরবেলা ঘটবে নৃত্যের পরিসমাপ্তি।

গারো, হাজং, রাজবংশী কিম্বা গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে যে ঘাটু নাচ প্রচলিত তাতেও যৌন-আবেগ বর্তমান। ঘাটু নাচে ছেলে মেয়ের ভূমিকা

পালন করে। এই নাচে যে সব গান পরিবেশিত হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। যেমন একটি গানের কলিতে আছে:

নিহবে ভিজিলো গো শাড়ী
গামছা ক্যানে বিছাও না।......

ঘাটু নাচেও নর্তকী দর্শকদের কাছ থেকে নৃত্যের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে বখশীশ সংগ্রহ করে। এমনকী নর্তকীকে দর্শকদের কোলে বসে হাসি ঠাট্টা এবং অশুভ ইংগীত করতেও দেখা যায়। এককালে জমিদার বা ভূস্বামীদের বাড়ীতেও ঘাটু নাচের আসর বসাতে দেখা যেতো। সেক্ষেত্রে ঘাটু নাচের নর্তকী জোগাড় করা হতো বেশ্যাদের মধ্য থেকে। বর্তমানে অবশ্যি এই রীতি নজরে পড়ে না।

নৃত্য ছাড়া শিল্পকলায়ও যে যৌন আবেদনের স্পর্শ বর্তমান তা বলাই বাহুল্য। নৃত্যে যেমন অঙ্গভঙ্গী ও দেহ সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রেম নিবেদনের প্রয়াস আদিম সমাজে সংগুপ্ত ছিল তেমনি ভাষা আবিষ্কারের আগে থেকেই তারা রেখা, অঙ্কন বা চিত্রের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। কাজেই শিল্পকলাও নৃত্য বা সঙ্গীতের মতোই প্রাচীন।

বাংলাদেশের আদিম সমাজ যেমন ওরাওঁ-সাঁওতাল প্রভৃতিদের আডডাঘর ধুমকুরিয়া ও আখাড়াতে যে সব আল্পনা ও চিত্র অঙ্কিত থাকে তাদের মধ্যেও কোনো কোনোটিতে যৌন-আবেগ চিহ্নিত থাকে। আবরণ বিহীন নারীর অবয়ব, লিঙ্গ ও যোনীর প্রতিকৃতি ইত্যাদি যৌন-আবেদনেরই চিহ্ন বহন করে। ভেরিয়ার এলুইন ভারতের মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন আদিম সমাজের আডডাঘর জীবনের যে সব চিত্র সংগ্রহ করেছেন তাতেও আদিম শিল্পকলায় যৌন-আবেদনের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।[৪] পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও এই রীতির উন্মেষ বর্তমান। আফ্রিকা,[৫] আমেরিকা[৬], সাউথ সী[৭] অঞ্চলের আদিম সমাজের চিত্রকলায়ও যে প্রভূত যৌন-আবেগের স্পর্শ রয়েছে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

আদিম সমাজের যৌন-জীবন বা প্রেম-নির্ভর জীবনবৈচিত্র্য যে কতো রহস্যাবৃত এবং এর পরিধি যে কত বিচিত্র ও বিস্তৃত তা উপরের বিভিন্ন-মুখী আলোচনা থেকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টি রহস্যের উদ্‌ঘাটন যেমন সহজসাধ্য নয় তেমনি যৌন-জীবন রহস্যও অনুদঘাটনীয়।

৩০

আদিম বিশ্বাসে যেমন নারী ও প্রকৃতি বা পৃথিবী-মাতাতে কোনো তফাৎ নেই তেমনি তফাৎ নেই লিঙ্গ ও লাঙ্গলে। নারী সন্তান ধারণের ক্ষমতা রাখে এবং প্রকৃতি ক্ষমতা রাখে শস্য ও গাছ-পালা ইত্যাদি জন্মাবার। সে দৃষ্টিতে শস্যরাজি গাছ-বৃক্ষ সবই প্রকৃতির সন্তান। অনুরূপ লিঙ্গ সন্তান-সন্ততি জন্মাবার ধারক এবং লাঙ্গল উৎপাদন করতে পারে শস্যরাজি। কাজেই আদিম সমাজে লিঙ্গ ও লাঙ্গলের গুরুত্ব অপরিসীম এবং উভয়েই শ্রদ্ধার অনুষঙ্গ। অথচ উভয়ের মধ্যে রয়েছে যৌন-আবেগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচ্ছন্ন। এই যৌনতা, এমনকি আদিম সমাজের পূজা-পার্বণ এবং ব্রত-অনুষ্ঠানের মধ্যেও বিস্তৃত।

সাঁওতাল হো, মুণ্ডা, ভীল প্রভৃতি আদিম সমাজ মাঠে বীজ বোনা বা লাঙ্গল চালানোর আগে সিঁদুর ছিটিয়ে মাঠ বা ফসল ক্ষেতকে ঋতুবতী করে নেয়। ঋতুবতী করার অর্থই হলো ফসল ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন। যেমন সন্তান ধারণের ক্ষমতা অর্জন করে নারী সমাজ, ঋতুবতী হওয়ার পর। উদাহরণ স্বরূপ সাঁওতালদের সোহরাই উৎসব কেন্দ্রিক 'বাঁধনা পরব'-এর নাম করা যায়। বাঁধনা পরবের অন্ততঃ তিনদিন আগে সিঁদুর ছিটিয়ে ফসলক্ষেত ঋতুবতী করা হবে এবং উৎসবের দিন সূর্য উঠার আগেই সাঁওতাল পুরুষগণ লাঙ্গল জোয়াল-গরু নিয়ে মাঠে যাবে বীজ বোনার ভূমিকা পালন করতে। যাত্রা কালে যদি কলসী ভর্তি গর্ভবতী নারী দেখে তবে তো আনন্দের সীমা নেই— যাত্রাশুভ। প্রজনন শক্তিধারী

নারী-দর্শন সত্যি শুভ যাত্রার লক্ষণ। মাঠে গিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে উল্টোভাবে হল কর্ষণ করে ফিরে আসবে। পূর্বদিকে মুখ করার অর্থ হচ্ছে সূর্য দেবতা বা মারাং বুরোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—যাতে তাঁর দয়ায় বীজ ফলবান হয় এবং ফসল ফলে। এই উৎসবের বহু রকম নিয়ম কানুন বা আচার-আচরণের মধ্যে একটি এই যে, গরু-মোষ ধোয়াবার পর লাঙ্গল ধোযানো এবং লাঙ্গলের ফালে সিঁদুর ও তেল মাখানো অতি অবশ্য কর্তব্য। এখানে লাঙ্গলের ফালকে লিঙ্গের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার করা বা বিশ্বাস করা হয়। লাঙ্গল যে যৌনতার নামান্তর আদিম সমাজ তথা লোক সমাজের একটি গম্ভীরা গানেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :

'তুমি চাষা হয়ে কাশীবাসী কেন মহেশ্বর।
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।।
লয়ে মদনরতির লাঙ্গল-ঈষ
চাষ জুড়ছে জগদীশ;
তুমি বিষম বেগে বিপুল বিশ্ব ঘুরাও নিরন্তর।।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুকুমার
বীজ বুনানী মজুর তোমার;
কতই বীজ হয় না সুমার, ওহে গঙ্গাধর।।
তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভুগাও
বিষ্ণু দ্বারা ফসল ফলাও;
নিজে বসে ঠমক তালে ডমরু বাজাও
আর কুমরতে গান ধরো।।

উপরোক্ত গানটিতে প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বর-মহেশ্বর-জগদীশ্বর ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন তিনি কামকেলিতে মত্ত হন এবং এতে ফসল ফলে। আদিম সমাজের এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের দরুণই তাদের পূজা-পার্বন এবং উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে যৌনতার লক্ষণ স্পষ্ট।

প্রথমে সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা তথা হিন্দু সমাজের মনসা-পূজার কথাই ধরা যাক। মনসা পূজার অন্তরালে যে সাপ পূজা করা হয় সে

সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। আদিম সমাজে লোক বৃদ্ধির অভিপ্রায়েই মনসা পূজা বা সর্প পূজার আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার অবশেষ হিন্দুধর্মে এসে স্থিতিলাভ করেছে। মনসা পূজার যে ব্রতকথা তার অন্তরালেও যৌন-কাহিনী সংগুপ্ত। "প্রথম ব্রতচারিণী অর্থাৎ যাকে দিয়ে মনসাব্রতের প্রচার করা হয়েছে তাঁকে 'পোয়াতী' বা 'প্রেগনেন্ট' অবস্থায় 'পিকআপ' করা হয়েছে।

সওদাগর বাড়ীর ছোট বউ, যিনি পোয়াতী, যাঁর 'মায়ে অম্বল দিয়ে, পান্তাভাত' খাবার ইচ্ছা হওয়ার পরে যখনই স্নান করতে গেলেন তখনই তিনি স্নানের পুকুরে কতগুলো মাছ খেলা করছে দেখতে পেলেন। যেমনি দেখা, অমনি নিজের গামছা ছাঁকা দিয়ে সে মাছগুলো ধরে ফেললেন। বাড়ী ফিরে মাছগুলো একটা বড় মাটির জালার ভিতর জিইয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে মাছ কুটিবার জন্য সেই জালার সরা খুললেন অমনি দেখতে পেলেন মাছগুলো সাপ হয়ে ভাসছে। ছোট বউ অবাক। তবুও তিনি সাপদের অবহেলা না করে দুধকলা দিয়ে পুষতে লাগলেন।

সাপেরা ছোট বউয়ের আপ্যায়নে খুশী হয়ে মা মনসাকে বললেন, ছোট বউকে তাদের কাছে নিয়ে আসতে। মনসা-দেবী ছেলেদের আগ্রহে ছোট বউর মাসীর ছদ্মবেশে সওদাগর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

সওদাগর গিন্নি বললেন, কে গো বাছা তুমি, কি তোমার অভিপ্রায় ?

শাঁখা-সিঁদুর-চুপড়ী-নোয়া-নথাদি পরা মাসী-রূপিনী মনসাদেবী বললেন, 'বেয়ানঠাকুরুন, আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার ছোট বউর মাসী।'

গিন্নি বললেন, 'তা মাসী হয়েছ বেশ কথা, কিন্তু হঠাৎ আজ এখানে ?'

মনসাদেবী বললেন, 'এমনি আর কি, কখনো বোনঝিকে একটু যত্নআদি করতে পারিনি। তাই এসেছি আপনার ছোট বউমাকে কিছুদিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে যেতে। এখন যদি আপনি অনুমতি করেন তবেই সেটি সম্ভব হয়।'

গিন্নি রাসভারী ভঙ্গীতে বললেন, 'কোনোদিন তো জানতুম না ছোট বউয়ের আপনার কেউ আছে। তা তুমি যখন এতদিন পরে এসেছ, তখন নিয়ে যাও, অনুমতি দিচ্ছি।'

অনুমতি পেযে মাসী বোনঝিকে বথে চড়ালেন। রথে উঠে তিনি বললেন, 'দেখ মা, তুমি চোখ বোজ। যখন চোখ খুলতে বলবো তখন চোখ খুলবে।'

ছোট বউ মাসীব আদেশ পালন কবে বসে বইলেন। হঠাৎ মনসা দেবী চোখ খুলতে বললেন ছোট বউকে। চোখ খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক ছোট বউ। মস্তবড বাড়ী আব চমৎকাব সব আসবাব। পাশে সেই অষ্টনাগ খেলা কবছে যাদেব মৎস্য ভ্রমে ছোট বউ একদা দুধকলা দিযে পুষছিলেন।

তাবপব অনেক কথা। হঠাৎ কোনো কাবণে সাপেবা তাঁব উপর বেগে গেল, কামড়াবাব জন্য ধাওযা কবলো। মনসাদেবীব পবামর্শে তিনি বক্ষা পেলেন। তখন মনসাদেবী চুপি চুপি ছোটবউকে বললেন, 'কি জানিস, আমি তোব মাসী নই, আমি মনসা। ফনীমনসা গাছে থাকি। তুই আমাব পূজা পৃথিবীতে প্রচাব কববি। সাবা শ্রাবণ মাস ধবে আমাব মঙ্গল কাহিনী গাইবি, ব্রতকথা শুনবি। নাগ পঞ্চমী, দশহবা, ভাদ্র-সংক্রান্তিতে সিজ বা যণীমনসা গাছ এনে উনুনে আমাব প্রতীক হিসাবে রেখে পূজো কববি। এদিনে বান্না কববি না। উনুন জ্বালাবি না। শুদ্ধাচাবে বান্না পূজো কবে আমাকে পান্তাভাত সাধ দিবি। তাহলে আর কখখনো সাপেব ভয থাকবে না। সন্তানেব জন্যও কষ্ট পেতে হবে না। বন্ধ্যা হতেও হবে না। এই ব্রত যে করবে আমাব বরে ধনে জনে পূর্ণ হয়ে সে পবম সুখে দিনাতিপাত কববে।'

ছোটবউ আনুপূর্বিক সকল ঘটনা সবিস্তাবে সকলের কাছে বললেন। সবকথা শুনে সকলে তাঁব সুখ্যাতি করলেন। তিনি মনসাপূজা শুরু কবে দিলেন। যথাসময়ে ছোটবউ সুন্দব ছেলে প্রসব করলেন। পবে আরও ছেলে। ধনজন সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃত্তিশালিনী হযে উঠলেন তিনি মনসাদেবীর বরে। ক্রমে সারা দেশব্যাপী মনসার পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে চললো।'[১]

মনসাব্রতের কাহিনী এবং আচবণেব মধ্যে যে যৌন-স্পর্শ ও যাদু বিশ্বাস বর্তমান তা বলাই বাহুল্য। মনসা পূজা ছাড়াও হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজে প্রচলিত ষষ্ঠীপূজা, অম্বুবাচী ইত্যাদিতেও যৌনতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্যের দ্রব্যাদির মধ্যে যে শিলাখণ্ড বা নোড়া-পুতা থাকে তাও প্রজনন অঙ্গের প্রতীক এবং সন্তান কামনার ইষ্ট

বস্তু। এমনকি ষষ্ঠী পূজায় যে দই এর ব্যবহার করা হয় সে দইও উর্বরতার প্রতীক অথবা বীর্যের লক্ষণ। অনুরূপভাবে রাজবংশীদের হুদুমা পূজায় যে কলা অথবা ওরাওঁদের হরি-আরি পূজায় যে শশা উপচার হিসেবে প্রদান করা হয় সেই কলা এবং শশা উভয়ই পুরুষদের যৌন অঙ্গ অর্থাৎ উর্বরতার চিহ্ন। এমনকি রাজবংশী সমাজে বিবাহের পর নবদম্পতিকে যে লাঙ্গলের ফালের উপর উপবেশন করিয়ে কতকগুলো আচার পালন করা হয় তাতেও লাঙ্গলের ফালকে সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতাধারী লিঙ্গ কল্পনা করা হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে আদিম সমাজ তথা হিন্দু সমাজে অম্বুবাচী উৎসব প্রতিপালন করা হয়। আসামের কামাখ্যা মন্দিরে খাসীয়া, লাখের, মিশমী প্রভৃতি আদিম সমাজ জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনদিন যে অম্বুবাচী উৎসব পালন করে তাতে পৃথিবীমাতাকে ঋতুবতী বলে ধরে নেওয়া হয় এবং খাসীয়া ভাষায় 'কা-মেই-খা' মায়ের জলধারা থেকেই কামাখ্যা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে খাসীয়া সমাজ বিশ্বাস করে।

ভারতের উড়িষ্যা অঞ্চলে হিন্দু সমাজ এই উৎসব পালন করে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে পরবর্তী তিন দিন। এই তিন দিন হলকর্ষণ, রান্না, এমনকি কলকারখানা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। উড়িষ্যায় এই উৎসব রজোউৎসব নামে খ্যাত। কাজেই অম্বুবাচী উৎসবের অন্তরালেও যে উর্বরাশক্তি বা যৌনতা সংগুপ্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লুসাই-কুকীদের সীমপূজা, মুরংদের চম্পুয়া, চাকমাদের মহামুনি-মেলা এবং টিপরাদের কালাইয়া পূজার অন্তবালেও যৌন-প্রভাব বতমান। এসব পূজার উদ্দেশ্যই সন্তান লাভ কিংবা ফসল বৃদ্ধি। তবে চাকমাদের মহামুনি মেলা এবং মুরংদের চম্পুয়া উৎসবে ছেলেমেয়েদের প্রেম-বিনিময় এবং পলায়ন রীতি লক্ষ্যযোগ্য। তাছাড়া এইসব পূজার সঙ্গে বৃক্ষ-পূজার রীতিও জড়িত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজবংশী, ওরাওঁ সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম সমাজের সঙ্গে বৃক্ষের বিবাহজনিত সম্পর্কও বৃক্ষপূজার পরিচয় বহন করে। বৃক্ষের অন্তবালে যে দেবতা-অপদেবতার প্রভাব রয়েছে এ সম্পর্কে অন্য গ্রন্থে[২] বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অরণ্য অভ্যন্তরের বৃক্ষের অপদেবতার প্রভাবে যে নারীরা ঋতুবতী হয় এমন বিশ্বাসও আদিম সমাজে বিরল নয়। এমনকি পুরুষ সহবাস ছাড়াও বৃক্ষের পাতা বা ফল খেয়েও

যে নারীরা গর্ভবতী হতে পারে এমন বিশ্বাসও আদিম সমাজে প্রচলিত আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই টিপরা সমাজ তাদের কালাইয়া পূজার নৈবেদ্য বৃক্ষকে উৎসর্গ করে এবং পূজা শেষে নবদম্পতি বৃক্ষকে বার বার আলিঙ্গন করে। এই আলিঙ্গনের মধ্যেও যৌন-চেতনা স্পষ্ট। কারণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয়ের আর্তি বিনময় হয়—'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর,' এই ব্যাখ্যাই এখানে স্পষ্ট।

আদিম সমাজে যৌন-উত্তেজনা মূলক ব্রত-অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। ইতিপূর্বে রাজবংশীদের হুদুমা পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হুদুমা বৃষ্টির দেবতা। বৃষ্টির কামনায় যে হুদুমা পূজা অনুষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে আনন্দ-কেলির জন্য যে হুদুমা পূজা অনুষ্ঠিত হয়—দুটোর আচার-আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক। উভয় পূজায় একমাত্র মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করে। কোনো পুরুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি চার বছরের ছেলেও সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

বৃষ্টির কামনায় হুদুমা পূজা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের রাত্রিতে, অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আর আনন্দ-কেলির হুদুমা পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসের যে কোনো রাত্রিতে—লোকচক্ষুর অন্তরালে, বনে জঙ্গলে। কোথায় পূজা অনুষ্ঠিত হবে পুরুষগণ তা জানতে পারে না। রাজবংশী সমাজে সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাস আছে যে, যদি কোনো পুরুষ চুরি করে এই মেলা বা উৎসবের দৃশ্যাদি অবলোকন করে তবে সে বৃটিশ উপকথার নায়ক পিপিং টম-এর মতো অন্ধ হয়ে যাবে। অথবা দেশে এমন দুর্যোগ মহামারী দেখা দেবে যার শিকার হবে সবাই। কাজেই পুরুষগণ সম্পূর্ণ দূরে থাকে।

পূজা স্থানে পৌঁছে রাত্রির অন্ধকারে সবাই উলঙ্গ হয়। অতঃপর হুদুন দেবতার পুরুষাঙ্গের প্রতীক কলা উৎসর্গ করে পূজার সূচনা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর চলতে থাকে নাচ আর গান। নাচ ও গানের আতি-শয্যে অনেকে অচেতনও হয়ে পড়ে। সংজ্ঞা ফিরে এলে কলাগাছকে হুদুম দেবতার প্রতীক মনে করে বার বার আলিঙ্গন করে হৃদয়ের আকুতি জানায়। এমনিভাবে সারারাত চলে নাচ আর গান। ভোর হওয়ার আগেই যার যার কাপড় পরিধান করে ঘরে ফিরে।

রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান এবং ভারতের কোচ-বিহার অঞ্চলের কোচ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মদনকাম পূজাও যৌন উত্তেজনা মূলক। এই পূজাও অনুষ্ঠিত হয় মদন বা কামদেবতার উদ্দেশ্যে।' উর্বরতা শক্তির ধারক মদনদেবকে সন্তুষ্ট করে সংসারে সফলতা এবং সন্তান লাভই এই পূজার অন্তর্নিহিত রূপ। চৈত্র মাসের শুক্লাচতুর্দশী দিবসে মদনকাম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন এই পূজা চলে। নির্দিষ্ট দিনে পূজা স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রামের টিপরাদের পাড়াকোইনাই পূজার মতো রঙ-বেরঙের কাপড় পেঁচিয়ে একটি বাঁশ পোতা হয়। বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চামর। চামরের পাশে থাকে এক জোড়া শুপারি এবং একটি পান। এই বাঁশ ঘিরেই শুরু হয় তাদের পূজার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। পূজার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে "আতপ চাউলের গুড়োর সঙ্গে দুধ ও গুড় মিশিয়ে লাড়ু তৈরী করে ভোগ দেওযা হয়। পূজোয় অনেকে মানত দেন। প্রধানত: একজোড়া পায়রা মানত দেওয়া হয়। মানত দেওয়া পায়রা বলি দেয়া হয় না, ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে পায়রা উড়ে যায়। অনেকে চাল, কলা, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি সামগ্রী মানত কবে। মানতের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান। অনেক কন্যার জননী মানত করে ছেলের জন্য। এই পূজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার স্থানের কথা অনুষ্ঠানকারীরা পূর্বাহ্নেই ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠান বা মেলায় স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকাব থাকে না। মেলায় যোগদান করার জন্য লম্বা লম্বা বড় বাঁশ নিয়ে যুবকেবা সন্ধ্যা হতে না হতেই মেলা প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়। নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী, নাচ ও গান গায় তারা। নাচ ও গানের সমস্ত কিছুই দেহতত্ত্ব বিষয়ক। মেলায় মাটির তৈরী স্ত্রীলিঙ্গ, বক্ষবন্ধ, শাড়ী, ব্লাউজ প্রভৃতিও বিক্রী হয় অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে। অনুষ্ঠানকারী ছেলেবা মেলা থেকে এই সব জিনিস কিনে নেয় মেয়ে সাজতে। কবচের মত করে মাটির বা কাঠেব স্ত্রীলিঙ্গ নিজ লিঙ্গের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়, তারপর চলে নাচ ও গান।"[৩] এভাবেই চলতে থাকে তিনদিন ব্যাপী মদনকাম পূজা। অনুষ্ঠানের শেষের দিন চলে মেয়েবেশী ছেলেতে ছেলেতে আলিঙ্গন ও চুম্বন। তাছাড়া কলাগাছ ও শালগাছেব সঙ্গে আলিঙ্গন করেও হৃদয়ের উষ্ণতা জ্ঞাপন করা হয় মদনদেবকে স্মরণ করে।

আদিম সমাজ যৌন-জীবনকে দেখে পবিত্রতার দৃষ্টি দিয়ে। তাই তাদের কাছে অশ্লীল বলে কোনো জিনিস নেই। উচ্চতর সমাজ যেটাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে শ্লীলতার রূপ দেয় আদিম সমাজ সেই আবরণ রক্ষা করার শিল্প আয়ত্ত করতে পারে নি বলেই আদিম অবস্থায় আটকে আছে।

বৈদিক সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রেও স্ত্রীকে কল্পনা করা হয়েছে উর্বরতার প্রতীক ক্ষেত্র হিসেবে। সেই ক্ষেত্রে পতি বীজ বপন করে লাঙ্গলরূপ শিশ্ন দিয়ে চাষ করে।

তাহলে কোনটাকে অশ্লীল বলবো ?

তবে কি মানব জন্মটাই অশ্লীল ?

না।

'লয়ে মদন রতির লাঙ্গল-ঈষ চাষ জুড়েছে জগদীশ।' এই মন্ত্রই আরণ্য সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য

১

বাংলার লোকসাহিত্য যে সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্যও তা থেকে ভিন্ন নয়; বরঞ্চ বলা যেতে পারে আদিবাসী সাহিত্য লোক সাহিত্যের উৎসমুখ—যে উৎসমুখের স্রোতোধারা এসে লোক সাহিত্যে স্থিতিলাভ করেছে। আধুনিক মানববিজ্ঞানীরা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যেমন স্থির করেছেন যে বর্তমান মানব সমাজ আদি-বাসী সমাজ থেকেই উদ্ভূত, তেমনি আদিবাসী সাহিত্যও যে লোকসাহিত্যের জনক সে কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক জীবন কেন্দ্রিক সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্য পদবাচ্য বিষয়সমূহ—যেগুলো অলিখিত অবস্থায় মৌখিকরূপ অনুসরণ করে প্রচার লাভ করে আসছে সেগুলো যদি লোকসাহিত্যের উপকরণ বলে বিবেচিত হয় তবে আদিবাসী সাহিত্যও তাই; এবং এ ধারা লোক-সাহিত্যের প্রাচীন রূপ।

শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্যময়তাই নয়, সাংস্কৃতিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যময়তায়ও বাংলাদেশ বিশ্ববিশ্রুত। নদী-নালা, খাল-বিল বেষ্টিত বিস্তৃত এলাকাই বাংলাদেশের আসল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, সেখানে আরও রয়েছে পাহাড় পর্বত ও অরণ্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। এখানকার মানুষের মন নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী যতটা আকৃষ্ট করে তার চেয়েও বেশী আকৃষ্ট করে সেসব অঞ্চলের আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামই সর্বাধিক আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। এই জেলার উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চাকমা,

মগ, মুরং, মুরু, লুসাই, কুকি, টিপরা, তংচঙ্গ্যা, সেন্দুজ, বনজোগী ও পাংখো প্রভৃতি। তাছাড়া সিলেটের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় সংলগ্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রয়েছে খাসিয়া, মনিপুরী ও মনিপুরী-মুসলমান; ময়মনসিংহের গারো পাহাড় সংলগ্ন বিস্তৃত এলাকায় ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ের অরণ্য-ভূমিতে গারো, হাজং, পালিয়া, বুনা, হদি ও দালুই এবং রংপুর, দিনাজপুর রাজশাহী ও বগুড়া জেলার সমতলভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, হো, মুণ্ডা প্রমুখ আদিবাসী।

এদের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি তত্ত্ব-কাহিনী, পুরাকাহিনী, কথা, উপকথা, গীতিকা, সঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ বারোমাসী, পালাগান ইত্যাদি শুধু আদিবাসী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেনি; তার বৈশিষ্ট্যময় রসাত্মক ধারা বাংলার লোকসাহিত্যকেও চিরস্বগুণে মহিমান্বিত করেছে।

আদিবাসীদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যেসব কেন্দ্র করে তাদের সমাজে কাহিনী কথা, উপকথার অবতারণা নেই। পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে দেব-দেবী, আকাশ-মাটি, বৃক্ষ-লতা, নদী-নালা, পাহাড় পর্বত, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, গ্রহণ-ভূমিকম্প, জীব জন্তু, মানব মানবী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, খাদ্য পানীয়, নৃত্য গীত, আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বন প্রভৃতি সবকিছু কেন্দ্র করেই আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো কাহিনী, কথা প্রচলিত এবং এসবই আদিবাসী সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে এসব কাহিনী যতই অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক বিবেচিত হোক না কেন আদিবাসী সমাজের কাছে এসব ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পৃক্ত এবং এসবের আবেদনও মূলত ধর্মীয়। শুধু তাই নয়, এসবের সঙ্গে ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসও প্রচ্ছন্ন। আদিবাসীদের অবচেতন মনে এসব সংস্কারবদ্ধ ধারণা আছে বলেই তাদেরকে এখনও আদিমসমাজভুক্ত বলে চিহ্নিত করতে আমাদের আর কোন দ্বিধা থাকে না।

২

আদিবাসী সাহিত্যের অন্যতম শাখা এবং প্রাচীনতম ধারা অনুসারী সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক। সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাদের প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। কাহিনীগুলোর সাহিত্যমূল্য ছাড়াও যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা এই যে, তাদের মননশীল উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ক্ষমতা। যদিও এতে রয়েছে অপরিণত চিন্তাভাবনার স্পর্শ এবং অবিশ্বাস্য বিষয়বস্তুর সমাবেশ। তবে আদিম অবস্থায়ও যে তাদের মন ক্ষান্ত ছিল না এসব কাহিনী তাই প্রমাণ করে। তাছাড়া আদিবাসী সমাজের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বিচিত্র উন্মেষও কাহিনীগুলোর মধ্যে বিধৃত। আমাদের কাছে যা অশ্লীল আদিবাসী সমাজে তাই শ্লীলতার নামান্তর, আমাদের কাছে যা অবিশ্বাস্য আদিবাসী সমাজে তাই ধর্মীয় বিশ্বাস সঞ্জাত —এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যই আদিবাসী সমাজ ও সাহিত্যকে আমাদের কাছে এতটা আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাদের কল্পনা শক্তি, রসবোধ এবং লৌকিক আবেদন সার্থকতার রূপান্তর। কেননা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান ধারণাও তাতে প্রকট। বিশ্বসৃষ্টির আদিম পর্যায়ে পানির উল্লেখ আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন। সর্বপবিত্র কোরাণ, বাইবেল, বেদ, উপনিষদ, রামায়ন, মহাভারত, ত্রিপিটক প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থেও সৃষ্টির প্রারম্ভ জলমগ্ন অবস্থা বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আদিবাসী ধারণাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিবাসী ধর্মেই বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায়

জলের উল্লেখ বর্তমান। তাছাড়া বিশ্বসৃষ্টির পরেই দেবদেবী, প্রথম মানব-মানবী সৃষ্টির কাহিনীও তারা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ময়মনসিংহ জেলার গারোদের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করছি:

'আদিতে চারদিকে কেবল পানি আর পানি ছিল। কোথাও স্থলের চিহ্ন ছিল না এবং সবকিছুই অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ভগবান তাতারা রাবুগা একদিন নস্ত নুপাস্তকে স্ত্রীলোকের আকারে পৃথিবী সৃষ্টি করতে পাঠালেন। নস্ত নুপাস্ত প্রথমে মাকড়সার জালে আশ্রয় নিলেন এবং সমস্ত জলরাশির উপর সেই জাল বিস্তার করলেন। নস্ত নুপাস্তকে ভগবান কিছু বালিও দিয়েছিলেন। তিনি অজস্র জলরাশির উপর বালি ছড়িয়ে দিলেন।

তাতে কিছুই হলো না।

অতঃপর তিনি কিছু বালি মুষ্টিবদ্ধ করে পানিতে নিক্ষেপ করে বললেন: 'অনন্ত জলরাশির নীচ থেকে মাটি নিয়ে এসো।'

যথাসময়ে মাটি এসে পৌঁছলো এবং নস্ত নুপাস্ত সেই মাটি দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, যাকে গারো ভাষায় বলা হয় 'মেন পিলটি।'

পৃথিবী সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু তখনও সবকিছুই ভিজা রয়ে গেল। এবার তিনি আকাশে চন্দ্রসূর্য স্থাপন করলেন এবং মর্তে বায়ুর আবির্ভাব ঘটালেন। এই তিন দেবতার প্রচেষ্টায় পৃথিবী অল্পদিনেই মানুষের বসবাস-যোগ্য হয়ে উঠলো। অতঃপর তাতারা রাবুগা সেখানে জীবজন্তু ও প্রথম মানব মানবী শনি ও মুনিকে সৃষ্টি করলেন। এই মানব-মানবীর প্রথম সন্তান গাচেং ও দুজং। এরাই গারোদের আদি পিতামাতা নারো ও মান্দির পূর্বপুরুষ। তাছাড়া ভগবান গহীন অরণ্য ও পার্বত্যভূমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বোনজাসকো ও তার স্ত্রী জেন গান্দোকে সৃষ্টি করলেন। এ রা দু'জন অরণ্য দেবদেবী।'[১]

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতে অলৌকিক দেবদেবী সম্পর্কযুক্ত এবং ধর্মীয়ভাব সম্পৃক্ত এবং এটা আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীটিতেও বর্ণনার বৈসাদৃশ্য থাকলেও ভাবগত দিক দিয়ে কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতে বিচার করলে পৃথিবীর আদি পর্যায়েও যে প্রভূত জলের ব্যাপ্তি ছিল তার সন্ধানও পাওয়া যায়। সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীটি এইরূপ:

'পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে চারদিকে ছিল কেবল পানি আর পানি। সেই পানির গহীন অতলে ছিল মাটি। ঠাকুর জিয়ো বা ঈশ্বর সৃষ্টির ব্যগ্রতা অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করে পানির মধ্যে বিচরণের জন্য কাঁকড়া কুমীর রাঘব বোয়াল কাছিম কেঁচো ইত্যাদি জীবের আবির্ভাব ঘটালেন। এসব সৃষ্টি করে ঠাকুর জিয়ো সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাব না ঘটালে সব ব্যর্থ হবে। অতঃপর তিনি মাটি থেকে একজোড়া মানবমানবী সৃষ্টি করলেন।[২]

মানবমানবী সৃষ্টি করে যখন তিনি তাদের মধ্যে জীবাত্মা (**Life breath**) দেওয়ার মনস্থ করলেন, কিন্তু আশ্চর্য। তখন আকাশ থেকে আজব এক ঘোড়া বা সিন্ সাদ্‌ম এসে সেই মানবমানবীর মূর্তিযুগল খেয়ে ফেললো। ঠাকুর জিয়োর দুঃখের অবধি রইলো না। তিনি ঠিক করলেন যে আর কখনো তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন না। বরঞ্চ তার আগে তিনি পাখি সৃষ্টি করবেন। অতএব তিনি নিজের বুকের অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন একজোড়া পাতি হাঁস। তাদের মধ্যে তিনি দিলেন আত্মাবস্তু। এখন তারা পানির উপরে কেবল ভেসে বেড়ায়। তাদের থাকবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ইচ্ছে হলে তারা ঠাকুর জিয়োর হাতের তালুতে বসে বিশ্রাম নেয়। আকাশ থেকে আবার সেই আজব ঘোড়া বা সিন্ সাদুম এসে তাদেরকে গ্রাস করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠাকুর জিয়ো এবার সতর্ক রইলেন। তাঁর কোপে আজব ঘোড়া সমুদ্রের ফেনায় পরিণত হলো। এখন পাতি হাঁস দুটি সেই ফেনার উপরে ভাসে। কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবে? তাদের আশ্রয়ের জন্য চাই মাটি। বাঁচার জন্য চাই খাদ্য। তারা ঠাকুর জিয়োর কাছে প্রার্থনা করলো: আমরা আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই।

ঠাকুর জিয়ো কাছিমকে ডেকে পানির অতল রাজ্য থেকে মাটি আনতে বললেন। কাছিম চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

ঠাকুর জিয়ো চিংড়ি মাছকে ডেকে বললেন গহীন পানির নীচ থেকে মাটি আনার জন্য। চিংড়িও চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এভাবে রাঘব বোয়াল কাঁকড়া একে একে সবাই ব্যর্থ হলো।

এবারে ঠাকুর জিয়ো হুকুম করলেন কেঁচোকে মাটি আনবার জন্যে। কেঁচো মাটি নিয়ে এলো। মহান প্রভু ঠাকুর জিয়ো এবারে পৃথিবী

সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীতে স্থাপন করলেন পাহাড় অরণ্য পর্বত সমুদ্র সবকিছু। সেখানে পাতিহাঁস দুটি বাসা বাঁধলো। প্রকৃতির নিয়মমাফিক একদিন তারা ডিম পাড়লো। এখন পাতি হাঁসরা সাঁতার কাটে আর ডিমে তা দেয়। হঠাৎ একদিন সেই ডিম ফুটিলে দেখা গেলো সেখানে রয়েছে দুটি মানবসন্তান। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম পিল্‌চু হড়ম ও মেয়েটির নাম পিল্‌চু বুড়ী। এখন পাতি হাঁস দুটি মনের আনন্দে গান গায়ঃ

হায়ে হায়ে, জলপুরী রে
হায়ে হায়ে, নুকীন মানেবা
হায়ে হায়ে বুসার আকাঁকীন;
হায়ে হায়ে, নুকীন মানেবা ।।

হায়ে হায়ে, কুকারে দুহুকীন,
হায়ে হায়ে দুসে লাইযে বেন
হায়ে হায়ে, মাবাং ঠাকুব ভিবো।

হায়ে হায়ে, বুসাব আকাঁকীন
হায়ে হায়ে, কুর্কান মানেবা
হায়ে হায়ে, তুকারে দুহুকীন ।।

ভাবার্থ ঃ

ওহে ওহে, জলের রাজ্য রে
ওহে ওহে, মানবসন্তান রে
ওহে ওহে, তোমাদের এই জনম;
ওহে ওহে, রাখবো কোথায় বলো।

ওহে ওহে, ঠাকুরের কাছে যাও,
ওহে ওহে, তাদের আশ্রয় চাও
ওহে ওহে, পবার কাপড় চাও।
ওহে ওহে, তোমাদেব এই জনম,
ওহে ওহে, মানবসন্তান রে,
ওহে ওহে, রাখবো কোথায় বলো।

ক্রমে ক্রমে পিলচু হড়ম ও পিলচু বুড়ী বড়ো হলো। তারপর একদিন তারা হিহিড়ি পিহিড়ি দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করলো। ঠাকুর জিয়ো তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শুভদৃষ্টি রাখতে শুরু করলেন। একদিন তিনি ছদ্মবেশে মানুষের রূপ ধরে এসে তাদেরকে 'হাড়িয়া' তৈরীর সকল পন্থা বাতলিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে আরও নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে হাড়িয়া তৈরীর পর তাঁকে কিছুটা উৎসর্গ না করে যেন তারা তা স্পর্শ না করে।

হাড়িয়া তৈরী হলো। তারা তা খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে রইলো।[৩] সংজ্ঞা ফিরে এলে তারা উপলব্ধি করলো যে তারা মানব ও মানবী। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে চৈতন্য ফিরে এলে তারা দেখতে পেলো তাদের শরীর আবরণহীন। তখন তারা ভীষণ লজ্জায় পড়লো। আবার এলেন ঠাকুর জিয়ো। এবারে তিনি তাদেরকে কাপড় দিয়ে গেলেন। এই প্রথম তারা কাপড় পরতে শিখলো।

দিন গড়িয়ে চললো। এইভাবে তাদের ঘরে সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করলো। সকলের বড় ছেলের নাম সান্দ্রা ও ছোট ছেলের নাম চীতা। দুই ভাইবোনে বিয়ে হলো। এইভাবে আর আর ভাই-বোনদের মধ্যেও বিয়ে হওয়ার পর তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বংশ বৃদ্ধির দরুণ স্থানসংকুলান না হওয়ায় অতঃপর তারা চলে এলো 'খোজ-কামান' রাজ্যে।

এই খোজকামানে এসে তাদের নৈতিক চরিত্রে দেখা দিলো অবনতি। ফলে তারা পশুর মতো জীবনধারণ করতে লাগলো। ঠাকুর জিয়ো এতো রাগান্বিত হলেন। তিনি তাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী বলে জানিয়ে দিলেন। অতএব তাদের চরিত্র সংশোধন করা উচিত। কিন্তু তারা একথায় কর্ণপাত করলো না। অতঃপর ঠাকুর জিয়োর ইঙ্গিতে খোজকামানে নেমে এলো সর্বনাশা প্লাবন। একটি সাঁওতাল গানে তার উল্লেখ এইভাবে :

ই-য়ে সাইন ই-য়ে নিন্দা সংগল দগে হো
ই-য়ে সাইন-ই-য়ে নিন্দা জদম জদম হো।
তওক বে বেঁ তহা কৌন্ অ মানওয়া
ত-ওক রে বেঁ সোরো-লেন।

মেনক মেনক হরতা হো
মেনক মেনক বৃরু দন্দের হো,
নওন রঃ লিঞ তহঃ কন তা ন অলিনা দা
নক্কন রঃ লিঞ সোরা-লেন।

ভাবার্থ :

সাতদিন সাতরাত্রি ধরে কেবল আগুন আর আগুন ঝরলো
সাতদিন সাতরাত্রি ধরে কেবল আগুন ঝরলো ?
হে মানবসন্তান, তোমরা কোথায় ছিলে,
হে মানবসন্তান, কোথায় তোমরা বাস করছিলে ?
হরতা পর্বত আমাদের ছিল রে
হরতা পর্বতের গহ্বর আমাদের ছিল রে।
আমরা দুজন সেখানে ছিলাম
আমরা দুজন সেখানে বাস করছিলাম।

বন্যার কবলে পড়ে তারা সেখানে টিকে থাকতে পারলো না। অতঃপর বাধ্য হয়ে তারা চলে এলো 'সসান বেদা' নামক স্থানে। এখানে তাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন হলো, অনেকটা সুখেশান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। একটি সাঁওতাল গানে তাদের বিভিন্ন স্থান পরিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায় :

হিহিড়ি পিপিড়ি রে বং জনমলেঁ
খোজকামান রে বং খোজহেন,
হরতা রে বং হবোলেন,
সসানবেদা রে বং যাতে না হো।

ভাবার্থ :

হিহিড়ি পিপিড়ি দ্বীপে আমরা ছিলাম
খোজকামানে আমরা আশ্রয় নিয়ে ছিলাম
হরতা পর্বতে এসে আমাদের বংশ বেড়েছিল
সসানবেদাতে এসে আমরা গোত্রে বিভক্ত হই।

এখানেও তারা বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। অতঃপর 'জরপী' পার্বত্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। 'জরপী' পার্বত্য এলাকায় এসে তাদের জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে তাদেরকে বসবাসের জন্য অন্যস্থান খুঁজতে হয়। কিন্তু জরপী পার্বত্য পথ অতিক্রম করা তাদের পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তখন তারা মারাং বুরো (**The Great Mountain of the Hill-God**) দেবতার কাছে প্রার্থনা করলো: 'হে মারাং বুরো, আমাদের পক্ষে এই পথ অতিক্রম করে অন্যত্র যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। তুমি যদি আমাদেরকে পথ দেখাও তাহলে আমরা নতুন জায়গায় গিয়ে বাকী জীবন তোমার পূজো দেবো।'

মারাং বুরো তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তখন সূর্য (পরে প্রধান দেবতা) এসে তাঁর অলৌকিক জ্যোতিতে অরণ্যের মাঝখানে দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন। সেই পথ বেয়ে তারা চলে এলো চায়েচম্পা রাজ্যে। এখানে এসে তারা কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করলো।

অতঃপর এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ভারতের কোল, মুণ্ডা, হো, মুরিয়া, বিরহোর, বৈগা, গঁড় প্রভৃতি আদিবাসীদের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও বাংলাদেশের গারো, হাজং, রাজবংশী, সাঁওতাল এবং ওরাওঁদের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়। মধ্যভারতের গঁড় আদিবাসী[৪] সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীটি এইরূপ:

সর্বপ্রথমে সব কিছুই পানিতে নিমজ্জিত ছিল। ভগবান অবস্থান করতেন অনন্ত পানির উপর ভাসমান পদ্মপত্রের উপর। ভগবানের পাশে বসতেন সহদেব পণ্ডিত। তাঁর হাতে ছিল পাহাড়ের মতো বিরাট এক ধর্মগ্রন্থ।

একবার ভগবান তার শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে সেই ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন একটি কাক। অতঃপর কাককে পাঠালেন মাটির সন্ধানে। কাক ছ'মাস যাবৎ অনবরত মাটি তালাশ করেই চললো, কিন্তু না পেলো কোথাও বসবার মতো একটু জায়গা, না পেলো সামান্য খাবার কিংবা পান করার উপযুক্ত একটু পানি। কেননা, চারদিকে ছিল কেবল নোনা পানি আর পানি।

চক্রমল চত্রী নামে ছিল একটি কচ্ছপ। তার পা ছিল সমুদ্রের তলদেশে আর মাথা ছিল গগনচুম্বী। কাক গিয়ে সেই কচ্ছপের মাথায় বসলো আর কচ্ছপ চক্রমল চত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? আজ বার বছর যাবৎ আমি ক্ষুধার্ত। এবার সুযোগ পেয়েছি, আমি তোমাকে খাবো।

কাক উত্তর দিলো, ভগবান আমাকে মাটির খোঁজে পাঠিয়েছেন। সেও ছ' মাসের কথা। অথচ আজ পর্যন্ত মাটি খুঁজে পাইনি। খাদ্যপানীয়ের সঙ্গে ত দেখাই নেই। কাজেই আমিও কম ক্ষুধার্ত নই।

কারো ক্ষুধা কম নয়। চক্রমল চত্রীর মনে করুণার উদ্রেক হলো। সে বললো, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার জন্য মাটির ব্যবস্থা করছি। এ বলেই সে মাটির জন্য গহীন সমুদ্রের তলদেশে ডুবে গেল। সেখানে সে আবিষ্কার করলো যে নরকবাসী নলরাজা ও নলরাণী সে মাটি ভক্ষণ করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য-ময়তা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। প্রত্যেকটি আদিবাসী যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাস্বর তেমনি তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীও স্বতন্ত্র ভাব-কল্পনায় ব্যঞ্জনাময়। উড়িষ্যার ভুইঞা আদিবাসী সমাজের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীটি উপভোগ করবার মতো :

আদিতে স্থলের চিহ্নমাত্র ছিল না। চারদিকে কেবল পানি আর পানি ছিল। বাসুকী মাতা পদ্মপাতায় জন্মগ্রহণ করলেন। দেবতারা লক্ষ্য করলেন যে, বাসুকী মাতা ঢেউয়ের উপর কেবল এদিক ওদিক দুলছেন। দেবতারা ভাবলেন, কি করা যায়। বাসুকী মাতা চীৎকার করে জানালেন, 'বোরাম বোরহার ছেলের নাম পরিহার। তাকে হত্যা করুন। তবেই তার রক্ত ও হাড় থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হবে।'

দেবতারা ধরম দেবতার কাছে গিয়ে বাসুকী মাতার কথা বললেন। ধরম দেবতা জানালেন, 'বোরাম বোরহা আমার ছেলে। এখন আমি কি করতে পারি। তোমরা তার কাছে যাও এবং তোমাদের কথা বলো।'

তাঁরা বোরাম বোরহার কাছে গিয়ে জানালেন যে, তাদের একটি ছেলের দরকার। বোরাম রোরহা জানতেন না যে তাঁরা আসলে তাঁর ছেলেকেই

চায়। কিন্তু দেবতারা সত্যি যখন তার ছেলেকে হাতে পেলেন কিন্তু কি করে তাকে হত্যা করতে হবে এ উপায় জানতেন না। তাঁদের না ছিল কোন অস্ত্র, না ছিল কোন ছুরি যা দিয়ে সেই ছেলের দেহ খণ্ড খণ্ড করা যায়। অতঃপর তাঁরা ধরম দেবতার শরণাপন্ন হলেন।

ধরম দেবতা তাঁর শরীরের ময়লা থেকে একটি লাল রংয়ের বাঘ তৈরী করে বললেন: 'হে বাঘ, তুমি যাও এবং পরিহার যখন জলের ঘাটে যায় তখন তাকে খেয়ে ফেলো।'

বাঘ জলের ঘাটের কাছে আড়াল হয়ে লুকিয়ে রইলো। পরিহার এ কথা জানতে পেরে লোহারকে ডেকে তার জন্যে একটি লৌহ নির্মিত ধনুক ও তীর দিতে আবেদন করলো। তীর ও ধনুক নিয়ে সে বাঘ মারতে তৈরী হলো।

কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াল। সে তৃষ্ণার্ত হয়ে তীর-ধনুক রেখে যখন জল পান করতে ব্যস্ত ছিল তখন বাঘ এক লাফে তাকে ধরে ফেললো। পরিহারের চীৎকারে দেবতারা দৌড়ে এলেন ঘটনা দেখতে। ততক্ষণে বাঘ পালাল কিন্তু পরিহার মৃত্যু বরণ করলো।

দেবাতারা তাঁর দেহ বিচ্ছিন্ন করলে রক্তবিন্দু জলে পড়ে মাটি সৃষ্টি করলো, হাড় থেকে হলো সাতটি পাহাড় এবং চুল থেকে গজাল সাতটি বিরাট বৃক্ষ। অতঃপর দেবতারা লক্ষ্য করলেন, মাটি শক্ত হয়েছে কিনা; এবং তারা বৃষ্টি এবং ঝড়ের প্রার্থনা করলেন. তখন কিছু জল অতলে চলে গেল এবং শুকিয়ে গেল। দেবতারা তার উপর হাটতে শুরু করলেন। তাদের পায়ে কাদামাটি পরিষ্কার করে দূরে নিক্ষেপ করতেই তা পাহাড় এবং পর্বতে পরিণত হলো।

অতঃপর বাসুকী মাতা জলের তলদেশে প্রবেশ করে তাকে মাথায় করে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা রাখলেন পদ্মমাতায় এবং পায়ের উপর রাখলেন পৃথিবী। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন তিনি পৃথিবীতে এক পা থেকে অন্য পায়ে স্থানান্তর করেন তখনই ভূমিকম্পের সূত্রপাত হয়।[৫]

উপরোক্ত কাহিনীটিতে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন ছাড়াও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম লক্ষণ ভূমিকম্পের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটিরও সন্ধান পাওয়া যায়।

সিলেটের খাসীয়া ও মনিপুরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি, লুসাই, মুরং, পাংখো, বনজোগী, সেন্দুজ, চাকমা, মগ ও খুমীদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী এবং আদি মানব-মানবীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী ভিন্ন প্রকৃতির হলেও ঘটনা ও বিষযবস্তুতে কোথাও কোথাও মিল লক্ষিত হয।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর বগুড়া প্রভৃতি জেলার আদিবাসীদের ইতিপূর্বে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তা প্রথমেই মানব সৃষ্টি করেন নি কিংবা করলেও সে মানব অপদেবতার কোপানলে পড়েছে। পুনবায তিনি মানব সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি সেই মানব-মানবী রক্ষা করার জন্যে সতর্ক পাহারার জীবও সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া সেখানে পরীক্ষার নিমিত্ত হিসাবে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন বন্যা, প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড এমনকি আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত গারো, সাঁওতাল, গঁড় এবং ভূইঞা আদিবাসীদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতে এসব তথ্য ও তত্ত্ব স্পষ্ট। তাছাড়া সৃষ্টির প্রথম পর্যাযে পানির উল্লেখও এদের কাহিনীতে বর্তমান।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এসবের মধ্যে যতটা ক্রিযাশীল তার চেযে অনুকরণ ব্যবস্থাই বেশী প্রবল বলে মনে হয। কেননা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়ার আদিবাসী গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতিদের আদি নিবাস ছিল হয আসামে নযতো ভারতের সাঁওতাল পরগণা, রাঁচী, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে। কাজেই বাংলাদেশের এতদঞ্চলের আদিবাসীদের শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীই নয় সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য আচার-আচরণেও ভারতের আদিবাসীদের সঙ্গে প্রভূত মিল রযেছে।

ভূইঞা আদিবাসী সমাজের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতে চরম আত্মোৎসর্গরূপ 'মনুষ্য রক্ত-এর সন্ধান বাংলাদেশের ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতেও পাওযা যায। শুধু তাই নয হিন্দু ধর্মেও পৃথিবী সৃষ্টির মূলে আত্মোৎসর্গের পরিচয জীবন্ত। ঋগ্বেদের কাহিনী অনুযায়ী মহাপুরুষ-এর জন্মও দেবতাদের কর্তৃক মনুষ্যরক্ত উৎসর্গের মাধ্যমে। এই মহাপুরুষই সমস্ত সৃষ্টির আধার অথবা তিনিই সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ। তাছাড়া

সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্ত জলের উল্লেখ ঋগ্বেদের সূত্রগুলোতেও স্পষ্ট :

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে।
অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম।।
তুচ্ছ্যেনাভ পিহিতং যদাসীৎ।
তপসস্তন মহিনা জায়তৈকম।।ঋ-১০, ১২৯

আদিতে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও জলমগ্ন ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার বলে সেই একবস্তু জন্মিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ও সিলেটের উপজাতীয় অধিবাসীদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী এবং আদি মানব-মানবী সৃষ্টির কাহিনীতে ঘটনা ও বিষয়বস্তুর বৈসাদৃশ্যের কারণ এসব আদিবাসীর আসল নিবাস ছিল ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে। তাদের প্রভাবই অনেক ক্ষেত্রে এদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রকট। নিম্নে সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী ও আদি মানব মানবীর জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ করছি।

১. খাসীয়া কাহিনী

সর্বশক্তিমান উব্লাই নাংথউ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। মানবজাতির আবির্ভাব না ঘটালে পৃথিবী সৃষ্টির কোন সার্থকতা নেই। কাজেই তিনি এক জোড়া, মানব মানবী সৃষ্টি করলেন। উ ব্লাই নাংথউ পরম তৃপ্তিতে আছেন এই ভেবে যে, মানব-মানবী বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে।

কিছুদিন পর উ ব্লাই নাংথউ আসলেন তাঁর সৃষ্টির আনন্দ—মানব মানবীর খোঁজ নিতে। কিন্তু আশ্চর্য, এসে দেখেন কেউ নেই, সব শূন্য। জানতে পারলেন এক অপদেবতা তাদের গ্রাস করে ফেলেছে।

উ ব্লাই নাংথউ মহাভাবনায় পড়লেন। চিন্তা করে দেখলেন তাঁর মহাভুল হয়ে গেছে। কেননা, এ পৃথিবীতো কেবল সুখের স্থান নয়। সেখানে বিপদ আছে। দুঃখ আছে।

এবার স্থির করলেন মনুষ্য সৃষ্টির আগে তিনি এমন জীব সৃষ্টি করবেন যা মনুষ্যজাতিকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারে। তাই তিনি প্রথমে সৃষ্টি করলেন কুকুর।

আর কোন চিন্তা নেই। তিনি মনের সুখে একজোড়া মানব-মানবী সৃষ্টি করে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত রাখলেন কুকুর।

অপদেবতা আসতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। যুগল মানব-মানবী সজাগ হয়ে যায়। অপদেবতা আর তাদের গ্রাস করতে পারেনি। তাদের থেকেই খাসীয়াদের বংশ বিস্তার লাভ করে।

২. কুকী কাহিনী

সৃষ্টিকর্তা পাথিয়ান ইচ্ছা করলেন আর অমনি পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেল। পৃথিবী সৃষ্টি করেই নিরস্ত থাকলেন না। সেখানে এক জোড়া মানব-মানবী পাঠালেন বসবাস করতে।

পাথিয়ানের কী অপূর্ব খেয়াল। তিনি পৃথিবীতে এক ভীষণ বন্যার আবির্ভাব ঘটালেন। সবকিছু বন্যার জলে নিমগ্ন। শুধু বৃক্ষ চূড়া আর পাহাড়ের শীর্ষ দেশ নাক উচিয়ে আছে। আর সবখানে জল আর জল।

যুগল মানব-মানবী কি আর করবে? তারা প্রাণ রক্ষার জন্য আশ্রয় নিল বৃক্ষ চূড়ায়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখে এলাহী কাণ্ড, ম্যাজিক। তারা আর মানব-মানবী নেই—যুগল বাঘ ও বাঘিনীতে পরিণত হয়েছে।

পাথিয়ানের আবার কি অপূর্ব খেয়াল! পাহাড়ের শীর্ষ অঞ্চলের মাটির গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো এক জোড়া মানব-মানবী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চারপাশে দেখে কেবল জল আর জল। কোথায় আশ্রয় নেবে? আশ্রয় স্থান খুঁজতে খুঁজতে বৃক্ষ চূড়ার কাছে পৌঁছেই দেখে এক জোড়া বাঘ ও বাঘিনী। তারা ভয়ে আৎকে উঠলো। দৌড়ে গেল ভগবান পাথিয়ানের কাছে।

পাথিয়ান হাসলেন। বললেন, 'তোমরা বাঘ ও বাঘিনী হত্যা করো।'

তারা পাথিয়ানের নির্দেশ পালন করলো। বাঘ ও বাঘিনীকে হত্যা করে তারা বসবাস শুরু করলো। বন্যার জলও শুকিয়ে গেল। তারা

দুজনই কুকী মতে পৃথিবীর আদি মানব-মানবী।

৩. লুসাই কাহিনী

সৃষ্টিকর্তা পাথিয়ান সৃষ্টির ব্যর্থতা অনুভব করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আকারের এক ভূকম্প হলো। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হলো পৃথিবী। সেখানে তিনি স্থাপন করলেন পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, নদী-নালা, জীব-জন্তু, এককথায় সব কিছু। অতঃপর মানবজাতি। এরাই লুসাইদের আদি মানব।

পৃথিবী আস্তে আস্তে জনবহুল হলো। পাথিয়ান এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। সবাইকে চিংলুং নামক স্থানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে 'রতে গোত্রের দুইজন লোক এসে আজে বাজে গল্প শুরু করলো। পাথিয়ান ভাবলেন লোকজন বেশী হয়ে যাচ্ছে। অতএব দরজা বন্ধ করে দেয়া যাক। দরজা বন্ধ হলো।

অতঃপর এলেন দেবতা খ্যানদ্রোপা। তিনি সব লোককে ভোজ সভায় আহ্বান করলেন। সবাই আসলো। তারা সূর্য দেবতাকে বললো, 'আপনি আলো বিকীরণ বন্ধ করুন। কেননা আমাদের নৃত্য পরিচালক সা-হোয়াই এখন আমাদের নৃত্য পরিচালনা করবেন।

সূর্য দেবতা বললেন, 'ঠিক আছে।'

তখনকার দিনে সা-হোয়াই বা ভালুক সহ সকল জীবজন্তুই কথা বলতে পারতো। ইঁদুর ঢোল বাজাতে লাগলো। আর তালে তালে সবাই নাচ শুরু করলো।

আসর জমে উঠেছে। এমন সময় সূর্যদেবতা রসিকতা করে তাপের মাত্রা বাড়ালেন। প্রখর তাপে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে নাচ বন্ধ করলো। সা-হোয়াই গেলো ক্ষেপে। সে সূর্যের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলো। সা-হোয়াই এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে তার রাগের চিহ্ন এখনও তার চোখে বিদ্যমান। ভালুকের চোখ ভীষণ লাল।

ভোজের সময় পেচকের ভাগে যে মাংশ পড়েছিল ফিঙ্গে তা চালাকি করে খেয়ে ফেলে। এতে পেচক ভীষণ রেগে যায়। সেই থেকে পেচক ও ফিঙ্গের ঝগড়া লেগেই আছে।

৪. সেন্দুজ কাহিনী

পত্যেন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আকাশ এবং পৃথিবী পরস্পর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন করলো। আলিঙ্গনের ফলে হলো দারুন ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের জন্য আবির্ভাব ঘটলো পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, নদী ও সমুদ্র ইত্যাদির। অতঃপর একদিন পাহাড় শীর্ষের বিরাট এক গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো একজোড়া মানব-মানবী।

আদি মানব-মানবী সুখে বসবাস করছে। কেবল সুখ সুখ আর সুখ। পত্যেনের কি খেয়াল হলো। তিনি তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে ভীষণ এক প্লাবন দিলেন। সবকিছু বন্যার জলে ডুবে গেলো। তারা বৃক্ষ শীর্ষে আশ্রয় নিল। এই প্রথম তারা উপলব্ধি করলো দুঃখের শিহরণ।

অতঃপর তারা ভগবান পত্যেনের কাছে গিয়ে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলো দুঃখ মোচনের জন্য। পত্যেন খুশী হলেন। তিনি আদেশ করলেন আর অমনি বন্যার জল শুকিয়ে গেলো।

বৃক্ষশীর্ষ থেক নেমে তারা পাহাড় শীর্ষে বসবাস শুরু করলো।[৬]

৫. পাংখো ও বনজোগী কাহিনী

সেন্দুজদের মত পাংখো ও বনজোগীদের সৃষ্টিকর্তার নামও পত্যেন। পত্যেনের ইচ্ছায় পৃথিবী সৃষ্টি হলো। পৃথিবী ও আকাশের মিলনে অসম্ভব ভূমিকম্পের আবির্ভাব হয়; ফলে পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, গাছ-পালা জীব-জন্তুর সৃষ্টি হয়। অতঃপর পত্যেনের ইংগীতে অরণ্য গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো প্রথম মানব।

প্রথম মানব ভীষণ শক্তিশালী। নাম তেলানদ্রোপা। একবার অরণ্য অভ্যন্তরে এক হিংস্র জন্তু গযাল তাকে আক্রমণ করতে আসলে সে এক আছাড়ে সেই জন্তুটি মেরে ফেলে। ভগবান পত্যেন এতে খুশী হন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেন।

বিয়েতে খুব ধুমধাম হয়। তেলানদ্রোপা খুশী হয়ে তার ভগবান শ্বশুরকে একটি বন্দুক উপহার দেয়। সেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ এখনও বজ্রপাতের সময় শোনা যায়।

তেলানদ্রোপার বিয়ের সময় ভগবানের বাড়ী পর্যন্ত এক নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়। সেই রাস্তা নির্মাণ করতে সবাই যোগদান করে কিন্তু একদল কাজে আসে নি। ভগবানের অভিশাপে তারা উইপোকা হয়ে আছে। সূর্যের আলো পড়লেই তারা মৃত্যু বরণ করে।

সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে জীব জন্তু, পশু পাখী সবাই কথা বলতে পারতো। সবার ভাষা ছিল মাত্র একটি। এতে মানবমাত্রেরই ভীষণ অসুবিধা হলো। কেননা, জীবজন্তু শিকার করতে গেলেই তারা কাঁদাকাটি আর অনুনয়-বিনয় করত তাদের বধ না করার জন্যে।

একদিন ভগবানের কন্যা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো, 'বাবা তুমি এদের মুখের ভাষা কেড়ে নাও। নইলে আমাদের উপোসে মরতে হবে।'

ভগবান মেয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে পশু পাখী ও জীব জন্তুর মুখের ভাষা বন্ধ হলো।

একবার পৃথিবীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। অগ্নি নিভে গেলে চারদিকে অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। সব মানুষ সেই অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই থেকে বিভিন্ন গোত্র ও ভাষার সৃষ্টির হয়েছে।[৭]

৬. খুমী কাহিনী

ভগবান পুথিয়ান পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তাঁর নির্দেশে পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র সবই হলো। কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করার আগে তিনি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি একদিন মাটি দিয়ে একজন পুরুষ ও একজন রমণীর মূর্তি গড়লেন। রাত্রি বেলায় যখন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন তখন এক বিরাটকায় সাপ এসে সেই মূর্তিযুগল খেয়ে ফেললো। ভোরবেলা তিনি তো দেখে অবাক।

আবার তিনি যুগল মূর্তি গড়ে ঘুমুতে গেছেন আর রাত্রিতে সেই সাপ এসে খেয়ে ফেলেছে। তিন চার বার একই ঘটনা ঘটলো। ভগবান চিন্তায় পড়লেন। বার ঘণ্টার বেশী তিনি কাজও করতে পারেন না। রাত্রিবেলা তাকে ঘুমুতে হবেই। ঘুম শান্তির প্রতীক।

ভগবান এবার কুকুর সৃষ্টি করলেন। কুকুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পাহারার কাজে নিযুক্ত করা। অতঃপর আবার সেই যুগল মূর্তি তৈরী করে সেখানে

পাহারাদার রাখলেন কুকুর। ভগবান এবার নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন।

সেই মূর্তি যুগল খেতে সাপ আসতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর তাড়া খেয়ে সাপ পালালো। ভোর বেলা মূর্তি যুগল অক্ষত দেখে ভগবান ভীষণ খুশী। এবার তিনি তাদের প্রাণদান করলেন। ভাষা শিখালেন। পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী কথা বলতে শুরু করলো।

পুখিয়ান তাদের মহা পরীক্ষায় ফেলবেন স্থির করলেন। বিপদ না দিলে মানুষের আসল পরীক্ষা হয় না। কাজেই তিনি পৃথিবীতে মহাপ্লাবন আনলেন। প্লাবনে সব ডুবে গেলো। যুগল মানব-মানবী পড়লো বিপদে। তারা আশ্রয় নিলো বৃক্ষ চূড়ায়। বিপদে তারা ভগবানকে স্মরণ করলো। ভগবান জল শুকিয়ে নিলেন কিন্তু স্রোতোধারার চিহ্নে ছোট নদী হয়ে রইলো। এবারে এই মানব মানবী বৃক্ষচূড়া থেকে নেমে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস শুরু করলো।

সেই ধর্ম বিশ্বাস এখনও আছে। খুমীরা নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করে।

উপরে উদ্ধৃত সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীসমূহের ভাব কল্পনা ও চিত্রকল্পের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য না থাকলেও ঘটনার পারস্পর্যে কিছুটা অসংলগ্নতা নজরে পড়ে। অপরিণত চিন্তা ও অস্পষ্ট ধারণা কাহিনীগুলোতে বিধৃত থাকলেও তাদের পারিপার্শ্বিকতা উপলব্ধি করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা অত্যধিক সংস্কার প্রিয়। এই সংস্কারের জন্য এক সমাজ আর এক সমাজের আচার আচরণ তো দূরের কথা, ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীর বিষয় বস্তুতে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মিল লক্ষিত হয়। উপরে বর্ণিত সেন্দুজ এবং পাংখো ও বনজোগীদের কাহিনী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩

আদিবাসী সাহিত্যের এক বিরাট অংশ ব্যাপৃত করে রেখেছে সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী। উপরি উদ্ধৃত কাহিনী সমূহে বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রধান দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়ও বিধৃত। ভুইঞা এবং সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীতে যথাক্রমে ধরম দেবতার শরীরের ময়লা থেকে লাল রংয়ের বাঘের সৃষ্টি এবং ঠাকুর জিয়োর বুকের অংশ থেকে একজোড়া হাঁস ও হাঁসির সৃষ্টি রহস্য স্বভাবতঃই উপনিষদ, রামায়ন, মহাভারত, বিষ্ণু পুরান ও ঋগ্বেদ বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনীগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ঋগ্বেদের 'মহাপুরুষম' বা প্রাচীন ঋষি অনুভব করলেন আর অমনি বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি হলো। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসলো ব্রাহ্মণ, পা থেকে শূদ্র। অতঃপর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—এক কথায় সৃষ্টির সব কিছু। অর্থাৎ তিনিই সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ। অতএব দেখা যায়, শুধু বিশ্ব প্রকৃতি নয়, দেবদেবীর জন্ম বৃত্তান্তও কাহিনী ভিত্তিক। তবে এতে পৌরণিক কাহিনী যতটা প্রাধান্য লাভ করেছে তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে লৌকিক কাহিনী।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, 'সংস্কৃত পুরানে তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবদেবীর বিচিত্র জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা-দেশের নিজস্ব প্রকৃতি হইতে যে সকল দেবদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের জন্ম বিবরণ সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে নাই, বাংলার লোকসাহিত্যেই

আছে।'[১] উদাহরণ স্বরূপ মনসা দেবী, শীতলা দেবী ও নেতা দেবীর জন্ম বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। 'মনসা মঙ্গল' কাব্য পাঠে জানা যায়, শিববীর্য পদ্ম পাতায় পড়ে অতঃপর পদ্মের মৃণাল বেয়ে পাতাল পুরীর নাগালোকে প্রবেশ করলে সেখানে মনসার জন্ম হয়। মনসার সহচরী নেতার জন্মও শিবের মারফৎ। চণ্ডীরবাক্যে শিব মনসাকে বনবাসে দিয়ে আসেন। বনবাসে দিয়ে শিব স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরই অস্থিরতা থেকেই নেতার জন্মলাভ ঘটলো :

> ভাবিতে ভাবিতে শিবের ঘর্ম যে হইল।
> অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ঘর্মেতে জন্মিল।।
>
> কন্যা দেখি শিব বলে, 'কোথা তব ধাম।
> সত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম।।'
>
> শিব বাক্য শুনি কন্যা কহিতে লাগিল।
> 'তব ঘর্মে পিতা মম জনম হইল।।
>
> নেতা দিয়া ঘর্ম তুমি মুছিয়া ফেলিলা।
> নেতের ঘর্মেতে পিতা মোর জন্ম দিলা।।
>
> নিজ কন্যা বলি শিব যখন জানিল।
> নেতের ঘর্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল।।
>
> বস্ত্র মধ্যে জন্ম বলি বস্ত্র কার্য দিল।
> শিব বাক্যে নেতা স্বর্গ রজকিনী হইল।।[২]

উল্লেখযোগ্য যে, শিব শুধু হিন্দুদের দেবতা নন ; চাকমা, টিপরা, হাজং, হদি, বাগদী, ওরাওঁ, সাঁওতাল, কোচ প্রভৃতি আদিবাসী সংস্কৃতিতেও শিবের প্রাধান্য উল্লেখ্য। শিব শক্তির আধার। সেহেতু শিব অর্চনা এদের সবারই ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। "বাংলার লৌকিক শৈব সাহিত্যের মধ্যে কোচজাতি বিশেষতঃ ইহার নারী বা কুচনীগণ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কোচজাতি শৈবধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পর শিবকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের পূজাচার দ্বারাই তাহার পূজাচার গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোচ জাতি পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং সেই সমাজে কোচনারী বা কুচনীরাই দেবপূজা করিত ; এখনও খাসি ও শবরনারীগণ

তাহাদের সমাজস্থিত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় নিজেরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কোচ নারীরাই শিবপূজা করিত বলিয়া শিবকে কোচনারীর প্রতি আসক্ত বলিয়া কল্পনা করা হইত। সেই সূত্রেই শিবের সঙ্গে কোচ-নারীর সংস্রবের কথা বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। যেমন, মৈমনসিংহের পটুয়া সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়:

বিয়ে কুচনী পাড়া ভাঙ ধুতুরা শিবশম্ভূ খায়।
তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায়।[৩]

কোচ ও বাগদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীতেও শিবের ভূমিকা বিদ্যমান। কথিত আছে যে, 'একদা দেবী পার্বতী মৎজীবি নারীর ছদ্মবেশে শিবকে প্রলুব্ধ করেন। শিবঠাকুর যে অন্য নারীতেও আসক্ত এই কথা প্রমাণ করার জন্যই পার্বতীর এই ছদ্মবেশ। শিব যখন প্রলুব্ধ হন, তখন পার্বতী স্বমূর্তি ধারণ করে শিবকে বিপদে ফেলেন। এই মৎসজীবী নারীর গর্ভে যাদের জন্ম তাদের নাম বাগদী। সেই জন্যই বাগদীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় নির্দেশিত হলো মৎসজীবী রূপে।'

সুধীর কুমার করণের মন্তব্য থেকে আরও জানা যায়, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর বাগদী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শিব বংশ সঞ্জাত। বুড়ো শিবের পার্বতীর প্রতি আর তেমন আসক্তি নেই। তিনি কোচ পাড়ায় এসে কুচনী মেয়েদের সঙ্গেই কাল কাটান। পার্বতী ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরেন। ঈর্ষাতেই তিনি কোচদের ধানের ক্ষেত নষ্ট করে দিলেন। তারপর জেলেনীর ছদ্মবেশে শিবের কাছে এলেন। শিব ঠাকুর জেলেনীকে দেখেই ভালো-বেসে ফেললেন এবং ভালোবাসার ফলস্বরূপ এই জেলেনীর গর্ভে জন্ম নিল এক ছেলে এক মেয়ে। পরে এই ভাই বোনের বিয়ে হয় এবং এদেরই সন্তান বীর হাম্বার বিষ্ণুপুরের রাজা হয়।

বীর হাম্বারের চার মেয়ে। শান্ত, নেত্ত, মন্ত ও ক্ষেত্ত। এদের গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয় বাঁকুড়া অঞ্চলের চারটি সম্প্রদায়: তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, কুশ-মাটিয়া এবং মাটিয়া।'[৪]

শুধু হিন্দু পৌরণিক শাস্ত্র নয় আদিবাসী লোককথায়ও বিশ্বসৃষ্টি, আদি মানব মানবী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীরও উল্লেখ আছে। সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে সাত বহিন বা সপ্ত ভগিনী

দেবীর অস্তিত্ব বর্তমান। এই সাত বোনের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল নদী নালা ইত্যাদি। এঁরা আছেন বলেই পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল নদী নালা সজীব রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। এইসব দেবীর জন্ম বৃত্তান্তও কাহিনী ভিত্তিক। গল্পটি এইরূপ:

অসুরদের অত্যাচার যখন চরমে উঠলো তখন এইসব সম্প্রদায় প্রধান দেবতা সিং বোঙ্গার নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। অসুরদের দমনের জন্য অনুরোধ করলো। সিং বোঙ্গা অসুরদের দমনের জন্য বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফায়দা হলো না। শেষে তিনি এক ফন্দি আঁটিলেন। বিরাট এক চুল্লী কেটে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে কৌশলে অসুরদের এনে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। অসুরদের ধ্বংস করলেন বটে কিন্তু অসুরিণীরা অবশিষ্ট রয়ে গেল।

অসুরিণীদের চীৎকার ও অনুনয় বিনয়ে সিং বোঙ্গা অস্থির হয়ে উঠলেন। এখন কি করেন? তিনি উপায়ান্তর না দেখে তাদের বোঙ্গা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তবুও তারা প্রবোধ মানে না এবং সিং বোঙ্গাকে ছেড়ে যেতে কোনক্রমেই রাজী হয় না। শেষে সিং বোঙ্গার রাগ হলো। তিনি তাদের চুলের মুঠোর ধরে নিক্ষেপ করলেন। ফলে কেউ গিয়ে পড়লো দূরের বনে, কেউ পাহাড়ে, কেউ ঝর্ণায়, কেউ পর্বতে ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে। যে যেখানে পড়লো সে সেখানকার বোঙ্গা বা দেবী হয়ে রইলো। যে পাহাড়ে পড়লো তার নাম বুরু বোঙ্গা, যে জলে পড়লো তার নাম ইকির বোঙ্গা, যে বনে পড়লো তার নাম দেশোয়ালী বোঙ্গা, যে ঝর্ণায় পড়লো তার নাম চান্দোর ইকির বোঙ্গা, যে গহীন জঙ্গলে পড়লো তার নাম চাণ্ডী বোঙ্গা এবং যে টাড় অঞ্চলে পড়লো তার নাম নাগে বোঙ্গা। অসুর পত্নী হয়েও সিং বোঙ্গার অনুগ্রহে তারা দেবী হয়ে আছে।

সিং বোঙ্গার রাগ শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে।[৫]

অন্ধ বিশ্বাসের সত্যতাই আজ পর্যন্ত তাদেরকে অপরিবর্তিত রেখেছে। এবং এজন্যই তারা আদিম সমাজ। প্রকৃতিকে তাদের ধ্যান ধারণায় নানাভাবে উপলব্ধি করেছে। প্রকৃতির আছে আত্মাবস্তু। আত্মাবস্তু আছে বলেই প্রকৃতি সজীব এবং তার অন্তরালে একটা অদৃশ্য শক্তি ক্রিয়া করছে। এই বিশ্বাস তাদের মনে একদিকে যেমন ভয়ের উদ্রেক করেছে অপর দিকে

তেমনি শ্রদ্ধাভাবেরও উন্মেষ ঘটিয়েছে। ফলে প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুকে তারা আত্মাবস্তু এবং অন্তরালে শক্তির আধার কল্পনা করে প্রকৃতিকে তাদের পূজার উপজীব্য বলে গ্রহণ করেছে। ভয় ও শ্রদ্ধা এক সঙ্গে প্রকৃতিতে মিশে গিয়ে প্রকৃতি ভূত ডাইনী কিম্বা দেবদেবী রূপে তাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি-বাসীদেব সংস্কৃতি চর্চার কাহিনীগুলো ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন স্বাদের। বংশ কিম্বা গোত্র প্রধানদের উদ্ভব কাহিনী সমূহ আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভট, অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় মনে হলেও তাতে আদিবাসী চিন্তাধাবার প্রখরতা উপলব্ধি করবার মতো।

আদিবাসী সমাজ নিরক্ষর হলেও যে অশিক্ষিত নয় এবং তারা যে দার্শনিক মনোভঙ্গী সঞ্জাত এসব কাহিনীই সেসব কথা সপ্রমাণ করে। কুকী সমাজভুক্ত লামাং গোত্রেব পূর্ব পুরুষদের জন্মবৃত্তান্তও আদিবাসী চিন্তাধারার এক রসাত্মক নিদর্শন:

এক ছিল বিধবা। তার ছিল এক মেয়ে। রূপের জন্য সেই মেয়ে এতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো যে দেশ শুদ্ধ লোক তাকে বিয়ে করাব জন্য পাগল হয়ে গেল। এমন কি জীব জন্তুরাও তার সামনে পড়লে একটু স্থির হয়ে তাকে দেখবার জন্য থমকে দাঁড়াতো।

এক বাঘ জানতো যাদুমন্ত্র। যে মন্ত্রবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করল। তারপর বিধবার কাছে এসে বললো, 'আমি তোমার মেয়েব পাণীপ্রার্থী।

বিধবা রেগে অস্থির। সে বললো, 'তুমি কে? তোমাকে চিনি না। অজানা অচেনা লোকের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিতে পাবি না। দূর হও।

বাঘ মানুষটি অপমানিত বোধ করলো। সে মেয়েটিকে মন্ত্রবলে কুৎসিত কদাকার যুবতীতে রূপান্তরিত করল। বিধবা এখন মেয়ের দিকে তাকায় আর কাঁদে।

বিধবা ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি তার মেয়েকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। আর যদি কোন মেয়েমানুষ এই কাজ করে তাকে চিরদিনের জন্য বান্ধবী করে রাখবে।

বাঘ মানুষটিও এই ঘোষণা শুনলো। সে এবারে এক সুন্দর যুবকে পরিণত হলো। বিধবার বাড়ীতে এসে বললো, 'আমি তোমার মেয়েকে ভালো করে দিতে পারি। তবে কথার নড় চড় হবে না তো ?

বিধবা বললো, 'মেয়ে ভালো হলে তোমার মত সুন্দর যুবকের কাছে বিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'

বাঘ যুবক মেয়েকে মন্ত্রবলে ভালো করলো। তাদের বিয়ে হলো। বেশ কিছু দিন কাটলো। এবার বাঘ যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে দেশে রওয়ানা হলো। কিন্তু কি উগ্র খেয়াল। যুবক মন্ত্রবলে আবার বাঘে রূপ নিল। এই দেখে তার স্ত্রী ভয়ে সংকোচিত। সে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে আর তাব বাঘ স্বামী তাকে টেনে ধরে আছে।

ফাচিভং আর রাংচার নামে দুই ভাই তখন অরণ্যে জুম কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা এসে দেখে বাঘে আর যুবতীতে টানা টানি চলছে। দুই ভাই দা নিয়ে রুখে দাঁড়াল। বাঘের ভয়ে ভাই ফাচিভং দূরে সরে পড়ল কিন্তু রাংচার বাঘটিকে হত্যা করে মেয়েটিকে উদ্ধার করল। অতঃপর তারা বাড়ী পেঁৌছে গেল। পরে ফাচিভং এর সঙ্গে তার বিয়ে হলো। এদের থেকে লামাং গোত্রের উদ্ভব বলে কুকী সমাজ বিশ্বাস করে।[৬]

খাসীয়াদের সীম রাজবংশ সম্ভূত কাহিনীটিও চমৎকার। সীম বংশ দেববংশ নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, মারাই নামক এক গহ্বরে এক অপরূপ সুন্দরী রমণী বাস করত। নাম কা পাহ সিনটিউ। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাকে গহ্বর থেকে বের করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছে। কেননা গহ্বরের মুখ ছিল খুব ছোট। এত ছোট ছিল যে সেই মুখ দিয়ে কারো প্রবেশ কিম্বা হাত পর্যন্ত প্রবেশ করানো সম্ভব ছিল না। অথচ আশ্চর্য, কা পাহ্ সিনটিউ কিন্তু নির্বিবাদে সেই সরু মুখ দিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে বাইরে এসে ঘোরাফেরা করত।

একবার এক ধূর্ত ব্যক্তি ফন্দি আঁটলো কি করে কা পাহ্ সিনটিউকে গহ্বর থেকে বাইরে আনা যায়। সে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে জানতে পারলো যে নাগ কেশর ফুল বা উ নিউ জালিংগটেংগ তার খুব পছন্দনীয়। কেননা, সে মাঝে মাঝে বাইরে এসে নাগ কেশর ফুলের ঘ্রাণ নিত কিন্তু লোকের সাড়া পেলেই সে গহ্বরে ঢুকে পড়তো।

একবার জুম মৌসুমে মাবাই অঞ্চলে লোকের আনাগোনা থাকায় কা পাহ্ সিনটিউ আর বাইরে আসতে পারছে না। অথচ ফুলের ঘ্রাণ কিংবা বাইরের আলো বাতাসও তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ গহ্বর জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়ে ধূর্ত লোকটি উ টিউ জালিংগটেংগ নিয়ে সেই গহ্বর মুখে উপস্থিত। ফুলের ঘ্রাণ তাকে পাগল করে ফেলল। সে গহ্বর মুখে মুখ রেখে ফুলটা প্রার্থনা করলো। ধূর্ত লোকটি সহজে ফুল দেবার পাত্র নয়। সে বললো, 'যাকে সম্পূর্ণ না দেখতে পারব তাকে কি করে ফুল দেব।'

এই কথা শুনে সুন্দরী মাথা টান দিয়ে গহ্বরে লুকালো। কিন্তু ফুলের ঘ্রাণ তাকে গহ্বরে টিকতে দিচ্ছে না। সে মুহূর্তে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাইরে এসে ফুলে হাত দিতেই ধূর্ত লোকটি তার হাত ধরে ফেললো এবং টেনে নিয়ে গেল। নাগ কেশর ফুলের গাছ ঘেরা বাড়ীতে। এই শেষ নয়। ধূর্ত লোকটি কা পাহ্ সিনটিউকে বিয়ে করলো।

দিন গড়িয়ে চললো। তাদের ঘরে জন্ম নিল এক ছেলে এক মেয়ে। একদিন কা পাহ্ সিনটিউ-এর পূর্ব স্মৃতি মনে জাগলো আর অমনি সে সেই গহ্বরে ঢুকে পড়লো। সেই যে ঢুকলো আর কোনদিন বেরিয়ে আসে নি।

তার স্বামী ও ছেলে মেয়ে মিলে গহ্বর সম্মুখে কত অনুনয় বিনয় করে ডাকলো কিন্তু কোন সাড়া এলো না।

অলৌকিক ঘটনার পরিসমাপ্তি অলৌকিক ভাবেই ঘটে। দেশের রাজা আসলেন সেখানে শিকারে। তিনি অরণ্য মধ্যে অপরূপ সুন্দর ও সুন্দরী ছেলেমেয়ে দেখে তাদের কাছে টেনে নিলেন। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে সব ঘটনা জানতে পেরে রাজাও অবাক বনে গেলেন। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই তারা দেবী কন্যা পুত্র। তাদের রূপ ও গুণ রাজাকে মুগ্ধ করলো। রাজা তাদের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। এদের থেকেই সীম রাজবংশের উদ্ভব বলে খাসীয়া সমাজ বিশ্বাস পোষণ করে।

উপরিউক্ত কাহিনীটি আসামের মিকির পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে মেজর পি আর. টি. গোর্ডেন রচিত "দি খাসীস' গ্রন্থে[৭] এই কাহিনীর উল্লেখ দেখলেও বিষয়বস্তুতে কিছুটা পরিবর্তন

লক্ষ্য করেছি। একই কাহিনী অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপ দেখা গেলেও মূল বক্তব্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল লক্ষিত হয়। তাছাড়া পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আদিবাসী সমাজে যে সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক বিবর্তন ধারায় এসে তার কিছুটা পরিবর্তন স্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা ও বিরোহোর আদিবাসীদের করম উৎসব সম্পর্কিত করম রাজার কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। অঞ্চল এবং আদিবাসীভেদে কাহিনীটির বক্তব্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল বক্তব্য এক। সাঁওতালদের মতে কাহিনীটি এইরূপঃ

দুই ভাই। করম আর ধরম। লোকে ডাকে কর্মু আর ধর্মু বলে। কর্মু চাষ আবাদ করে খায়। ধর্মু ব্যবসায় মেতে থাকে। দু'জন পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে। পৃথক অন্নে খায়। একদিন কর্মু খুব ঘটা করে বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করলো। ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি। উৎসবের সময়। কিন্তু পাশাপাশি বাড়ীতে ধুমধামের সঙ্গে উৎসব হচ্ছে অথচ কর্মু তার ভাই ধর্মুকে নিমন্ত্রণ করলো না।

ধর্মুও কম যায় কিসে। ব্যবসায়ী লোক। লক্ষ্মী তার ঘরে বাধা। সেও একদিন খুব ঘটা করে বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করলো অথচ কর্মুকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাল না।

কর্মু আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান। দেবতা। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। অন্য মূর্তিতে রূপ নিলেন। কিন্তু সরাসরি উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে তার সংকোচ। অতএব আত্মগোপন করে রইলেন খিড়কী দরজার পাশে।

ধর্মুর বাড়ীতে তখন ভাত রাঁধা হচ্ছে অতিথি ভোজের জন্য। রাতের অন্ধকারে ভাতের ফেন ছুঁড়ে মারলেন ধর্ম। কিন্তু সেই গরম ফেন গিয়ে পড়লো কর্ম দেবতার গায়ে। দগ্ধীভূত হয়ে গেল সারা গা। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কর্ম চলে গেলেন কাঁসাই নদীর ধারে গঙ্গার শীতল জলে। যন্ত্রণার উপশম করতে।

কর্মুর অভিশাপে ধর্মু নিঃস্ব হলো। বিধাতার পরিহাস ধর্মু সবকিছু হারিয়ে কর্মুর গৃহকাজে লেগে গেল। অনেক দুঃখ কষ্টের পর ধর্মু কর্মুর

কৃপালাভ করলো। দুই ভাইয়ের মিলন হলো। করম শাখা তুলে দুই ভাই শপথ করলো :

আমার করম
ভায়ের ধরম।[৮]

উপরে বর্ণিত কাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে গূঢ় অর্থ এই দাড়ায় যে প্রত্যেকটি কাহিনীর এক বা একাধিক মটিফ বা মৌলিক উদ্দিষ্ট বিষয় আছে। সে মৌলিক বিষয়টি নীতিকথা হতে পারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হতে পারে কিংবা একটা সত্য প্রতিষ্ঠা করবার পেছনে কতকগুলো যুক্তির স্তম্ভ দাড় করানোও যেতে পারে। আসল মটিফ ঠিক রেখে গল্পের বহিরাঙ্গ বর্ণনায় নতুন নতুন রূপের বিন্যাস উপলক্ষ মাত্র। প্রাণকেন্দ্র ঠিক রেখে এসব কাহিনীর বহিরাঙ্গের রূপান্তর অঞ্চলভেদে, জাতিভেদে দৃষ্টিগোচর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৪

আদিবাসী সংস্কৃতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব, আদি মানব মানবী কিম্বা দেব দেবীর জন্ম বৃত্তান্তের পরে সৌর জগতের দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্ঘাটন সম্পর্কিত কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। আদিবাসী সমাজ মাত্রই প্রকৃতির পূজারী—ইংরেজীতে যাকে এ্যানিমিজম বলা হয়। বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টির মূলে যেমন রয়েছে একটা অসীম শক্তির প্রাবল্য তেমনি সেই শক্তির স্ফুরণ তারা উপলব্ধি করে প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুর অন্তরালে। তাই প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তু কখনো ভয় কিংবা কখনো শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাদের ধর্মে, পূজায়, আচার আচরণে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভয়ের কথা এই জন্যে বলছি যে, ভূত প্রেত, ডাইন ডাইনী ঝড় প্লাবন ইত্যাদি শুধু ভীতিপ্রদ অবস্থায় তাদের কাছে দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে অপদেবতার কোপানলের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে। তাই অপদেবতাকে তুষ্ট রাখার জন্য তাদের প্রয়াসই ধর্মাশ্রিত বিশ্বাসে রূপলাভ করেছে এবং এসবের অন্তরালের রহস্য উদ্ঘাটনে তাদের কাহিনী সৃষ্টিরও শেষ নেই।

অপর পক্ষে শ্রদ্ধার কথা এই জন্যে বলছি যে, প্রকৃতি তাদের এমন উপকারে লেগেছে যে তখন তারা খুশীতে প্রকৃতির কাছে শ্রদ্ধায় অবণত হয়েছে এবং এই শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মাচার বা ধর্মবিশ্বাস হিসেবে অপরিবর্তিত রয়েছে। এসব কারণে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ মাটি তাদের দেবতার আসনে স্থান পেয়েছে। এমনকি এসবের সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের ধ্যান ধারণা এক একটা জ্বলন্ত মটিফ নিয়ে চির-জাগরূক রয়েছে।

চন্দ্র ও সূর্য আদিবাসী সমাজে দেবতার আসনে আসীন। এজন্যে চন্দ্র সূর্য কেন্দ্র করে তাদের পূজা পার্বন এবং আচার অনুষ্ঠানেরও অন্ত নেই। কেউ বলছে এরা ভাই বোন, কেউ বলছে স্বামী স্ত্রী কিংবা কেউ বলছে এরা দুই ভাই। কাজেই এদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত।

বাংলাদেশ ও আসামের খাসীয়া, আংগামী নাগা, সেমা নাগা, দফলা ও লাখের প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণায় সূর্য রমণী এবং চন্দ্র পুরুষ অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী।[১] কিন্তু আসামের আবর, মিরি, মিশমী ও মিকির প্রভৃতি আদিবাসীর ধারণা ভিন্ন রূপ। তারা সূর্যকে পুরুষ এবং চন্দ্রকে রমণী বলে স্বীকার করে।[২] একই বিশ্বাস সাঁওতাল সমাজও পোষণ করে। তাদের মতে সিং চান্দো অর্থাৎ সূর্য হলো চান্দো বা চন্দ্রের স্বামী।[৩]

আবার মধ্যপ্রদেশের ভুইঞা আদিবাসী সূর্যকে বড় ভাই এবং চন্দ্রকে ছোট ভাই বলে বিশ্বাস পোষণ করে। এক্ষেত্রে দু'জনই পুরুষ। অথচ তারকাকে তারা চন্দ্রের কন্যারাজি বলে স্বীকার করে।[৪] একই সঙ্গে খাসীয়া আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে সূর্য ও চন্দ্র স্বামী স্ত্রী এবং তারকা রাজি তাদের সন্তান সন্ততি।[৫] বিরহোর ও গারো সমাজ মনে করে সূর্য ও চন্দ্র দুইজন ভাই আর বোন।[৬] নিম্নে কয়েকটি চন্দ্র ও সূর্য সম্পর্কিত আদিবাসী ধারণার উল্লেখ করছি:

১. গারো কাহিনী

ভগবান তাতারা রাবুগা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ভিজা রয়ে গেছে মনে করে শুকাবার জন্যে আসিমা দিংগসীমার পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে বেঙ্গরা বলসা বা সূর্য ও রীরে জিতজে বা চন্দ্র কে স্থাপন করেন। কাজেই সূর্য ও চন্দ্র ভাই আর বোন।

চন্দ্র ছিল খুব সুন্দরী। তার ভাই থেকে অনেক উজ্জল। ভাই বোনের রূপলাবণ্য দেখে হিংসায় জ্বলে মরতো। একদা তাদের মা তাদের বাড়ীতে রেখে বাইরে গিয়েছে কোন কাজ উপলক্ষে। তখন তারা ঝগড়া শুরু করেছে। ভাই রাগ করে মুঠি ভরা কাদা বোনের মুখে লেপে দিয়েছে। বোন কাদা না ধুয়ে মাকে দেখাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। মা বাড়ীতে

আসতেই চন্দ্র মুখে কাদাসহ মারে দেখিয়ে ভাইদের কীর্তির ব্যাখ্যা করলো। মা এতে খুশী হতে পারলেন না। বরঞ্চ কাদা না ধোয়ার জন্য চন্দ্রকে গালাগালি দিলেন এবং অভিশাপ দিলেন যে তার মুখ যেন চিরদিনই এমনি কাদাযুক্ত থাকে।

সেই থেকে চাঁদে কলঙ্ক এবং সূর্যের চেয়ে অনেক কম আলোর অধিকারিণী।[৭]

২. ওরাও কাহিনী

আদিকালে সূর্যেরা ছিল সাত ভাই। চন্দ্রের কাছে অভিযোগ উঠলো যে, সূর্যদের তাপে পৃথিবী গলে যাচ্ছে। কাজেই সূর্যের এই তীক্ষ্ণ তাপ কমানো দরকার। চন্দ্র সূর্যের সম্মুখে বেলফল খাওয়া শুরু করল। সূর্য তার ভগ্নি চন্দ্রের কাছে বললো, 'কি তুমি দৈনিক এত মজা সহকারে কি খাও? আমাকে কি একটা দিতে পারো?

চন্দ্র উত্তর দিল, 'আমি আমার নিজের সন্তান তারকাদের একটা করে খাই। এবং খেতে ভারি মজা। তুমিও যদি তোমার সূর্য ভাইদের মাংস সিদ্ধ করে খাও তবে এরকমই মজা পাবে।'

চন্দ্রের কথা মত সূর্য তার বাকী ছয় ভাইকে হত্যা করল। তাদের মাংস সিদ্ধ করে খেতে গিয়ে দেখে কেমন বিশ্রী গন্ধ। তার বুঝতে বাকী রইলো না যে তার বোন তাকে প্রতারণা করেছে। সে ক্ষিপ্ত হয়ে তরবারী নিয়ে তার বোন চন্দ্রকে হত্যার অভিপ্রায়ে আঘাত করতেই চন্দ্র এক কলাগাছের মধ্যে পালাল পালাল বটে কিন্তু তরবারির আঘাতে তার শরীরের কিছু অংশ কেটে গেল। সেই থেকে চন্দ্র আর সূর্যের সঙ্গে দেখা হয় না। পৃথিবীতে এক সূর্য বর্তমান রইলো। চন্দ্রের শরীরের কিছু অংশ কেটে গিয়েছিল বলে এখনও চন্দ্রের গায়ে কলঙ্ক বিদ্যমান। সূর্যের রাগ এখনও থামেনি বলে সে মাঝে মাঝে চন্দ্রকে আক্রমণ করে ফলে চন্দ্র গ্রহণের সৃষ্টি হয়।[৮]

বাংলাদেশের ওরাও সমাজে চন্দ্র সূর্য সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে উপরে বর্ণিত কাহিনীর যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কাহিনীটি বরঞ্চ সাঁওতাল বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। ওরাওঁ কাহিনীতে চন্দ্র

আসলে বেল ফল খাচ্ছে কিন্তু সবকে প্রতারণা স্বরূপ বলছে যে, সে তার আপন সন্তান-সন্ততি তারকারাজিকে খাচ্ছে। সাওতাল কাহিনীতে জানা যায় উজ্জ্বল তারকাগুলো ছিল সূর্যের, আর ছোট ছোট কম আলো বিশিষ্ট তারকাগুলো ছিল চন্দ্রের সন্তান। চন্দ্রের প্রতারণায় সূর্য তার আপন সন্তান খেতে বাধ্য হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে তারকার সংখ্যা নিঃশেষ হয়। নইলে আকাশে দিনের বেলায়ও তারকার প্রকাশ নজরে পড়তো।

সে যাহোক, নিম্নের ওরাওঁ কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের তা তার বিষয়বস্তু থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। কাহিনীটি সংগ্রহ করেছি দিনাজপুর জেলার বিরল নিবাসী বৃদ্ধ বুধু লাকরার মহাশয়ের কাছ থেকে কাহিনীটি এইরূপ :

পরমেশ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেখানে চন্দ্র সূর্য নেই। অন্য সবকিছু আছে। আকাশ আর মাটি খুব কাছাকাছি। তারা স্বামী আর স্ত্রী। আকাশ এত নীচে যে মানুষ চলাফেরা করতে মাথা ঠেকে। মানুষ খুব ছোট। তারা ইঁদুর দিয়ে চাষ আবাদ করে।

মানুষ কি এক অন্যায় করলো। আকাশ উপরে উঠে গেলো। চলাফেরার সুবিধা হলো বটে কিন্তু সব অন্ধকার। চন্দ্র নেই। সূর্য নেই। তারকা নেই।

অবশ্য ছিল এক মহুয়া গাছ। সেই গাছে ফুল ফুটতো। ফুল ফুটলেই পৃথিবী আলোকিত হতো। তখন দিন। ফুল শুকিয়ে গেলেই অন্ধকার। তখন রাত্রি।

ফুলও নিয়মিত ফোটে না। ভারি অসুবিধা। গাছটাই যেন অন্ধকারের রাজা। জীবন ধারণের জন্য আলো চাই।

সবাই ভাবলো, গাছটাই কেটে ফেলা যাক। কেটে ফেললেই বরাবর আলো আসবে। সবাই লেগে গেল গাছ কাটতে। কিন্তু গাছ এত বড় যে গাছ কাটতে দীর্ঘ দিন চলে গেল। শেষে গাছ কাটা হয়ে গেল বটে কিন্তু তা মাটিতে পড়ছে না। কী আশ্চর্য! গাছের গোড়া কাটা অথচ পড়ে না। কী ব্যাপার!

তারা আবিষ্কার করলো যে গাছের আগায় চিলের বাসা। দৈববাণী শুনলো, চিল না মারলে গাছ পড়বে না। কুঠারের আঘাতে তারা চিল মারলো। আর অমনি ধপাস করে গাছ মাটিতে পড়লো।

গাছ পড়ার শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠলো। দেশের রাজা চমকে উঠলেন। তিনি ভাবলেন নিশ্চয় কেউ রাজ্য আক্রমণ করেছে। রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে দেখেন একদল লোক বনের বড় মহুয়া গাছ কেটে ফেলেছে। রাজা আদেশ করলেন, 'ওদের ধরে এনে শাস্তি দাও।'

গাছ-কাটা দলের সর্দার বললো, 'আমরা কোনো অন্যায় করিনি। পৃথিবীতে আলো আসে না বলে আমরা গাছ কেটেছি।'

রাজা শুনলেন না সেই কথা। সৈন্যদের আদেশ করলেন তাদের শাস্তি দিতে। দুই দলে চলল ঘোরতর যুদ্ধ। রাজার সৈন্যদল নিঃশেষ। সর্দার তার দল নিয়ে গাছ আগলে আছে। গাছ তখন রাজার সৈন্য সামন্তের রক্তে রঞ্জিত। তারা গাছটাকে দুই ভাগে ভাগ করলো।

গাছের নীচের অংশ সূর্য আর উপরের অংশ চন্দ্র। সূর্যের অংশ বড়। চন্দ্রের অংশ ছোট। এইসব কল্পনা করে তারা বসে আছে। কেবল বসে থাকলে চলে না। এদের জীবন দান করতে হবে। নইলে সব ব্যর্থ।

হঠাৎ দৈব বাণী এলো। মনুষ্য রক্ত না হলে চন্দ্র সূর্য জীবন পাবে না। এখন কী করা যায়। মনুষ্য রক্ত দরকার।

সেই দেশে ছিল এক চাষী। তার ছিল একমাত্র সন্তান। চাষী গেছে মাঠে কাজ করতে। তার স্ত্রী গেছে নদীতে জল আনতে। ছেলেটি বাড়ীতে একা।

দলের সর্দার সুযোগ বুঝে ছেলেটিকে চুরি করে আনলো। তাকে হত্যা করে তার রক্ত দিল গাছের দুই অংশে। রক্ত পেয়েই তারা জীবন পেলো। আকাশে উঠে গেল।

সূর্য পুরুষ। সে বেশী রক্ত পান করেছিল বলে তেজী। লাল।
চন্দ্র রমণী। সে কম রক্ত পান করেছিল বলে স্নিগ্ধ। সাদা।

৩. খাসীয়া কাহিনী

চন্দ্র তার বোন সূর্যকে বিয়ে করার জন্য পাগল হলো। সূর্য তার আপন ভাই চন্দ্রের অঙ্কশায়িনী হবে এ চিন্তা করতেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে রাগ করে এক মুঠো ছাই চন্দ্রের মুখে নিক্ষেপ করলো। ফলে চন্দ্রের আলো ক্ষীণ হলো এবং তার গায়ে কলঙ্কের চিহ্ন অঙ্কিত হলো। সেই থেকে চন্দ্র দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে সূর্য তাকে দেখবে বলে। সূর্যও আর তার ভাই চন্দ্রের মুখ দেখে না।

আসামের গৌহাটি জেলাস্থ কৃষ্ণাই অঞ্চল থেকে এ কাহিনী সংগ্রহ করেছি বছর কয়েক আগে। কিন্তু পি. আর. টি. গোর্ডন[১] সংগৃহীত কাহিনীর সঙ্গে উপরিউক্ত কাহিনীর মূল বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য থাকলেও কাহিনীর বহিরাঙ্গ নির্মাণে একটু তফাৎ আছে।

আদি কালে এক রমনীর চারটি সন্তান ছিল। তিন মেয়ে এক ছেলে। তাদের নাম কা সৃীগি (সূর্য), কা উম (জল), কা দিগ (অগ্নি) এবং উ বিনাই (চন্দ্র)। উ বিনাই (চন্দ্র) ছিল বদমাস ধরণের। সে তার বড় বোন কা সৃীগির (সূর্য) সঙ্গে প্রেম-কৌতুকে মত্ত হলো। প্রথম অবস্থায় সূর্যের মতোই আলোর দীপ্ত ছিল। কিন্তু যখন সূর্য তার ছোট ভাই চন্দ্রের দুষ্ট অভিসন্ধি টের পেলো তখন সে ভীষণ ক্ষেপে গেলো।

সে কিছু ছাই মুঠিবদ্ধ করে ছোট ভাই চন্দ্রকে বললো: 'আমি তোমার বড় বোন, মায়ের মতন তোমাকে কোলে কাঁখে করে লালন পালন করেছি অথচ তুমি কিনা আমাকে বিয়ে করতে চাও। নির্লজ্জ কোথাকার? দূর হও এখান থেকে।' এই বলে মুঠিবদ্ধ ছাই সে চন্দ্রের মুখে নিক্ষেপ করলো।

চন্দ্র লজ্জায় পালিয়ে গেল। সেদিন থেকে চন্দ্র তার সূর্যের মতো জ্যোতি হারাল এবং সূর্যের মতো তার দাহগুণ কমে গেল। সেই থেকে পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের গায়ে যে কলঙ্কচিহ্ন দেখা যায় তা সূর্যের সেই ছাইয়ের প্রকাশ।

উবিনাই (চন্দ্র) চলে গেলো কিন্তু তিনবোন সূর্য, জল ও অগ্নি রয়ে গেল। তারাই তার মাকে দেখাশুনা করতে থাকলো।

চন্দ্র সূর্য সম্পর্কিত আরও অনেক কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। বাংলার লোকসাহিত্যেও এরূপ কাহিনী বিরল নয়। তবে সেসব কাহিনীতে আদিবাসী সমাজেরই প্রভাব প্রচ্ছন্ন কিনা তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ। নিম্নে টাঙ্গাইল জেলার বলরামপুর থেকে সংগৃহীত কাহিনীটিতে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান।

চন্দ্র ও সূর্য ছিল দুই ভাই। দুই ভাই এক বিয়ের নিমন্ত্রণ গেলো। যাওয়ার সময় তাদের মা চুপ করে বলে দিলেন যে, তারা যেন তাদের মায়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে।

সূর্য ছিল খুব লোভী। সে মায়ের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের উদর পূর্তি করল। কিন্তু চন্দ্র ছিল মাতৃভক্ত। সে মায়ের কথা ভুলতে পারে নি। তাই নখের আড়ালে করে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য মায়ের জন্য নিয়ে এলো।

মা চন্দ্রের ব্যবহারে খুশী হলেন এবং এই বলে দোয়া করলেন, 'তুমি শান্তিতে থাকবে এবং সবাই তোমাকে সম্মান করবে।'

সেই থেকে চাঁদের আলো স্নিগ্ধ, শান্তির প্রতীক। এবং প্রতি মাসে নতুন চাঁদের মুখ দেখলেই তাকে সবাই সালাম জ্ঞাপন করে।

আর সূর্য তার মায়ের অভিশাপে পেল তপ্ত কিরণ এবং সকাল বেলা ঝাটা দর্শন সূর্যের নিত্য নৈমিত্তিক ভাগ্য।

উপরিউক্ত কাহিনীর সঙ্গে আর ভি রাসেল ও হীরালাল সংগৃহীত ভারতের মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের চন্দ্র সূর্য সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উপরে বর্ণিত কাহিনীতে যে সংস্কারবদ্ধ ধারণা বিদ্যমান তা বাদ দিলে গল্পটি অপরটির পরিপূরক। সংস্কারবদ্ধ ধারণা এই, সকালে সূর্যের আলো পড়তেই উঠোন আঙ্গিনা ঝাড় দিতে হবে নইলে বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকবে না। এবং এই ঝাড় দেওয়ার সময় ঝাড়ু বা ঝাটা দর্শন অবশ্যম্ভাবী ভাগ্য এবং সূর্যের অপকীর্তির জন্যই এরূপ রীতির প্রচলন ঘটেছে। রাত্রিবেলা বিশেষ করে চন্দ্রালোকে ঝাড় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মধ্যপ্রদেশের কাহিনীটি এইরূপ:

সূর্য ও চন্দ্র ছিল ভাই বোন। একবার তারা দু'জন এক বিবাহ ভোজে নিমন্ত্রিত হলো। খাওয়ার সময় তাদের মা বলে দিলেন যে, তারা

যেন তাদের মায়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে। সূর্য ছিল লোভী এবং পেটুক। সে মায়ের কথা ভুলে গিয়ে সবকিছু খেয়ে ফেললো। অথচ চন্দ্র মায়ের কথা ভুলতে না পেরে মায়ের জন্য চোখের আড়াল করে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এলো।

সেই খাদ্যদ্রব্য খেয়ে মা পরিতৃপ্ত হয়ে চন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন যে, সে যেন তার মতো পরিতৃপ্ত থাকে। সেই থেকে চন্দ্রের আলো স্নিগ্ধ এবং শীতল।

আর সূর্যকে অভিশাপ দিলেন যে, সে যে রকম তার মাকে অবজ্ঞা করেছে সেই অবজ্ঞার ফলস্বরূপ তার আলো যেন গরম হয় এবং লোকে যেন তাকে অত্যধিক তাপের জন্য তিরস্কার করে।

সেই থেকে সূর্যের আলো গরম ও তীক্ষ্ণ।

বাংলাদেশ কিংবা এই উপমহাদেশ কেন পৃথিবীর সর্বত্রই আদিবাসী সমাজে চন্দ্র সূর্য সম্পর্কিত কাহিনী প্রচলিত আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চন্দ্র ও সূর্য দেবতার আসনে আসীন। এবং এই ধারণা শুধু আদিবাসী সমাজ কেন হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর সব আদিবাসী ধর্মেই বিদ্যমান।

প্রাচীন রোম মিশর, বাইজানটাইন, সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজে একই বিশ্বাস বলবৎ রয়েছে। কাজেই তাদের সমাজে চন্দ্র সূর্যের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীরও অন্ত নেই। তবে বাংলাদেশ ও এই উপমহাদেশের চন্দ্র সূর্য সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে সেই সব কাহিনীর পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। নিগ্রোর পশ্চিম আফ্রিকার আকপোসু (Akposo) আদিবাসী সমাজের চন্দ্র সূর্যের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে :

তখন আকাশে চন্দ্র সূর্য কিছুই ছিল না। এক পোকা জাতীয় জীব আকাশ দেবতা উবুলুবু (Uwolowu)-এর নিকট এসে বললো, 'অন্ধকার মেঘরাশিকে আলোকিত করার জন্য কি করা যায়।'

উবুলুবু পোকাকে উত্তর দিল, 'তুমি কর্মকারের কাছে চলে যাও এবং বলো ; কর্মকারই উপযুক্ত জিনিস এনে মেঘের উপর বসিয়ে দেবে ফলে সব অন্ধকার বিদূরিত হবে।'

পোকা চলে গেল। কিন্তু সে মহাবিপদে পড়লো এই ভেবে যে, কর্মকারের কাছে গিয়ে কি জিনিসের কথা তাকে বলতে হবে। কাজেই সে সকল পাখীর কাছে গমন করে সবার থেকে একটা একটা পালক প্রার্থনা করলো। সবাই একটা একটা পালক দিলে পোকা সেই পালক পরিধান করে সম্পূর্ণ আলাদা জীব হয়ে গেল এবং ছদ্মবেশে উবুলুবুর কাছে এসে বললো, 'সেই পোকা কোথায়!'

উবুলুবু তার ছদ্মবেশ বুঝতে না পেরে উত্তর দিলো, 'আকাশটা শূন্য, এই জন্য তাকে চন্দ্র সূর্য আনতে পাঠিয়েছি।

পোকা চালাকির সাথে আবার বললো, তাকে কি কি আনতে হবে।

উবুলুবু উত্তর দিল, 'কর্মকারের কাছে চন্দ্র সূর্য তারকা সবই আছে। তাকে বললেই থলেতে পুরে সব কিছু নিয়ে আসবে এবং আকাশের যথাস্থানে সব বসিয়ে দেবে।'

পোকাকে আর পায় কে! সে ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে পাখীদের কাছে চলে গিয়ে তাদের যার যার পালক ফেরৎ দিল এবং কর্মকারের কাছে গিয়ে বললো তার অভিপ্রায়ের কথা।

কর্মকার থলেতে পুরে চন্দ্র সূর্য তারকা সব দিয়ে দিল। পোকা উবুলুবুর কাছে সব নিয়ে হাজির।

উবুলুবু পোকাকে বললো 'তোমাকে এসব শিখাল কে?

পোকা উত্তর দিল, 'আমি নিজের বুদ্ধিতেই এসব করেছি।'

উবুলুবু বললো, 'তাহলে আকাশে সূর্য স্থাপন করো।'

পোকা যথাস্থানে সূর্য চন্দ্র এবং তারকা স্থাপন করলো। সেই থেকে দিনের বেলা সূর্য ও রাতের বেলা চন্দ্র ও তারকারাজির প্রকাশ আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়।[১০]

হিন্দু ধর্ম মতেও চন্দ্র সূর্য বিভিন্ন ধরনের কাহিনী ভারাক্রান্ত। মৎস্যপুরান পাঠে জানা যায় যে, সূর্য ও সোম (চন্দ্র) উভয়েই পুরুষ এবং পরস্পর

আত্মীয় সম্পর্কহীন। সূর্য আকাশ দেবতা দায়ূস এবং ঊষাদেবীর পুত্র। তিনি সপ্ত ঘোড়া চালিত সোনার রথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তিনি আলোর আধার চন্দ্র অত্রী ঋষি এবং তাঁর স্ত্রী অনূসুয়ার পুত্র। তিনি দশ ঘোড়া চালিত তিন চাকা বিশিষ্ট সোনার রথে আকাশ প্রদক্ষিণ করেন। তিনি বৃহস্পতির স্ত্রী তারাদেবীর সতীত্ব নষ্ট করেন, ফলে দেবতাদের কোপানলে দগ্ধ হন।.....

চন্দ্র সৌর জগতের অধিষ্ঠাতা দক্ষের সাতাশ কন্যা বিয়ে করেন। সাতাশ স্ত্রীর মধ্যে রোহিণীকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন। এই পক্ষপাতিত্ব সহ্য করতে না পেরে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের পিতৃদেব দক্ষের শরণাপন্ন হন চন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য। দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁর এই দুরবস্থা দর্শনে স্ত্রীগণ আবার তাদের পিতার নিকট হাজির হন অভিশাপ মোচনের জন্য। অভিশাপ মোচন হলো বটে কিন্তু চিরকাল বন্ধ্যাত্ব থাকার পরিবর্তে চন্দ্রকে মাসে মাসে ক্ষয় ও বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে হয়।

তারকারাজি সম্পর্কেও আদিবাসী সমাজে কাহিনীর অন্ত নেই। ইতিপূর্বে বর্ণিত কাহিনী সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারকারা চন্দ্র কিংবা সূর্যের সন্তান সন্ততি। সাঁওতাল, ওরাওঁ, বিরহোর, মারিয়া প্রভৃতি আদিবাসীরা একই মত পোষণ করে। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অরণ্য অঞ্চলের পিরাচালা নিবাসী নিমাই বর্মণের কাছ থেকে সংগৃহীত গারো কাহিনীতেও এই ধারণা পাওয়া যায় :

সূর্য ও চন্দ্র পরস্পর ভাই আর বোন। আদিকালে সূর্য তার সন্তান সন্ততি সহ আকাশে বিচরণ করতো। সূর্যের তাপ এমনিতেই প্রখর। তদুপরি তার সন্তানেরাও সূর্যের মতোই এক একজন তেজোদ্দীপ্ত। পিতা ও পুত্রদের মিলিত তাপে সমস্ত সৃষ্টিই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সবাই সূর্যের বোন চন্দ্রের শরণাপন্ন হলো সৃষ্টি রক্ষাকল্পে।

চন্দ্র জানতো তার ভাই সূর্য কিসে খুশী হবে। সে একদিন খরগোসের মাংস রান্না করে ভাইকে নিমন্ত্রণ করলো।

সূর্য খরগোসের মাংস খেয়ে আত্মহারা। এত সুস্বাদু খাদ্য জীবনে আর খায় নি। তাই বোনকে আড়ালে জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কিসের মাংস? এত সুস্বাদু।'

চন্দ্র বললো, 'তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না। এসব আমার সন্তানদের মাংস।' একটু পরে গম্ভীর হয়ে আবার বললো, 'তোমার সন্তানদের মাংস এর চেয়েও সুস্বাদু হবে।'

তারপর সূর্য এক এক করে তার সব সন্তান খেয়ে ফেলল। কেবল পালিয়ে গিয়ে বাকী রইল একটি—শুকতারা। সূর্যালোকেও তাকে কখনো কখনো দেখা যায়। চন্দ্রের বুদ্ধিতে সৃষ্টি রক্ষা পেলো।

রাতের বেলা আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে কেন! এ সম্পর্কেও গারো সমাজে কাহিনীর অন্ত নেই। কেউ বলছে সূর্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে চন্দ্রের ছেলে মেয়েকে হুমকি দেয়। ফলে ভয়ে তারা ছিটকে পড়ে। কিন্তু হালুয়াঘাট থেকে যে কাহিনী সংগ্রহ করেছি তাতে একটু রোমাঞ্চ মিশ্রিত আছে। জনশ্রুতি আছে, আদিকালে দোসাদিল মিনগীতির নামে এক তারকা পৃথিবীতে এক ইটা বা চিল-এর প্রেমে মুগ্ধ হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে। ইটার পক্ষে কোন ক্রমেই আর আকাশে যাওয়া সম্ভব হলো না। ফলে সে চিরদিন মর্তেই রয়ে গেল। দোসাদিল মিনগীতির মর্তেও নেমে আসতে পারলো না। কাজেই তাকে দ্বিতীয়বার অন্য তারকা বিয়ে করে আকাশেই অবস্থান করতে হলো।

কিন্তু সে মর্তের ইটা স্ত্রীকে ভুলতে পারে না। তাই সে মাঝে মাঝে ছুটে আসে মর্তের মাটিতে তার ইটা স্ত্রীর খোঁজ নিতে।

এ জন্যেই দেখা যায় মাঝে মাঝে আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে।

তারা খসা সম্পর্কে আদিবাসী ভেদে ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মতে তারকারা চন্দ্র ও সূর্যের সন্তান। মাঝে মাঝে তারা বিষ্ঠা ত্যাগ করে। তারকার বিষ্ঠা তারকার মতই জ্বলজ্বলে এবং সেই বিষ্ঠাই মর্তে পড়ার সময় অনুরূপ আকার ধারণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই ও কুকীরাও সাঁওতালদের মতন মনে করে যে, খসে পড়া তারকা আর কিছুই নয়; তারকাদের বিষ্ঠা।

ওরাওঁদের মতে খসেপড়া তারারা ছিল পরচর্চাকারী। মৃত্যুর পর তারা ইন্দ্রের দরবারে যায় ঋষির কথা শুনতে কিন্তু অগ্নিবাণ খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়।[১১]

রংধনু, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কেও আদিম সমাজের ধ্যান ধারণা কাহিনীতে রূপান্তর লাভ করেছে। বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিতে অবশ্য এসব ধর্মাচার কিংবা ব্রতাচার সম্পৃক্ত নয় কিন্তু আদিম সমাজের কাছে এসব ধর্মবিশ্বাস সঞ্জাত—ফলে ধর্মাচার সম্পর্কিত। রংধনুর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীর প্রতি আদিম সমাজ যতটা সংস্কারবদ্ধ ধারণায় আচ্ছন্ন ঠিক ধর্মাচারের প্রতিও তারা ততটা ভক্তিমান। অনুরূপ সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনার সময়কালে তাদের পূজা পার্বণেরও আয়োজন সমান ভাবেই লক্ষ্যযোগ্য।

রংধনু সম্পর্কে শুধু এই উপমহাদেশের আদিবাসী সমাজেই কাহিনীর অবতারণা নেই, পৃথিবীর সর্বত্রই এই সূত্রের একটা প্রলম্বিত অংশ বিস্তারিত। ময়মনসিংহ জেলার হাজং সমাজ থেকে সংগৃহীত রংধনু সম্পর্কিত কাহিনীটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও জলন্ত স্বাক্ষর:

এক ছিল রাজা। রাজার ছিল এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে এত সুন্দরী যে, অন্ধকার ঘরে আর বাতির প্রয়োজন পড়তো না। দিনে দিনে ভাইবোন বড় হলো। যৌবনে পদার্পণ করতেই বোনের চেহারা যেন আরও ষোলকলায় পরিণত হলো। ভাই কিন্তু আড়ালে আড়ালে তার বোনকে ভালোবাসতে লাগল।

ওদিকে রাজা ছেলে ও মেয়েকে এত ভালোবাসতেন যে, তাদের এক মিনিট না দেখলে দুনিয়া অন্ধকার দেখতেন। আহারে বিহারে সব সময় তাদের সাথে রাখতেন। মূহূর্ত মাত্রও চোখের আড়াল হতে দেন না। ভাই কিন্তু বোনের প্রেমে মত্ত। বোন টের পেয়ে নিজেকে সতর্ক রাখে। কী লজ্জার ব্যাপার! এমন কথা কাউকে বলাও যায় না।

ভাইয়ের চরম অবস্থা। একদিন খাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে। খাবার ঘরে গিয়ে রাজা ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। জানতে পারলেন, ছেলে শোবার ঘরে গিয়ে খিল এঁটে বসে আছে। রাজা ডাকলেন, অনুরোধ করলেন কিন্তু কিছুতেই ছেলে বের হচ্ছে না। রাজা আবার ডাকলেন, আদরের সুরে বললেন, 'বাবা, চলে আসো। খাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে, কি তুমি চাও। ঘোড়াশালে ঘোড়া আছে, হাতীশালে হাতী আছে, টাকশালে টাকা আছে, কি তোমার চাই। সব দেব।'

ছেলে উত্তব দিল, 'ওসবে আমাব প্রয়োজন নেই। আমি বিয়ে কবব এবং আমাব ওই রূপসী বোনকে।

বাজা শুনে প্রমাদ গুনলেন। কি আব কববেন। আদবের ছেলে। তাকে মাব ধোব করবেন এটাও মন চায না। শেষে বললেন, 'তাই হবে তুমি আস।'

বাজা স্বীকাব কবলেন বটে। কিন্তু এও কি সম্ভব। বাতাবাতি ছেলেব অন্যত্র বিযে ঠিক কবলেন। কিন্তু ছেলেকে ঘূণাক্ষবেও জানতে দিলেন না। ছেলে জানতো যে, তাব বোনেব সঙ্গেই তাব বিয়ে হচ্ছে।

বাডীতে বিযেব আযোজন চলছে। আনন্দেব মহা ধুম। ততক্ষণে ছেলে জেনে ফেলেছে যে তাব বিযে হচ্ছে অন্য মেযেব সাথে। বিযেব পোষাক ফেলে দিযে সে চললো বোনেব সন্ধানে। বোন তখন জলেব ঘাটে স্নান কবতে ছিল। ভাই সেখানে গিযেই তাব মনেব অভিলাষ ব্যক্ত কবলো।

বোন শুনে অবাক। সে মহাদেবকে স্মবণ কবলো। আব ততক্ষণে সে মহাদেবেব বব পেযে আকাশে উঠতে লাগলো। সেই থেকে সে আকাশে অদৃশ্য হযে আছে। এখনো আকাশ থেকে মাঝে মাঝে স্নানেব দৃশ্য মনে হলে জলকণাব স্মৃতিতে সে বংধনু হযে ফোটে ওঠে।

এখানেই শেষ নয। সে যখন আকাশে উঠা শুরু কবলো ভাই তখন কিছু পিছু ডাকতেছিল। ভাইকে সে তখন ধমক দিযেছিল, সেই ধমকেব শব্দ বজ্রেব সঙ্গে মিশে আছে। বজ্রপাত হলেই হাজং সমাজ বাজকন্যাব ধমক বলে ধাবণা কবে।

আকাশে ওঠাব সময সে ভাবছিল যে, তাব লম্পট ভাইযেব হাত থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এই মুক্তিব আনন্দে তাব মুখ থেকে যে হাসি ফুটছিল সেই হাসি লেগে আছে বিদ্যুতেব ঔজ্জ্বল্যে।

টিপবাদেব ছিতোযা, বাই মান্দাব কাং খ্যাং' বাহিনীটিও প্রায একই ধবণেব। 'অবণ্য জনপদ' গ্রন্থে কাহিনীটি উল্লেখ কবা হযেছে।

আগেই উল্লেখ কবা হযেছে যে, আদিম সমাজেব ধাবণায প্রকৃতিব সবকিছুই আত্মাবস্তুধাবী জীবন্ত সত্তা। পৃথিবী এদেব কাছে মানব-সদৃশ

বিচরণ করেন। এ্যানিমিজম-এর এও এক বৈশিষ্ট্যময় দিক। কাজেই প্রকৃতির নানা চিত্র সম্পর্কে এদের ধারণা বা কাহিনীর অবতারণা আদিম ভাবধারা সম্পৃক্ত। রংধনু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং দোদুল্যমান ভাবাক্রান্ত। সাধারণ অর্থে রংধনু বলতে বিশিষ্ট ধনুক আকৃতি সম্বলিত বস্তু। হিন্দু সমাজে এর নাম দিয়েছে রামের ধনু বা রামধনু। কেউ কেউ বলেন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ধনুর্বাণ দিয়ে অসুরদের দমন করে পৃথিবীতে বৃষ্টি আনয়ন করেন বলে একে ইন্দ্রধনুও বলা হয়। পারস্যে কিন্তু একে বলা হয় 'স্বর্গীয় সাপ'।[১]

সাপের সঙ্গে যে রংধনু সম্পর্কযুক্ত এই ধারণা বহু আদিবাসী সমাজে বিদ্যমান। ভারতের প্রধান আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে এটা বাসুকীর [illegible] শির যে বাসুকী পাতালের নাগালোকে অবস্থান করে গোটা পৃথিবী মাথায় ধারণ করে আছেন।

বৈগা সম্প্রদায়ও একই মত পোষণ করে। তাদের মতে রংধনুর জন্ম উই-ঢিবি থেকে এবং এই উই ঢিবি সর্পের আদি বাসস্থান।[১৩]

বিরহোরদের ধারণায়ও সাপ সম্পর্কযুক্ত। তারা বলে 'আলাত' সাপ মুখে জল নিয়ে কুলকুচা করলে যে জলবিন্দুর উৎপত্তি হয় তা থেকেই রংধনুর আবির্ভাব।[১৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই কুকীদের মুখে শুনেছি যে বৃষ্টি হওয়ার পর বিরাট এক অজগর পৃথিবীতে নেমে আসে আহার করার জন্য। তারই বাঁকানো দেহ হলো এই রংধনু।

আসামের মিশমী, আবর [illegible] প্রভৃতি আদিবাসী রংধনুকে ভগবানের চলাচলের রাস্তা বলে ধারণা করে। নাগা সম্প্রদায় একে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে বর্ণনা করে।[১৫]

সাউথহিল অঞ্চল এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা মনে করে যে, আকাশ দেবতাদের মর্তে নেমে এসে তাদের বন্ধু বান্ধবদের পরিদর্শন করার একমাত্র যোগসেতু রংধনু।[১৬]

বার্মার কারেন সম্প্রদায়ের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা রংধনুকে ভূত-প্রেত ডাইনী কিম্বা প্রেতাত্মা কল্পনা করে। কোন লোক যদি বজ্রপাতে, জলমগ্ন অবস্থা কিংবা হিংস্র জন্তু কর্তৃক প্রাণত্যাগ করে তখন বার্মিজ

কারেন সম্প্রদায় উল্লেখ করে থাকে যে, রংধনুর প্রভাবেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে চায় তখনই আকাশ হ্রদের কিনারায় রংধনুর আবির্ভাব ঘটে। তাই রংধনু দেখা দিলেই তারা ঘরের বের হয় না। তাদের ধারণা রংধনুর কোপানলে পড়লে আর রক্ষে নেই। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা দুষ্ট ছেলে মেয়েদের ভয় দেখায় এই বলে যে রংধনু উঠেছে, এখনি খেয়ে ফেলবে, ইত্যাদি।[১৭]

আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায় কিন্তু বাংলাদেশ কিম্বা ভারতের আদিবাসীদের ধারণার প্রতি আস্থাবান। তাদের মতে রংধনু সাপের সঙ্গে অবস্থান করে অর্থাৎ যেখানে সাপ আছে সেখানেই রংধনুর অস্তিত্ব। পৃথিবীর বিরাট হ্রদে যখন সেই সাপ জলপান করে তখনই রংধনুর আবির্ভাব ঘটে। এই বিশ্বাসের দরুন জুলু সম্প্রদায় একাকী কোন হ্রদ কিংবা পুকুরে মুখ ধুতে কিংবা স্নান করতে অবতরণ করে না। তাদের ধারণা সেই সাপের অস্তিত্ব পুকুরে বা হ্রদে বর্তমান। ফলে মানুষের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অতএব রংধনু একটা রোগ বা ভয়ানক ব্যাপার।[১৮]

পশ্চিম আফ্রিকার আশান্তি (Ashanti) আদিবাসীদের বিশ্বাস রংধনু আকাশ দেবতা নিয়ামের (Nyame) ধনুক। একই অঞ্চলের[১৯] এউ (Ewe) ভাষাভাষী আদিবাসীদের ধারণা রংধনু আকাশ দেবতা মবু (Mawu)-এর এক অলৌকিক নিদর্শন। যখন এই রংধনু পাহাড়ের পরিবর্তে উপত্যকাভূমির উপর দৃষ্টিগোচর হয় তখন মনে করা হয় যে মবু দেবতার কোপে এরূপ হয়েছে। অতএব তাকে তুষ্ট করার জন্য মদ ও রক্ত উৎসর্গ করতে হবে। নতুবা দেশে রোগ জরা নানার সম্ভাবনা। পাহাড়ের শীর্ষে রংধনু দেখা দিলে বলা হয় যে, মবু এবং তার স্ত্রী কুসুআকো (Kusoako) পৃথিবী ভ্রমণ করে স্বর্গে ফিরছেন।[২০]

রংধনুর মত সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কেও আদিবাসী সমাজে বহু কাহিনী প্রচলিত। প্রসঙ্গত ই. বি. টেলর-এর মন্তব্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য :

'Savage mythology contains many a story of them, agreeing through all other differences in attributing to them animate life. They are not merely talked of in fancied personality, but personal action is attributed to them, or they are even declared once to have lived on earth.'[২১]

আদিবাসী ধারণায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সবকিছুরই মানব সদৃশ প্রাণ আছে এবং পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির আগে এরাই বসবাস করতো। তাই এদের জীবনধারা সম্পর্কিত কাহিনী সৃষ্টি করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে তাদের দৈবশক্তির প্রভাব এদের জনজীবনে স্বীকার করে নিয়েছে। এতে ইতিহাস না থাকতে পারে কিন্তু এক-দেশদর্শীতা আছে। কাহিনী যতটা আছে তার চেয়ে বেশী আছে সত্যের আশ্চর্য ফলন।

চন্দ্র সূর্য কতটা মানব দরদী এবং পরোপকারের ব্রতে কতটা অকুণ্ঠ চিত্ত তার পরিচয় বিধৃত সাওতাল বিশ্বাসসম্পৃক্ত চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণের কাহিনীতে।

উক্ত কাহিনীতে শোনা যায়, মানব জাতি অভাবে পড়েছে, তাদের না খেয়ে কাল যাপন করতে হচ্ছে। চন্দ্র সূর্য কি আর করবে। তারা দোসাদ দেবতার কাছে গেল ধান ধার আনতে। দোসাদ ধান ধার দিল বটে কিন্তু সেই ধান পরিশোধ করার কথা ছিল মানব জাতির। কিন্তু দুর্ভিক্ষ জনিত ব্যাপারে সেই ধার পরিশোধ করা মানব জাতির পক্ষে সম্ভব হয় নি। চন্দ্র সূর্য সেই ধার করার মাধ্যম হিসেবে ছিল বলে এখনো দোসাদ দেবতা মাঝে মাঝে চন্দ্র সূর্যকে আক্রমণ করে। ফলে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের আবির্ভাব ঘটে।[২২]

চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় সাঁওতালরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অনুষ্ঠান পালন করে যাতে দোসাদ দেবতা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। নইলে সমস্ত সৃষ্টিই পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই ও কুকী সমাজ গ্রহণ কালে যে উৎসব পালন করে সেই উৎসবের সঙ্গে সাওতাল উৎসবের সাদৃশ্য বর্তমান কিন্তু কাহিনীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উৎসব কালে তারা বন্দুকের আওয়াজ, ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিয়ে চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কিত কুকুরকে ভয় দেখায়। নইলে সূর্য বা চন্দ্র আলোক হারাবে। ফলে পৃথিবীতে নামবে অন্ধকার। মানব জীবন দুঃসহ হয়ে উঠবে।

লুসাই কুকীদের কাহিনীটির সঙ্গে জড়িত আছে, 'ম্যাজিক'—যে ম্যাজিক আদিবাসী সমাজের ধর্মের অঙ্গ। তাছাড়া কাহিনীটিতে ম্যাজি-কের উৎস সম্পর্কিত কাহিনী জড়িত। কাহিনীটি এইরূপ:

দুই ভাই বনে গিয়েছিল জুম কাজ করতে। সেখানে তারা একটা হরিণ শিকার করল। ছোট ভাইকে হরিণের মাংস রান্না করার কাজে নিয়োগ করে বড় ভাই গেল গহীন অরণ্যে জুম কাজ করতে। ছোট ভাই একটি বৃক্ষের নীচে বসে রান্নায় ব্যস্ত। হঠাৎ উপর থেকে একটি পাতা পড়তেই সিদ্ধ মাংস তাজা হরিণ হয়ে দৌড়ে পালাল। বড় ভাই ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে বিশ্বাস করলো না। সব মাংস খেয়ে ফেলার অপরাধে তার ছোট ভাইকে হত্যা করল।

কিন্তু সেই বৃক্ষ থেকে আর একটি পাতা মৃতদেহের উপর পড়তেই সে জীবন ফিরে পেলো। তখন বড় ভাইয়ের বিশ্বাস হলো যে, এই বৃক্ষের পাতা ও শাখা প্রশাখায় যাদুগুণ আছে। কাজেই দুই ভাই গাছের কিছু পাতা ও ডালপালা সহ বাড়ী চললো।

বাড়ীর পথে তারা দেখতে পেলো যে, একটি মৃত কুকুর পড়ে আছে। সেই কুকুরের গায়ে একটি পাতার স্পর্শ দিতেই কুকুরটি তাজা হয়ে গেল। অবশেষে তারা বাড়ীতে পৌঁছে গাছের পাতা ও ডালপালা রৌদ্রে শুকাতে দিয়ে সেখানে পাহারা রাখলো সেই কুকুর।

চন্দ্র সূর্য এই খবর পেয়ে নীচে নেমে এসে সব পাতা ও ডালপালা নিয়ে পালিয়ে গেল। কুকুর পড়লো মহা বিপদে। সে প্রভুর কাছে কি জবাব দেবে। কাজেই কুকুরটি আকাশে আরোহণ করে চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করলো। সেই থেকেই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সৃষ্টি হয়েছে। কুকুর এখনও সেই স্মৃতি ভুলতে পারে নি বলে মাঝে মাঝে আক্রমণ করে, ফলে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের আবির্ভাব ঘটে।

ওরাওঁ, বিরহোর, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীর চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত সাঁওতাল কাহিনীর অনুরূপ হলেও বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিরহোর কাহিনীতে জানা যায়, ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় রাহু দেবতা তাদের গ্রাস করে। ফলে, গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে, [illegible]াদি ইত্যাদি।

পাকিস্তানের গিলগিট অঞ্চলের আদিবাসীদের ধারণা ভিন্নরূপ। তাদের মতে এক বিরাট দৈত্য পড়েছিল চাঁদের প্রেমে। সেই দৈত্য চাঁদকে ভুলতে পারে না। চাঁদ যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয় তখন সে চাঁদকে প্রেমে

উদ্বুদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন করে ফলে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। সূর্যগ্রহণের বেলায় অন্য ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সূর্যের কোন আপন জনের মৃত্যু ঘটলে সে শোকে তার মুখ ঢাকে ফলে সূর্য ম্লান হয়ে যান। এটাই পৃথিবীর লোকের কাছে সূর্যগ্রহণ।[২৩]

মানব উপকারী ঋণ সম্পর্কিত ব্যাপারেই যে চন্দ্র সূর্য এমন বিপদাপন্ন এই কথা বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও উপমহাদেশের আদিম সমাজ বিশ্বাসেও বদ্ধমূল দেখা যায়। বাংলাদেশের রাজবংশী, চাকমা, মগ প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়াও ভারতের চেরু, টোডা, বোন্দা প্রভৃতি আদিবাসী বিশ্বাস করে যে চন্দ্র সূর্য মনুষ্য জাতির জন্য রাহুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল কিন্তু সেই ধার এখনও পরিশোধ হয় নি বলে রাহু এখনও তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, ফলে রাহুর ছায়া যখন চন্দ্র সূর্য আচ্ছন্ন করে ফেলে তখনই পৃথিবী থেকে ধারণা করা হয় চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে।

হো সম্প্রদায়ের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তাদের মতে সিং বোঙ্গা, সূর্য এবং চান্দোবোঙ্গা, চন্দ্র হলো স্বামী ও স্ত্রী। এই দুইজন যখন যৌনক্রিয়ায় মত্ত হয় তখনই গ্রহণরূপ চিহ্নের উদ্ভব ঘটে।[২৪]

হিন্দু ধর্মও চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে কাহিনীমুক্ত নয়। কথিত আছে যে, সমুদ্র মন্থনের সময় যে অমৃত উঠেছিল সেই অমৃতের কিছু অংশ অসুর রাহু, দেবতার ছদ্মবেশে পান করে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করে। চন্দ্র ও সূর্য এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং দেবতা বিষ্ণুর কাছে ফাঁস করে দেয়। বিষ্ণু ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর চক্র দিয়ে রাহুর মস্তকচ্ছেদ করেন। যেহেতু অমৃত পান করেছিল বলে রাহু অমরত্ব লাভ করেছিল সেহেতু তার মস্তক ও লেজ এখনও জীবিত রয়েছে এবং চন্দ্র ও সূর্যের সেই ঘটনা ফাঁস করে দেবার অভিযোগে তাদের আক্রমণ করে। ফলে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সূত্রপাত হয়।

উপরে বর্ণিত কাহিনী সমূহ ছাড়াও আদিবাসী সমাজে বজ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পর্কেও বহু কাহিনী রয়েছে। এসব কাহিনীতে সাহিত্যিক মূল্য গৌণ হলেও পৌরাণিক বিশ্বাস মুখ্য। বজ্র ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে হাজং সমাজের বিশ্বাস রংধনু শীর্ষক কাহিনীতে ইতিপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। বজ্রকে

কেউ কল্পনা করে ভগবানের গর্জন, বিদ্যুৎকে কেউ কেউ কল্পনা করে ভগবানের হাসি, ইত্যাদি।

গারো কাহিনীতে জানা যায়, আকাশ দেবতা গোয়েরা এককালে মর্তে বাস করতো। তার ছিল ভারি চমৎকার এক তরবারি। মর্তে থাকাকালীন সেই তরবারী দিয়ে সে একবার পাহাড়ের মত বিরাটকায় এক দানব হত্যা করে। সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ ভগবান তাকে আকাশে বাস করবার আদেশ দেন। সেই থেকে সে আকাশে অবস্থান করছে তবে এখনও গোয়েরা তরবারি চালনার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেনি। সে যখন তরবারি নিয়ে খেলা করে তখন যে শব্দের উৎপত্তি হয় তা বজ্রের নিনাদ এবং তরবারির ঝলকানিই বিদ্যুৎ।[২৫]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখো ও বনজোগী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে তেরানদ্রোপা বিয়ের সময় তার ভগবান শ্বশুরকে বন্দুক উপহার দেন। সেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ এখনও বজ্রপাতের সময় শুনতে পাওয়া যায়।

লুসাই কুকীরা বজ্র বিদ্যুৎকে ভগবান পাথিয়ানের ক্রোধের প্রকাশ বলে ধারণা করে। পৃথিবীতে যারা দুষ্কর্ম করে সেই পাপীদের ভয় দেখাবার জন্য বজ্র ও বিদ্যুতের বিকাশ।

সিলেট ও আসামের খাসীয়ারা বিদ্যুৎকে উকুই দেবতার বৌপোর তরবারির ঝলকানি বলে স্বীকার করে। ভারতের বিরহোর আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, রাম লক্ষণ হলুদ রংয়ের কোলা ব্যাঙয়ের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন। এই ব্যাঙ বৃষ্টির মৌসুমে ঘ্যা ঘ্যা ডাকে বিরক্ত করতো। রাম লক্ষণ তাদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তেন। তারা এখনও সেই স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। তাই বৃষ্টি দেখা দিলেই যখন ব্যাঙ ডাকা শুরু হয় রাম লক্ষণ স্বর্গ থেকে এখনও তীর ছুঁড়েন। সেই তীরের আঘাতই বজ্রপাত।[২৬]

অনুরূপ ধারণা পৃথিবীর বহু আদিবাসী সমাজে লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার মাসাই আদিবাসীরা মনে করে যে, বিদ্যুৎ আকাশ দেবতা ইনগাই (**Engai**)-এর ভীতিপ্রদ চাহনির প্রকাশ এবং বজ্র আনন্দ ধ্বনির নিনাদ। আনন্দ ধ্বনি এই জন্যে যে, বৃষ্টির পরেই নতুন ঘাস গজাবে

আর সেই ঘাস খেয়ে মেষসমূহ তাজা চর্বিযুক্ত প্রাণীতে রূপলাভ করবে। এবং সেই প্রাণীই হবে তার পূজার উপচার।[২৭]

প্রাচীন গ্রীকদের লোক বিশ্বাসেও বজ্র ও বিদ্যুতের উল্লেখ আছে। আকাশ দেবতা জিউস (Zeus)-এর সমরাস্ত্র হলো বজ্র ও বিদ্যুৎ। কথিত আছে যে জিউসের পিতা সাইক্লোপেস (Cyclopes)-কে বন্দী করা হয়। জিউস সাইক্লোপেসকে মুক্ত করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সমরাস্ত্র হিসেবে বজ্র বিদ্যুৎ লাভ করেন। এই শক্তি বলে তিনি পরবর্তীকালে টিটান্স (Titans)-কে পরাজিত করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যদের উপর কর্তৃত্ব লাভের অধিকার পান। সেই থেকে প্রাচীন গ্রীক সমাজ বজ্র ও বিদ্যুৎকে জিউসের সমরাস্ত্রের ঝলকানি বলে ধারণা করে থাকে।[২৮]

যাহোক, এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। এই উপমহাদেশের হিন্দু সমাজও অনুরূপ সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে বজ্রকে কল্পনা করা হয় দধিচি মুনির অস্থি। মানব কল্যাণের জন্য তিনি নিজের অস্থি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই অস্থিই এখন বজ্র হয়ে আছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলা হয় যে পাতালপুরীতে অবস্থানকারী নাগরাজের নিঃশ্বাস। অগ্নি যেমন কাঠ দাহ করে এই নিঃশ্বাস তেমনি জল দাহ করতে সমর্থ। ব্রাহ্মণ হত্যাকারী পাপীদের উপর সাধারণতঃ এই ধরনের বিদ্যুৎবাণ বর্ষিত হয়।[২৯]

প্রাকৃতিক নিয়মের অজ্ঞতা প্রসূত আদিবাসী সমাজের কাহিনী কল্পনা বৈশিষ্ট্যময়তার দাবী রাখে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যদিও এগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তথাপি আদিবাসী ধারণায় প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্যময়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রহস্যময়তার উদ্ঘাটন রহস্যময় কাহিনী কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। ভাবতে অবাক লাগে নিরক্ষর আদিবাসী সমাজের ভাব কল্পনা সূত্রের বিস্তৃতি দেখে। এদের ভাব কল্পনা সঞ্জাত ভূমিকম্প সম্পর্কিত কাহিনীগুলো সমান ভাবেই আমাদেরকে আকৃষ্ট করে।

ময়মনসিংহ জেলার গারো হাজংদের কাছ থেকে যতটা জানতে পেরেছি তাতে পৃথিবীটা বিরাটকায় এক ষাঁড়ের মাথার উপর অবস্থান করছে। এই ষাঁড় পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে যখন ঝাকানি দেয়

তখনই ভূমিকম্পের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার গ্রাম্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাহিনীতে যে বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তাতে উক্ত কাহিনীর সঙ্গে একটু যোগ হয়েছে মাত্র। তারা বলে, ষাঁড়ের কানের কাছে রয়েছে এক বিরাটকায় মাছি। মাছি যখন এক শিং থেকে অন্য শিং-এ পৃথিবী স্থানান্তরিত করে তখনই ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকাল বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। কারণ মাছি ষাড়কে ভয় দেখায় এবং ভয়, যে, বেশীক্ষণ ভূমিকম্প জনিত ব্যাপারে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। মাছির ভয়ে ষাড় নিশ্চুপ হয়। ফলে কম্পন থেমে যায়।

ওরাওঁ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসীদের ধারণায় পৃথিবী অবস্থান করছে এক বিরাটকায় কচ্ছপের পিঠে। কচ্ছপ যখন ভার সহ্য করতে না পেরে ঝাঁকানি দেয় তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। সাওতাল কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কচ্ছপের পায়ের কাছে রয়েছে বিরাটকায় এক কাঁকড়া। সেই কাঁকড়া সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখে কচ্ছপের উপর, যাতে বেশীক্ষণ পিঠ মোচড় না দিতে পারে। সৃষ্টি রক্ষা করার দায়িত্বেই কাঁকড়া ব্যস্ত।

ভারতের বিরহোর আদিবাসীরা মনে করে পৃথিবী বুকের উপর নিয়ে এক বিরাটকায় দৈত্য শুয়ে আছে। সেই দৈত্য যখন অস্থির হয়ে কাত হবার চেষ্টা করে তখন ভূমিকম্পের উদ্ভব ঘটে।৩০

পার্বত্য চট্টগ্রামের সেন্দুজ, পাংখো ও বনজোগীদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের মতে আকাশ ও পৃথিবী স্বামী ও স্ত্রী। সঙ্গম-জনিত ব্যাপারে যখন তাদের মিলন ঘটে তখনই কম্পন অনুভূত হয় এবং এটাই ভূমিকম্পের প্রকাশ।

সিলেট ও আসামের খাসিয়ারা মনে করে ধরিত্রী মাতা ঋতুবতী হওয়ার পর শরীরে জ্বর অনুভূত হয়। সেই জ্বরের দরুনই ধরিত্রী মাতা যখন উহ্ আহ্ করে কিম্বা অস্বস্তি বোধ করে সেই উহ্ আহ্ কিম্বা অস্থিরতাই ভূমিকম্পের প্রকাশ।

পায়ের নীচে যখন মাটি কেঁপে ওঠে তখনই ভূকম্পন অনুভূত হয়। কি ভাবে এরূপ ঘটে। আদিবাসী কল্পনায় এর কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা সাব্যস্ত করেছে হয় দানব-দৈত্য, জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী না হয় অতি

মানব জাতীয় কেউ এরূপ কাজ সংঘটিত করতে পারে। তাদের আকৃতি প্রকৃতির ধারণায়ও ঠিক করা হয়েছে তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর চেয়ে বড় রকমের একটা কিছু। তাই পৃথিবী এখন কাঁপছে সেই পৃথিবীকে যারা ধারণ করে আছে তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর চেয়ে বড় কিম্বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

ইতিপূর্বে বর্ণিত কাহিনী সমূহে যেসব দেওতা-দেবতাদের কিংবা দেওতা দানবের যেমন ষাড়, কচ্ছপ, শূকর, কাকড়া ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে তারা খুবই অলৌকিক শক্তির অধিকারী। নইলে পৃথিবী ধারণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না অথবা তাদের সামান্য একটু উষ্মা, রাগ, কিম্বা পার্শ্ব পরিবর্তনের চেষ্টা করা মাত্রই এতবড় পৃথিবী কাঁপানো ও অকল্পনীয় ব্যাপার।

এই যে আদিম চিন্তাভাবনা এই চিন্তাভাবনা কেবল এই উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই—পৃথিবীর সর্বত্র এর যোগসূত্র বিস্তৃত। পলিনেশিয়ার টোনগান (**Tongan**) আদিবাসীরা মনে করে যে মউই (**Mau-i**) তার পিঠের উপর পৃথিবী ধারণ করে আছে। সে যখন সামান্য আরামের জন্য এদিক ওদিক পার্শ্ব পরিবর্তনের চেষ্টা করে তখনই ভূমিকম্প দেখা দেয়।[৩১]

সেলিবীস দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ধারণা পৃথিবীটা বহন করে আছে হগ (**Hog**) নামে এক বিরাটকায় জন্তু। সেই জন্তু যখন গাছের সঙ্গে তার শিং ঘষে তখনই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ধারণার সঙ্গে এই উপমহাদেশের সাওতাল ওরাওঁদের ধারণার মিল লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে পৃথিবী রয়েছে বিরাটকায় এক কচ্ছপের পিঠে। কাচ্ছপ অসুস্থ হয়ে নড়াচড়া করলেই ভূমিকম্প হয়।[৩২]

আমেরিকার কারিবদের মতামত ভিন্নরূপ। তারা বলে ধরিত্রী মাতা আনন্দের আতিশয্যে যখন নৃত্য করে তখনই ভূমিকম্পের আবির্ভাব ঘটে।

হিন্দু শাস্ত্রেও অনুরূপ উল্লেখ দেখা যায়। তাদের মতে বিষ্ণুর বরাহ অবতার অর্থাৎ বিরাটকায় এক শূকর পৃথিবী ধারণ করে আছে। সেই শূকর পৃথিবীর বোঝা পরিবর্তন করার ইচ্ছা করলেই ভূমিকম্প হয়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায়। এসব কাহিনীতে সাহিত্য মূল্য যতটা আছে তার চেয়ে বেশী আছে ধর্মভাব। ধর্মভাবই এসব কাহিনীর প্রাণ।

৫

ইতিপূর্বে বর্ণিত পৃথিবী, আদি মানব-মানবী, দেব-দেবী ও সৌর জগতের বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী-সমূহ ছাড়া জীব-জন্তু ও পশু-পাখী সম্পর্কিত কাহিনী-সমূহও সমানভাবেই রসাত্মক এবং আদিম চিন্তা-ভাবনা বিধৃত। বাংলাদেশের লৌকিক পুরাকাহিনীতে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সৃষ্টিকর্তা ধর্মঠাকুর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবলেন আর তার শরীরে ঘর্ম দেখা দিল এবং 'সেই ঘর্মে জন্মিলেক যথ জীবগণ।'

জীব-জন্তু, পশু-পাখীও ধর্মঠাকুরের ঘাম হতে সৃষ্টি হয়েছে বলে হিন্দু শাস্ত্রে জানা যায়। আদিবাসী সমাজের চিন্তা-ভাবনায়ও অনুরূপ উল্লেখ আছে। ময়মনসিংহের গারোদের মতে ভগবান তাতারা রাবুগার হাই থেকে বাঘের সৃষ্টি ভাবেন। ভীলদের মতে ভগবানের শরীরের ময়লা থেকে বাঘের উদ্ভব এবং আসামের নাগাদের ধারণা। মানুষ ও বাঘের সৃষ্টির উৎস প্রায় এক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকীদের আদি মানব-মানবী সৃষ্টিকর্তা পাথিয়ানের ইচ্ছায় বাঘ ও বাঘিনীতে রূপান্তরিত হয়।

কোন কোন আদিবাসীদের টোটেম বিশ্বাস থেকে জানা যায়, তাদের উদ্ভব ঘটেছে ব্যাঘ্র থেকে। ভেরিয়ার এলুইন সংগৃহীত গন্ড আদিবাসীদের নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীতে ব্যাঘ্রের ও সাপের জন্ম বৃত্তান্ত পাওয়া যায়:

দেবতা লুগান্দী বাড়ার বিয়ে। তিনি সব দেবতাকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলেন। এমন কি সিংভবানীমাতাকেও নিমন্ত্রণ করতে বাদ দিলেন না।

সিংভবানীমাতা ভাবলেন যে, কিসে চড়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়। অতএব তিনি দুই কান থেকে ময়লা বের করলেন এবং সেই ময়লা থেকে সৃষ্টি হলো সিংবাঘ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় দুই বাঘ।

দেবতা লুগান্দী রাজার বাবা জলন্দরকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাবা জলন্দরের লিঙ্গ ছিল খুবই বড়। তিনি লিঙ্গচ্ছেদ করেন এবং সেই লিঙ্গ থেকে তৈরী হলো গোখুরা সাপ। তিনি সেই সাপ গলায় জড়ালেন। আর গোখুরা সাপকে উপহার দিলেন সাত ভগ্নী যথা, করিয়া, আসারিয়া, জাদু, দানদাকারাইল, হাবলারিয়া, সুয়া এবং সাত বক্লিনী।

সিংভবানীমাতা ও বাবা জলন্দর দুই বাঘের পিঠে চড়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে যাত্রা করলেন এবং তাদের আগে আগে চললো সর্পের দল।*

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখো ও বনজোগী এবং সিলেটের খাসীয়া সংস্কৃতিতে বাঘের উল্লেখ আছে বটে তবে তাতে উপরিউক্ত কাহিনীর সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। পাংখো ও বনজোগীরা মনে করে যে, বাঘ হলো খোজিং দেবতার পালিত কুকুর স্বরূপ। এ কারণে তারা বাঘকে খুব আপন মনে করে এবং তাদের আচার পদ্ধতিতেও বাঘের একটি বিশেষ স্থান আছে বলে ধারণা করা যায়। কেননা, বাঘ যদি পাংখো ও বনজোগীদের হত্যাও করে তবে তাদের কোন অভিযোগ নেই। কারণ তারা মনে করে দেবতার ইচ্ছার এরূপ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে বাঘের নাম পর্যন্ত তারা উল্লেখ করে না--- বলে, দেবতার কুকুর এরূপ কাজ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ময়মনসিংহের গারোদের বিশ্বাস কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। তাদের মতে কাউকে বাঘে খেলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি পবিত্র না হয় তবে সে পরজন্মে বাঘ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। তাছাড়া তাদের আরও ধারণা, পবিত্র আত্মাধারী ব্যক্তিকে নাকি বাঘ স্পর্শও করে না। এ কারণে বাঘে ও মানুষে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এমন নজিরও বহু আদিবাসীর মধ্যে দেখা যায়।

সিলেট ও আসামের খাসিয়া সম্প্রদায় বাঘকে মনে করে অলৌকিক জীব বলে। সে ক্ষেত্রে বাঘও যে অলৌকিক শক্তির ধারক এমন বিশ্বাসও তাদের মধ্যে আছে। পৃথিবীতে সর্ব প্রথম কি করে আলোর আবির্ভাব ঘটিলো---খাসীয়া সমাজের এ কাহিনীও বাঘ সম্পর্কিত। কাহিনীটি এইরূপ :

শিলং এর দক্ষিণ অঞ্চলে দেইংগী পাহাড়। সেই পাহাড়ের শীর্ষ-দেশে ছিল এক বিরাট গাছ। শাখা প্রশাখা নিয়ে গাছটা এত বড় ছিল যে, পৃথিবী সূর্যের মুখ দেখতে পেতো না। সব কিছু অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল।

খাসীয়াদের জীবন দুর্বিসহ মনে হলো। আলো ছাড়া মানুষ কি করে বাঁচতে পারে? তারা ভাবলো পৃথিবীতে আলো আনতে হলে গাছটা কাটা দরকার। সকলে মিলে গাছ কাটা শুরু করলো। গাছ কাটা হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য। পরের দিন ভোর বেলা সবাই দেখে গাছটি আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে

আবার তারা গাছ কাটলো কিন্তু ভোরবেলা দেখে সেই একই অবস্থা। কি এর হেতু! তারা জানতে পারলো সেই গাছে বাস করে এক বাঘ। সেই বাঘ গাছের গোড়ায় জিহ্বা দিয়ে চাটে আর গাছ তাজা হয়ে যায়। কেননা বাঘের আছে অলৌকিক গুণ অর্থাৎ যাদু শক্তি।

অতঃপর তারা বাঘটিকে হত্যা করল। এবারে আর কোন অসুবিধে নেই। গাছ কাটা হলো আর অমনি পৃথিবী সূর্যের মুখ দেখতে পেলো। সেইই পৃথিবীতে প্রথম আলোর আবির্ভাব।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকী সমাজেও বাঘ সম্পর্কিত কাহিনীর উল্লেখ আছে। শত্রু পক্ষের নরহত্যা যেমন পাপ বলে বিবেচিত হয় না তেমনি বাঘ হত্যা করাও কুকী সমাজে কোন পাপ বলে গণ্য হয় না। এমনকি, বাঘ হত্যাকারী সাহসী যোদ্ধার প্রতীক।

কুকীদের কোন কোন গোত্রে বাঘ টোটেমের চিহ্ন। আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুসারে টোটেমের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু কুকীরা এর ব্যতিক্রম। কেননা তারা বাঘের মাংস খায়। ইতিপূর্বে বর্ণিত কুকীদের আদি মানব-মানবীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটিতে কি করে বাঘ মনুষ্যরূপ ধারণ করে এক বিধবার অপরূপ সুন্দরী কন্যা বিয়ে করেছিল তা বলা হয়েছে।

বাঘ সম্পর্কিত এমনি আরও অনেক কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। শুধু বাঘ কেন সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, হাতী, হরিণ, টিয়া, ময়না, প্রভৃতি সর্বকিছু কেন্দ্র করেই আদিবাসী সমাজে কাহিনী প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও

এমন জীব জন্তুর জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে মানব জীবনের বিচিত্র ধর্মী সম্পর্কের ইতিহাস পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কোকিলের ডাক মিষ্টি কেন, বাঘের ডাক কর্কশ কেন, সাপের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত কেন, ইষ্টিকুটুম পাখীর রং হলুদ কেন, বাঘের গায়ে বিচিত্র রং কেন ইত্যাকার কাহিনীরও অন্ত নেই।

অরণ্যচারী জীব-জন্তুর মধ্যে হাতী বৃহদাকার। শুধু শক্তিতে নয় বুদ্ধিতেও এরা অন্যান্য জীবজন্তু থেকে শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের হদি ও দালুই আদিবাসীদের ধারণায় হাতির জন্ম বৃত্তান্ত কাহিনীটি চমৎকার।

আদিকালে হাতী উড়তে পারতো। একবার এক ঝাঁক হাতী উড়ে এসে গহীন জঙ্গলের এক বৃক্ষে বসলো। সেই বৃক্ষের নীচে ছিল ধ্যানমগ্ন এক ঋষি। হাতীর ঝাক বৃক্ষে বসতেই ডাল ভেঙ্গে তারা ঋষির উপর পড়ে গেলো। ঋষি অভিশাপ করলেন যে, তারা আর পাখী থাকবে না। হাতী হয়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করবে এবং তাদের পিঠে আরোহন করবে মনুষ্যজাতি। সেই থেকে তারা হাতী এবং তাদের পিঠে চড়ে মানুষের বিচরণ।

ভেরিয়ার এলুইন মধ্যপ্রদেশের আগারিয়া আদিবাসীদের থেকে হাতী সম্পর্কিত যে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তাতে উপরিউক্ত কাহিনির সঙ্গে মিল না থাকলেও হাতী যে এককালে উড়তে পারতো তার সন্ধান পাওয়া যায়।

আগের দিনে হাতী উড়ে বেড়াত। তাদের ছিল বিরাট পাখা। একবার এক হাতী উড়ে এসে এক হ্রদের ধারে জলপান করতেছিল। সেই হ্রদের এক কুমীর হাতী দেখে অবাক। ইতিপূর্বে সে এমন আজব জন্তু আর দেখে নি।

হাতী জল পান করতেছিল। এমন সময় কুমীর এসে হাতীর পা কামড়ে ধরে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। বহু টানাটানি করেও হাতী আর পা ছাড়াতে পারল না। এই ধস্তাধস্তি চলল বার বছর। উপায়ান্তর না দেখে হাতী ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।

ভগবান লক্ষ্য করলেন যে কুমীর হাতীর পাখা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং সে মরবার উপক্রম হয়েছে। এবং নাক ও দুটো কান ছাড়া হাতীর সমস্ত শরীর জলে ডুবে আছে। ভগবান হাতীর নাকে ধরে টান দেওয়ামাত্র

নাকগুলো বড় হয়ে শুঁড়ে পরিণত হলো এবং কানে ধরে টান দেওয়ামাত্র কান হলো কুলোর মত বড় বড়। তারপর ভগবান হাতীর পাখা দুটোর যা অবশিষ্ট ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে দিলেন। কেননা হাতী ইতিপূর্বে আকাশ থেকে উড়ে এসে পৃথিবীতে ফসল ক্ষেত তছনছ করতো। অতঃপর ভগবান বললেন, আজ থেকে তোমরা আর উড়তে পারবে না। সেই থেকে তারা পাখাবিহীন হয়ে পৃথিবীতে আছে।"

হাতী সম্পদ ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে আদিবাসী সমাজের ধারণা। এ কারণে স্বপ্নে হাতী দর্শনও সৌভাগ্য আনয়ন করে বলে তাদের বিশ্বাস। শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বাংলাদেশের লৌকিক সংস্কৃতিতেও অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু সংস্কৃতিতেও যে হাতীর প্রাধান্য রয়েছে তার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায় হাতী-শুড়ো ভাগ্য দেবতা গণেশের মূর্তি দেখে। তাছাড়া স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের বাহনও শ্বেতহস্তী বা ঐরাবত। এমনকি জাতকের কাহিনীতেও জানা যায় যে মহামুনি বৌদ্ধও মানব কল্যাণের জন্য শ্বেতহস্তী অবতার গ্রহণ করেন।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে সাপের প্রাধান্যও লক্ষ্য করবার মতো। সাপের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে বর্ণিত মধ্য প্রদেশ বা উড়িষ্যার গড উপজাতিদের বাঘ সম্পর্কিত কাহিনীতে সাপের জন্ম বৃত্তান্তেরও সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত কাহিনীতে বাবা জগন্দর-এর লিঙ্গচ্ছেদ জনিত ব্যাপার থেকেই সাপের উৎপত্তি বলে গডসমাজ বিশ্বাস করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদিবাসী সমাজে সাপ যৌন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ইঙ্গিতও উক্ত কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়।

সাপ যে আদিবাসী সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কারণে হিন্দু সমাজ মনসাদেবীর পূজা করে থাকে অনুরূপ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েই অনেক আদিবাসী সমাজে সর্প পূজার প্রচলন দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের হাজং, হদি, দালুই, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীদের নাম করা যায়।

সিলেট বা আসামের মনিপুরী সংস্কৃতিতে সাপের উল্লেখ থাকলেও সর্প পূজার রীতি তাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো সংস্কারবদ্ধ ধারণার জন্য

মনিপুরী মৈতেইসমাজ সর্পকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন উপাচার উৎসর্গ করে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের অন্যতম বক্তব্য এই যে, অভিশাপগ্রস্ত বভ্রুবাহন সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার জন্য তারা এ রকম করে থাকে। শুধুমাত্র সর্পকে ভোগ দিয়েই তারা নিবৃত্ত থাকে না, তাদের সমাজ জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতীক ধর্মী সর্পের ব্যবহারও দৃষ্টিগোচর হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মণিপুরী রাজা এখনও রাজ্যাভিষেকের সময় কাষ্ঠনির্মিত সর্পের মাথায় উপবেশন করেন। তাছাড়া মণিপুররাজ গম্ভীর সিং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগাপর্বত অধিকার করেন এবং এই স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন ১০ই মাঘ, ১৭৫৪ শকাব্দে জানুয়ারী, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই স্মৃতিস্তম্ভে অঙ্কিত রয়েছে একটি সর্পের ছবি এবং স্তম্ভের পাদদেশে গোবিন্দজীর পদচিহ্ন।[৪]

সাপ যে ভীতিপ্রদ জীব তা বলাই বাহুল্য। বিষধর বলেই সাপ প্রাণী ভয়ের উদ্রেক করে। নিঃশ্বাস তো দূরের কথা সর্পদর্শনই অনেক সময় মানুষের মৃত্যু ঘটায় বলে বহু আদিবাসী সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।[৫] সিলেট ও আসামের খাসীয়া সমাজে কি করে সর্প পূজার প্রচলন হলো নিম্নোক্ত কাহিনীটিতে তা বোঝা যায়:

চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের কোনোও বৃহৎ গর্তে এক খেলেন বা অজগর বাস করতো। এই খেলেনের প্রভাবে দেশে মড়ক দেখা দিল। খেলেনকে পূজা দিলেই দেশের মড়ক থেমে যেতো। একবার একটি লোক দেশকে মড়ক থেকে রক্ষা করার জন্য খেলেনকে ছাগল উৎসর্গ করে। লোকটা খেলেনকে ছাগল উৎসর্গ করত বলে আস্তে আস্তে তার সঙ্গে খেলেনের বন্ধুত্ব জমে উঠলো। পরবর্তী কালে লোকটি খেলেনকে ডাক দিতেই সে মাংসের লোভে হা করে চলে আসতো।

লোকটির মাথায় একবার দুর্বুদ্ধি চাপলো। সে ভাবলো খেলেনকে হত্যা করতে পারলে অন্ততঃ ছাগল উৎসর্গ করার ঝামেলা থেকে বেচাই পাওয়া যাবে। তাই সে একটা লোহশলাকা আগুনে পুড়ে লাল করে খেলেনকে ডাক দিল। খেলেন ডাক শুনে মাংসের লোভে যেই হা করছে অমনি সে গরম লৌহ শলাকা মুখে পুরে দিল। ফলে খেলেন মারা গেল।

এবারে লোকটি খেলেনকে খণ্ড খণ্ড করে সেই অঞ্চলের লোকদের পাঠিয়ে দিল খেলেনের মাংস ভক্ষণ করতে। কিন্তু ভুলক্রমে এক টুকরো মাংস পড়েছিল। সেই টুকরো থেকে জন্ম নিল হাজার হাজার অজগর। তাদের উৎপাতে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। এবারে মনুষ্য উৎসর্গ করে তাদের পূজা না দিলে আর তারা নিবৃত্ত হয় না। সেই থেকে খাসীয়াসমাজে সর্প পূজার উৎপত্তি। তবে মনুষ্য উৎসর্গ রীতি বর্তমানে লোপ পেয়েছে। মনুষ্যবলি জন্তুজানোয়ার বলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আদিবাসী সমাজের ধারণা : 'সাপ না মারলে তার মৃত্যু ঘটে না এবং খোলস বদলালেই সে নবজন্ম লাভ করে। এই ধারণা শুধু বাংলাদেশ ও ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই পৃথিবীর সর্বত্র এর বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় এ সম্পর্কে চমৎকার চমৎকার কাহিনীও আছে। টাঙ্গানিকা হ্রদ অঞ্চলের ওয়াকিপা ও ওয়াবেন্দের আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, 'সৃষ্টিকর্তা সব জীবজন্তুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে মরতে চায় না।' দুর্ভাগ্যক্রমে সবাই ঘুমিয়েছিল। কেবল সাপ সৃষ্টিকর্তার সামনে হাজির হয়ে বলে, 'আমি মরতে চাই না।' সেই থেকে সাপের মৃত্যু নেই।[৬]

বৃটিশ নর্থ বোর্নিওর দুসুনস (Dusuns), সেন্ট্রাল সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের টোডজু টোরাডজাস (Todjo-Toradjas)[৭] এবং পূর্ব আফ্রিকার ওয়ারুনগু (Warungu) আদিবাসীদের মধ্যে একই বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে :

সৃষ্টিকর্তা লেজা (Leza) একবার পৃথিবীতে নেমে এসে সকল প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কারা মরতে চাও না। তিনি বার বার এই কথা জিজ্ঞেস করার কেউ উত্তর দিল না। কেননা সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

একমাত্র সাপ জেগেছিল। সে এসে বললো, 'একমাত্র আমি মরতে চাই না।' লেজা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে সাপ মরে না। কেউ হত্যা না করলে সাপ অমর।[৮]

আফ্রিকার বান্তু আদিবাসীরাও একই মত পোষণ করে। তাছাড়া

ওয়াচ্যাগ্যা আদিবাসীদের ধারণাও অনুরূপ। তবে তাদের সাপের অমরত্ব সম্পর্কিত কাহিনীটি একটু ভিন্ন ধরণের। কাহিনীটি এইরূপ:

পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবীর যখন সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তাদের মধ্যে সুখ ছিল, দুঃখ ছিল কিন্তু মৃত্যু নামের বস্তুটি ছিল না। তারা দিনে দিনে বুড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মৃত্যু হচ্ছিল না।

একদিন এক গিরগিটি একজন লোককে বললো 'আমাকে এক পেয়ালা মদ এনে দাও।'

লোকটি মদ এনে দিলে গিরগিটি সেই মদে স্নান সেরে বললো 'এখন এই মদ পান কর।'

লোকটি গিরগিটি ঘৃণা করতো। তাছাড়া সেখানে স্নান সেরেছে তা বিষাক্ত হয়ে গেছে মনে করে লোকটি বললো অসম্ভব, এ মদ আমি পান করতে পারি না।

তখন গিরগিটি রাগান্বিত হয়ে বললো, 'যেহেতু মদ পান করলে না সেহেতু তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

গিরগিটি যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল তখন সেখানে এক সর্প এসে উপস্থিত। সাপকে আদেশ করা মাত্রই সে এক চুমুকে সব মদ নিঃশেষ করে ফেললো।

সেই থেকে মানব মরণশীল আর সর্প অমর।[৯]

হিন্দু সংস্কৃতিতে সাপের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রামায়ণ, মহাভারত উপনিষদ, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে সর্প সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং সর্প পূজার উল্লেখ বর্তমান। পুরাণে যে পাতালপুরীর বর্ণনা আছে তাতে পাতালপুরী সাত রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি রাজ্যের বিস্তৃতি দশ হাজার যোজন এবং সেখানে বসবাস করছেন সর্বদেবতাগণ। এবং এ কারণেই পাতালপুরীকে নাগালোক বা নাগরাজ্য বলা হয়। সেখানে কোন ভয় নেই, অন্ধকার নেই, সূর্যের আলো মিষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারদ মুনি পাতালপুরী ভ্রমণ করে স্বর্গরাজ্যে এসে ঘোষণা করলেন যে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যের চেয়ে পাতালপুরী শ্রেষ্ঠ। আরও জানা যায়, পাতালপুরীর সর্পরাজ বাসুকীর মাথায়ই এ পৃথিবী অবস্থান করছে।

হিন্দু সংস্কৃতিতে যে সাপের প্রাধান্য রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তাদের সর্প পূজার ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের। সর্পপূজা বলতে প্রধানত সর্পদেবতার পূজাকে বোঝায়।

এমনকি কোন কোন রাজবংশও যে সর্প থেকে উদ্ভূত এমন নজিরও বিরল নয়। উদাহরণ স্বরূপ ছোটনাগপুরের রাজবংশের উল্লেখ করা যায়। এই রাজবংশ সর্পদেবতা নাগপুণ্ডরিকা থেকে উদ্ভূত। কথিত আছে যে, নাগপুণ্ডরিকা একবার মনুষ্যরূপ ধারণ করে বেনারসের এক ঋষির বাড়ীতে গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকলেন। উদ্দেশ্য, সেই ঋষিগুরুর কাছে কাজ শিখবেন। ঋষিগুরু তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

মনুষ্যরূপধারী সর্প তার দ্বিখণ্ডিত জিহবা ও নিঃশ্বাস কোনভাবেই গোপন করতে পারলেন না। অবশ্য, স্ত্রীকে এ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু একবার পুরীতে তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর স্ত্রী অনুরোধ করলো তার দ্বিখণ্ডিত জিহবা ও উষ্ণ নিঃশ্বাসের কারণ বলতে।

মনুষ্যবেশধারী নাগপুণ্ডরিকা কিছুতেই ভেবে না পেয়ে সর্পরূপ ধারণ করে পার্শ্ববর্তী পুকুরে ডুব দিলেন এবং স্ত্রীর কাছে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পার্বতী ছিল গর্ভবতী। সে এত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ক্রন্দন শুরু করলো। [illegible] তার স্বামী চলে গেছে। এই দুঃসময় মুহূর্তে পার্বতী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো এবং ভাবলো যে চিতা জ্বালিয়ে তাতে সে আত্মাহুতি দেবে।

এই সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির। ব্রাহ্মণের হাতে সূর্য-দেবতার মূর্তি। ব্রাহ্মণ নবজাত শিশুরদিকে তাকাতেই দেখলেন যে একটি সর্প শিশুর মাথার কাছে ফণা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সর্প আসলে শিশুর পিতা নাগপুণ্ডরিকা।

ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে সর্প বললো যে, এই শিশু হবে ছোট নাগপুরের রাজা। ব্রাহ্মণ হবে তার পরিবারে পুরোহিত এবং সূর্যদেবতার মূর্তি হবে তাদের উপাস্যদেবতা। এসব ঘোষণা করেই নাগপুণ্ডরিকা ব্রাহ্মণের হাতে সন্তান অর্পণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই থেকে ছোটনাগপুরের রাজবংশ নাগবংশ নামে খ্যাত।[১০]

কাশ্মীরের রাজা দামোদরের উপাখ্যানও সর্প সম্পর্কিত। তবে তিনি সর্পবংশজাত নন বরঞ্চ তিনি অভিশাপগ্রস্ত সর্প। কথিত আছে যে, একবার এক ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে রাজা দামোদরের দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে বললেন, 'আমি স্নান না করে কাউকে কিছু দিই না। তুমি দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।'

ব্রাহ্মণ এই কটু বাক্য শুনে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি সাপ হয়ে যাও।'

সেই থেকে দামোদর রাজা সাপ হয়ে আছেন এবং যে সরোবরে তার অবস্থান তা 'দামোদর উদর' নামে খ্যাত।[১১]

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, গাছ, বৃক্ষ, পাহাড়-পর্বত, খাদ্যদ্রব্য, নদী নালা, বিল দিঘী, ঝর্ণা, ইত্যাদি সম্পর্কিত কাহিনীসমূহেও আদিবাসী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। পাহাড় পর্বত নদী নালা সম্পর্কিত কাহিনীগুলোতেও রয়েছে ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাব। তাছাড়া নীতিকথাও এর মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে। আদিবাসী উপাখ্যান যে প্রেম তদগত তারও পরিচয় এতে বিধৃত। উদাহরণ স্বরূপ লুসাই সমাজে প্রচলিত তুইচং নদীর জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করছি। বলা যেতে পারে যে, লুসাই পাহাড় থেকে উদ্ভূত কর্ণফুলী নদীরই একটি শাখা এই তুইচং। কাহিনীটি এইরূপঃ

তুইচংগী ও নোয়েংগী নামে দুই বোন। দুই বোনে খুব ভাব। একদিন দুই বোন মিলে গেল গহীন অরণ্যে জুম কাজ করতে। চৈত্র মাস। পিপাসায় ছোট বোনের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল না হলে তাকে বাঁচানো দায়। কিন্তু অরণ্য অভ্যন্তরে কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বড় বোন তুইচংগী জানতো যাদুমন্ত্র। ছোটবোন নোয়েংগীকে বাঁচাতে না পারলে চলে না। অতএব মন্ত্রবলে বড় বোন নদী হয়ে গেল।

ছোট বোন নোয়েংগী পিপাসা নিবৃত্তি করলো সেই নদীর জলে। কিন্তু বড় বোনকে না পেয়ে তার দুঃখের অবধি রইলো না। সে নদীর পারে বসে কান্না জুড়ে দিল।

নদীর জলে ভাটির দেশ ডুবে গেল। ভাটি অঞ্চলের রাজা অসময়ে প্লাবন দেখে অস্থির হলেন। তিনি পানসী সাজিয়ে বের হলেন নদীর উৎস সন্ধানে।

দীর্ঘদিন চলার পর রাজা এসে পৌঁছুলেন এক পাহাড়ের পাদদেশে। সেখান থেকেই জল গড়িয়ে চলছে ভাটির দেশে। আর নদীর উৎসমুখে বসে আছে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা।

রাজা তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অবশেষে তাকে বিয়ে করে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

নোয়েংগী ছাড়া রাজার ছিল আরও তিন রাণী। তাকে দেখে তিন রাণী জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো হিংসায়। কিন্তু নোয়েংগী অসম্ভব ধর্ম-পরায়ণা। সে তিন রাণীকে ভীষণ শ্রদ্ধা করত।

দিনে দিনে মাস গেল, বছর গেল। নোয়েংগীর ঘরে এলো এক সুন্দর ছেলে। আঁটকুড়ে তিন রাণী নোয়েংগীর ছেলে দেখে ভাবলো একে না মারলে রাজা নোয়েংগীকেই বেশী ভালো বাসবে। তাই তারা ছেলেটিকে গোপনে নদীতে ফেলে দিল।

নদী হলো তার মায়ের বড় বোন। বোনের ছেলেকে নদী লালন পালন করতে লাগলো। এই ভাবে নোয়েংগীর পর পর আরও তিনটি ছেলে সতীনেরা নদীতে ফেলে দিল। নোয়েংগী কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এই কথা রাজার কাছে বললো না।

ওদিকে নদী নোয়েংগীর চারটি ছেলেকেই লালন পালন করে বড় করলো। তাদের নাচ, গান, লেখাপড়া সব শিখিয়ে মানুষ করে তুললো।

একদিন নদী তাদেরকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিল। যাওয়ার সময় বলে দিল, 'তোমরা রাজদরবারে গিয়ে নাচবে, গান গাবে, আর রাজাকে বিদ্যার বহর দেখাবে। রাজা যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন তবে বলবে যে, তোমরা রাজার ছেলে। অতঃপর, তাদের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে দিল।

চার ছেলে রাজদরবারে গিয়ে নাচগান শুরু করলো। রাজা তাদের সুন্দর চেহারা, নাচগান ও মধুর কথাবার্তা শুনে অবাক হলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে।'

চার ছেলে এক সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমরা আপনার ছেলে।'

রাজা বললেন, 'মিথ্যাবাদীদের আমার রাজ্যে কেটে ফেলার হুকুম আছে। বল, তোমরা কে?'

চার ছেলে সব ঘটনা খুলে বললো। রাজা তো শুনে অবাক।

রাজা নোয়েংগীর কাছে সব শুনলেন। অতঃপর রাজা তিন রাণীকে কেটে অরণ্যে পুতে ফেলবার আদেশ দিলেন।

রাজা তাঁর রাণী ও চারপুত্রসহ আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন।

উপরিউক্ত কাহিনীতে তুইচংগীর যে আত্মত্যাগের পরিচয় বিধৃত তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এবং এই কারণেই তুইচংগী কেবল নদী মাত্র নয় লুসাই সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিবাসীমাত্রই প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুতেই জীবাত্মার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করে এবং সে জন্যেই প্রকৃতি তাদের কাছে পূজা বা অর্চনার বস্তু। লুসাই সমাজও বৎসরান্তে তুইচংগী নদীকে পূজা করে, তুইচংগীর আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠার প্রতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

অনুরূপ খাসীয়াদের কা কাকাইদ কা লিকাই বা লিকাই জল প্রপাতের কাহিনী, গারোদের দুরামুংগ সাংদুমুংগ দাকগ্রীকা বা ব্রহ্মপুত্র ও তুরা পর্বতের কাহিনী, চাকমাদের গোমতী নদীর জন্ম কথা শুধু কাহিনীমাত্র নয়, ধর্মভাবসম্পৃক্ত দেবতাতুল্য স্থানও বটে।

খাল-বিল, ঝর্ণা-দীঘি, নদী-নালা ইত্যাদি সম্পর্কিত কাহিনী-সমূহে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব লক্ষ্য করবার মতো। ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আস্থা আদিবাসী সমাজের নাড়ীর যোগসূত্র। চাকমাদের গোমতী নদীর জন্মকথা শীর্ষক গল্পটিতে ঐন্দ্রজলিক প্রভাব কতটা প্রকট তা উপলব্ধি করবার মতো। এখানে মূল চাকমা ভাষাসহ কাহিনীটির উল্লেখ করছি:

এক্কে এক বুর্গা। তে এদগ আলজি যে কলা তারৎ এরেই ন খায়। তারুন ঝিবা ঝি এলাগ। বুর্যা তারাদ্যায় একখান জুম কাবি দিনাই কিছু ন গরত।

একদিন কালবৈশাগ দিনৎ যগন তা ঝিবা ঝি জুমৎ ধান কুজিদাগ্ গেইযন্, বেল্ কদ্দুর জেইনাই দেবা আঁধার্যা কালা গল্লগৈ চের কেই তাত্তুন

ব বেদ লাগিল্। তারা জাগা নেই দেই নাই কপাল বিনেই বিনেই কান্দাগ্ লাগিলাগ্।

দাংর্বোনা কয়দেয়, সাব হোগ্, বেং হোগ্, দা হোগ্, যে আমার ইথো একখান ঘর তুলি দিব, মুই তাব লোম্।

সিয়ান শুনি নাই এককোয়া বড় সাবে রাজ তার বোই নাই তাবা দ্যায একখান ঘব তুলি দিল্। তাবা দ্বি বোনতুন দাংগব বোন নোযাই সে সাব্বোয়াবে লল্।

তারাবাবে বুবাগ সেই কদা শুনি নাই সেই সাব্বোয়ারে কাবি ফেল্ল। তা বিয়ে কান্দে কান্দে চোগ পানিয়ে ছবা জেই চাই সেই ছবা পানি ডুবি নাই মর্যে। সেই ছুরান নাং গোমেদ গাং। তিবিরা রাজা পোযাযই সাব বেজ ধরি নাই তাবাদ্যায় বিলে ঘব তুলি দ্যে গে।

'এক ছিল বৃদ্ধ। সে এত অলস ছিল যে কলার খোসা পর্যন্ত ছাড়িযে কলা খেত না। তার দুই কন্যা ছিল। বৃদ্ধ তাদের কাছে জুমের ভার দিযে নিজে কিছুই করতো না।

একদিন বৈশাখ মাসে যখন তারা দুবোন জুম করতে গেল, বেলা কিছু হতে না হতেই অন্ধকারে আকাশ ছেযে ফেললো। চারদিক থেকে বাতাস বইতে লাগলো। কোন আশ্রয় না পেয়ে দুই কন্যা কপালে করাঘাত করে কাঁদতে লাগলো।

বড়জন বললো, সাপ-বেঙ, দেবতা-দানব, ভূত-প্রেত রাজা বা প্রজা যেই হোক, যে আমাকে এখানে একটি ঘর তুলে দিবে আমি তাকে বিয়ে করবো।

একথা শুনে এক বিরাট সাপ বাঁশ বহন করে এসে ঘর তুলে দিল। দুবোনের মধ্যে বড় বোন সে সাপকেই বিয়ে করলো।

তাদের পিতা সেই কথা শুনে সাপটিকে কেটে ফেললো। এই দুঃখে তার বড় মেয়ে কেঁদে দুচোখ পানিতে ভরে তুললো। এই পানি থেকে যে নদীর স্থষ্টি হলো তাতে সে ডুবে মরলো। এই নদীই গোমতী নদী নামে খ্যাত। কথিত আছে যে টিপ্রা রাজপুত্র সাপের বেশ ধরে এসে ঘর তুলে দিয়েছিল।'

এমনি ধরণের কাহিনী বা কিংবদন্তী বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিতেও প্রচুর রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যশোর জেলার ঢোল সমূদ্র দিনাজপুরের সাগরাগর, কুমিল্লার রাণীর দীঘি পাবনার চলন বিল টাঙ্গাইলের সাগর দীঘি, সাতবিলা, নকুল বিল, মুচিদহ প্রভৃতির নাম করা যায়। এসবের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী বা কিংবদন্তীতে ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত নেই কিন্তু রয়েছে কল্পনা মিশ্রিত পৌরণিকতার আভাস। অথচ প্রত্যেকটি কাহিনীই রসাপ্লুত ধারায় উত্তীর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ টাঙ্গাইল জেলার মুচিদহের উল্লেখ করা যায়। আইসড়া ও গোলরা গ্রামের পশ্চিম মাথায় অবস্থিত এই দহ নানা ধরণের জনশ্রুতি মুখর। এককালে এর চারপার্শ্বে ছিল মুচিদের আবাস। হঠাৎ একরাত্রে কেবল গুরু গুর শব্দ শোনা গেল। ভোরবেলা সবাই জেগে দেখে একজন মুচিও জীবিত নেই---সেখানে হয়েছে এক বিরাট দহ। দুই গ্রামের লোক তার নাম দিল মুচিদহ।

জনশ্রুতি আছে এই দহে দেখা যেত থালা বাটি ভাসছে। এমনকি লোকেরা সেই থালাবাটি এনে গ্রামের বড় বড় নিমন্ত্রণ পরিচালনা করত। একবার কে বা কারা একটা থালা চুরি করে রেখেছিল তারপর থেকে আর থালাবাটি ভাসতেও দেখা যায় না, চাইলেও পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলে, টাকার সিন্দুকও নাকি মাঝে মাঝে পাড়ে ভেসে উঠতো ইত্যাদি।

আঞ্চলিক হিন্দু সমাজের ধারণা এর অন্তরালে রয়েছে অপদেবতার আবাস। কেননা দেখা গেছে কখনও কখনও মানুষ স্নানের নিমিত্ত ডুব দিয়েছে আর উঠে নি। কিংবা গরু বাছুর ধোয়াবার সময় দহের মাঝামাঝি সাঁতরে গেছে আর অমনি তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর আসে নি। এসব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দু সমাজকে ফুল জল দিয়ে এর অন্তরালের দেবতাকে পূজা করতে দেখা যায়। অপদেবতাকে তুষ্ট রাখার জন্যই এই আয়োজন।

৬

আদিবাসীদের আহার ও পানীয় সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর জন্মবৃত্তান্তও অলৌকিক কাহিনীভিত্তিক। ভাত ও মদ সাধারণত এই উপমহাদেশের আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য। সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, চাকমা, মগ, কোল, মুণ্ডা, হো, মুরিয়া, গোন্দ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে ভাত ও মদ সম্পর্কিত কাহিনী খুবই চমকপ্রদ। অনুরূপ ভাবে তামাক পাতা, পানপাতা ইত্যাদি সম্পর্কিত কাহিনীগুলোও কম রসাত্মক ধারা বহন করে না। প্রসঙ্গতঃ তামাক পাতার উল্লেখ করা যায়। তামাক পাতা আদিবাসী মাত্রের কাছেই প্রিয় এবং পবিত্র। একটি সাঁওতাল কাহিনীতে জানা যায়ঃ

এক ব্রাহ্মণের ছিল এক কন্যা। ব্রাহ্মণ ছিলেন খুব দরিদ্র। দারিদ্র্যজনিত অসুবিধার জন্য তিনি তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারেন নি। ফলে, অবিবাহিতা অবস্থায় ব্রাহ্মণকন্যা মৃত্যু বরণ করে।

তার মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত হওয়ার পর ভগবান চান্দো ভাবলেন, আহা, আমি তাকে মেয়ে রূপে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। অথচ পৃথিবীর কেউ তাকে গ্রহণ করলো না। ঠিক আছে, আমি তাকে এখন এমন বস্তুর আকারে পৃথিবীতে পাঠাব যাতে তাকে সবাই সর্বক্ষণ আদর করে।

সেই ব্রাহ্মণ কন্যার চিতাভস্মের উপর গজালো তামাক পাতা।

অনুরূপ কাহিনী ভারতের গঁড়, কোন্দ, গাদাবা, জোয়াং ও মুরিয়া প্রভৃতি আদিবাসী সমাজেও প্রচলিত। তবে গল্পগুলোর মূল বক্তব্যে কোন পার্থক্য না থাকলেও কাহিনী বর্ণনায় ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ-

স্বরূপ মধ্যপ্রদেশের কোন্দদের তামাক পাতার উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটি উল্লেখ করছি :

এক সময়ে এক যুবক ও এক যুবতী গোতুলে রাত্রিযাপন করতো। যুবতীটি ছিল খুব ধনী ঘরের মেয়ে কিন্তু যুবকটি ছিল খুব গরীব। তারা রাত্রে গোতুলে একই বিছানায় শয়ন করতো কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতো না। এভাবে দীর্ঘদিন চললো।

একদিন যুবতী বললো : 'আমার ঘনিষ্ঠ হও। আমাকে পরিতৃপ্ত করো।

যুবক উত্তর দিল : 'তা কি করে সম্ভব! আমরা উভয়ে যে একই গোত্রভুক্ত।'

এতে যুবতীটি নিরস্ত হলো না। সে বার বার যুবকটিকে আহ্বান করতে লাগলো তাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে। কিন্তু যুবকটি অনড়। তার স্থিরসিদ্ধান্তের পাথর একটুও নড়ল না।

কয়েকদিন পর অন্য এক গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এলো সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক নিয়ে। তারা সকলে মিলে যুবতীটিকে বললো সেই যুবককে বিয়ে করতে।

যুবতী উত্তর দিলো : 'আমি জীবনে বিয়ে করবো না। আর যদি তোমরা আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করো তবে আমি 'অমুক'কে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না।' যুবতীটি তার দয়িতের নাম বলে দিলো।

তখন একবাক্যে সবাই উত্তর দিলো : 'তা কি করে সম্ভব! তোমরা উভয়ে যে একই গোত্রভুক্ত। মেয়েটি বললো : 'আমাদের পিতা মাতা তো এক নন। কাজেই যখন ভিন্ন ভিন্ন পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি তখন আমাদের বিয়েতে কোন বাধা থাকতে পারে না।'

তখন গ্রামবাসী সবাই মিলে সেই যুবকটিকে আদেশ করলো যুবতীটিকে বিয়ে করতে। কিন্তু যুবকটি অস্বীকার করলো। সে বললো : 'আমাকে যদি বিয়ে করতে হয় তবে অন্য কাউকে করবো, একে নয়। কাজেই তাদের মধ্যে আর বিয়ে হলো না।

অল্পদিনের মধ্যেই মনের দুঃখে মেয়েটি মারা গেল।

অনেকদিন পরের ঘটনা। একদিন যুবকটি গহীন অরণ্যে গেল কাঠ কাটতে। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় যখন সে যুবতীটির কবরের পাশ দিয়ে ফিরছিল, তখন সে কবরের উপর খুব সুন্দর একটি ফুটন্ত ফুল দেখতে পেলো। ফুলটি সে ছিঁড়ে আনলো এবং নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিতেই তার অন্তরাত্মা মোহনীয় এক ঘ্রাণে আবিষ্ট হয়ে গেলো এবং অচেতন হয়ে সে ভূমিতে পড়ে গেলো। যখন চৈতন্য ফিরে পেলো তখন অনুভব করলো যে, তার হৃদয় থেকে সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পরের দিনও সে কাঠ কেটে ফেরার পথে সেই কবরের উপরে আর একটি ফুল দেখতে পেলো। সেই ফুলটি ও কিছু পাতা ছিঁড়ে এনে সে বিছানায় রাখলো এবং সেই সব নিয়ে রাত্রে ঘুমালো। আশ্চর্য, রাত্রে সে স্বপ্নে দেখলো সেই যুবতীটি তার পাশে শুয়ে আছে এবং বলছে: 'আমি আমার ভালবাসার কথা তোমাকে অকপটে জানিয়েছি। তথাপি তুমি আমার কথা শুনলে না এবং আমাকে বিয়ে করলে না। তবে আমাকে তুমি আজকে এখানে এনেছো কেন। যদিবা আমাকে এনেছই, তবে ওঠো—আমাকে প্রেম দাও। আমি তোমার প্রেমাকাংখী। যদি তা না করো তবে আমি তোমাকে বিনষ্ট করবো।'

যুবকটি ঘুম থেকে জাগলো। আশ্চর্য, জেগেই দেখতে পেলো যুবতীটি ঠিক তার পাশেই বসে আছে। সে তাকে পরিতৃপ্ত করলো। এখন থেকে সে রাতে তার কাছে যুবতীরূপে আবির্ভূত হয় এবং দিনে পুষ্পরূপে কবরের উপরে ফুটে থাকে। যুবতীটি একদিন বললো: 'আমি অবিবাহিতা অবস্থায় মরেছি। কাজেই আমি যে ফুলরূপে ফুটে থাকি তাতে কোন বীজের উদ্ভব ঘটিবে না।

অতঃপর একদিন যুবকটি মারা গেল। তাকে একই কবরে সমাহিত করা হলো। তাদের উভয়ের ভালবাসার নিদর্শন রূপে গজালো তামাক পাতা। তাই তামাক পাতা সবার কাছেই এত প্রিয়।

এই ভাবেই নাকি পৃথিবীতে তামাক পাতার আবির্ভাব ঘটেছে বলে কোন সমাজ বিশ্বাস পোষণ করে।[১]

সিলেট ও আসামের খাসীয়াদের পান পাতার জন্মবৃত্তান্তও কাহিনী নির্ভর। কাহিনীটি এইরূপ

দুই বন্ধু ছিল। একজন খুব ধনী আর একজন নিতান্ত গরীব। গরীব বন্ধু ধনী বন্ধুর বাড়িতে বেশী যাতায়াত করতো এবং নানারকম সাহায্যও পেতো। ধনী বন্ধুর কাছে তার ঋণের অন্ত ছিল না। অথচ বিনিময়ে সে কিছুই দিতে পারতো না। গরীব বন্ধু ভাবলো যে অন্তত একদিন তার ধনী বন্ধুকে দাওয়াত করে খাওয়ানো দরকার। এই ভেবে সে তাকে দাওয়াত করলো।

যথাসময়ে বন্ধু এসে উপস্থিত। ভগবানের কি বিচিত্র খেলা! সে অনেক চেষ্টা করেও ধনী বন্ধুর জন্য কোন খাবার যোগাড় করতে পারলো না। বন্ধু না খেয়ে ফিরে যাবে এই লজ্জায় তার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার এলো এবং সে নিজের বুকে ছুরিবিদ্ধ করে মারা গেল।

তার স্ত্রী এই দৃশ্য দেখে মনে করলো যে তারও বেঁচে থেকে লাভ নেই। সুতরাং সেও সেই ছুরি এনে নিজের বুকে বিদ্ধ করে স্বামীর সহগামিনী হলো।

ধনী বন্ধু তো অবাক। সে ভাবলো যে তার জন্যে তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী মারা গেল, সুতরাং তার বেঁচে থেকে কি ফায়দা। কাজেই সেই ছুরি এনে ধনী বন্ধুও আত্মহত্যা করলো।

সেই বাড়ীতে জীবিত বলতে আর কেউ রইলো না।

কোন মানুষের সাড়া শব্দ না পেয়ে দুপুর রাতে সেই বাড়ীতে চোর প্রবেশ করলো। চুরি করা সময় তিনটি মৃতদেহ দেখে চোর মহা ভাবনায় পড়লো। সে চুরি করবে দূরের কথা এসব দেখে চিন্তা করতে করতে ভোর হয়ে গেল। সে ভাবলো যে এখন ঘরের বের হলেই তাকে লোকে ধরবে, কারণ সে যে চোর একথা সবারই জানা। শুধু তাই নয়, তাকে এই তিনটি খুনের দায়েই অভিযুক্ত করবে। কাজেই ফিরে গিয়ে লাভ কি। সুতরাং সেই ছুরিটা দিয়ে সেও আত্মহত্যা করলো।

এসব দেখে ভগবান উব্লাই নাং খউ অলক্ষ্যে হাসলেন এবং তার ইচ্ছায় চারজন মানুষ থেকে সুপারি পান চুন ও খয়ের জন্মালো। ধনী বন্ধু প্রথমে এসেছিল বলে সে হলো সুপারি, গরীব বন্ধু পান, বন্ধুপত্নী চুন আর চোর হলো খয়ের।[১]

উপরে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে পান পাতার জন্ম বৃত্তান্ত পর্যন্ত কাহিনীসমূহে রয়েছে আদিবাসী সমাজের পারিপার্শ্বিকতার পূর্ণ চিত্র। তারা যে তাদের অলস মুহূর্ত নির্ভাবনায় কাটাযনি এসব কাহিনী তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আদিবাসী সমাজ সহজ সরল এবং সুখী জীবনের অধিকারী। যে জন্যে এমনসব চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি তাদের মনের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতই ভাস্বর হয়ে আছে। সেই আলোর একটা বেশ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পরিণত মস্তিষ্ককেও বার বার এসে ধাক্কা দেয়।

৭

বিশ্ব প্রকৃতির জন্ম বৃত্তান্ত ছাড়াও আদিম সমাজে মানব-মানবী, রাক্ষস-রাক্ষসী, পশু-পাখী, জীব-জন্তু ইত্যাদি কেন্দ্রিক কথা, উপকথা, রূপকথা প্রভৃতির অন্ত নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, আদিম সমাজ সহজ সরল এবং আনন্দপ্রিয়। ঘরে একবেলা খাবার থাকলে দ্বিতীয় বেলার জন্য তারা চিন্তায় মুষড়ে পড়ে না। 'Eat drink and be marry' প্রায় সব আদিম সমাজেরই জীবনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কাজেই আনন্দ উদ্রেকের জন্য নৃত্য গীত যেমন তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তেমনি গল্প বলা বা গল্প শোনার প্রবণতাও তাদের মধ্যে অধিকমাত্রায় লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিম সমাজে এই রীতি প্রচলিত এবং তাদের গল্প কাহিনীর পরিধিও বেশ বিস্তৃত। এইসব গল্প কাহিনীর বিষয়বস্তুতে রস, হাসি ঠাট্টা, কৌতুক ছাড়াও রয়েছে নীতিবোধ এবং এই নীতিবোধই গল্প কাহিনীর প্রাণ। বাংলার লৌকিক কাহিনীসমূহও যে এসব প্রাণ পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের আদিম সমাজে যেসব কথা উপকথা কিংবা রূপকথা প্রচলিত সেসবের নায়ক নায়িকা বা প্রধান ভূমিকার অধিকারী হলো মানব-মানবী, ডাইন-ডাইনী, জিন-পরী, রাক্ষস-রাক্ষসী, এবং পশু-পাখী বা জন্তু-জানোয়ার। মানব-মানবী যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে সেখানে পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরালে অবাস্তব, অলৌকিক এবং কল্পিত বিষয়বস্তুর

অবতারণা থাকলেও নীতিকথা এবং রসবোধ উভয়ই প্রধান। এমনকি কোথাও কোথাও দুঃসাহসী এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বীর চরিত্রের আভাসও লক্ষ্য করা যায়।

ডাইন-ডাইনী, জিন-পরী, রাক্ষস-রাক্ষসী কেন্দ্রিক গল্পগুলোতেও মানব-মানবী সম্পর্কিত এবং আদিম সমাজের অন্যতম- বৈশিষ্ট্যময় দিক নরমাংস ভোজন রীতি বা ক্যানিবালিজম সংযুক্ত।

পশু পাখী বা জন্তু-জানোয়ারের চরিত্র বিশ্লেষণাত্মক কাহিনীসমূহেও মানব-মানবী সম্পর্কযুক্ত এবং সেখানেও নীতিকথা বা রসবোধ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বলা আবশ্যক যে, আদিম সমাজের কথা উপকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো অলৌকিক জনশ্রুতির প্রভাব। তাদের ধারণায় কাহিনীর বিষয়বস্তুতে যতই অবাস্তব বা অলৌকিক ভাব প্রাচ্ছন্ন থাকনা কেন ঘটনা পরম্পরার সত্যতা সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ, এমন কি কোন কোন আদিম সমাজে তা ধর্মীয় বিশ্বাসেও সম্পৃক্ত। উদাহরণ স্বরূপ গারো সমাজে প্রচলিত 'ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তুরা পর্বতের লড়াই' শীর্ষক কাহিনী, চাকমাদের 'রাধামোহন ও ধনপতি কিত্‌তা', 'চাদিগাং ছাড়া' ও 'জামাই মারানী কিত্‌তা', মুরংদের 'গো হত্যা অনুষ্ঠান' মনিপুরীদের 'খাম্বা থৈবীর প্রেম' এবং [illegible] নাম করা যায়। এসব কাহিনীর বিষয়বস্তুতে একদিকে [illegible] চরিত্রের [illegible], অপর দিকে তেমনি [illegible] ও নীতিবোধ। [illegible] আদিম সমাজে [illegible]।

রাক্ষস-রাক্ষসী এবং জিন-পরী কেন্দ্রিক রূপকথাও আদিম সমাজে [illegible] রয়েছে। বাংলার লোক সাহিত্যের অন্যতম শাখা রূপকথায় যে ধরনের গল্প কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে আদিম সমাজের রূপকথাও তা থেকে ভিন্ন নয়। বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই এক কিন্তু বর্ণনা এবং কাহিনী সৃষ্টিতে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করার রীতি লক্ষ্য করা যায়।

রাংগামাটি থেকে 'গুজাংগা লোহ কানার কিত্‌তা' বা গুজা ও কানার কাহিনী' শীর্ষক যে রূপকথাটি সংগ্রহ করেছিলাম তার সঙ্গেও বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত আকারে

কাহিনীটিতে জানা যায় যে, এক বিধবা বুড়ি ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। একজন গুজা ও অপরজন কানা। বুড়ি দুঃখে দারিদ্রে দিন কাটাতো। তদুপরি ছেলে দু'জনও অকেজো, উপার্জনক্ষম নয়। ভিক্ষে করতে গেলেও কেউ ভিক্ষে দেয় না——কেবল 'গুজা' ও 'কানা' বলে ঠাট্টা করে।

'মরার উপর খাড়ার ঘা'—মনের দুঃখে তারা বনবাসে রওয়ানা হলো। রাস্তা থেকে তারা কুড়িয়ে নিল মোষের মাথা, দড়ি এবং চুনভর্তি পাতিল - ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই আশায়।

রাস্তা চলতে চলতে তারা পৌঁছে গেল এক রাজপুরীতে। সেখানে দালান কোঠা সবই আছে। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ নেই। তারা গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক ছাড়লো, 'কে আছো?' উত্তর এলো, 'আমি রাক্ষস।'

তারাও ভয় পায় না। বীরদর্পে উত্তর দিল, 'আমরা পাক্ষস'। অর্থাৎ রাক্ষসের চেয়েও ভীতিপ্রদ, পাক্ষস।

রাক্ষস প্রমাণ দাবী করলে তারা মাথার চুল স্বরূপ দড়ি, উকুনের নমুনা হিসেবে মোষের মাথা এবং কফের নিদর্শন হিসেবে চুনের পাতিল দিতেই রাক্ষস ভয়ে অস্থির।

যাহোক, তারা কৌশলে রাক্ষস বধ করলো এবং রাক্ষসের সারা জীবনের অর্জিত ধন মনি-মানিক্য, সোনা-জহরত দখল করে ফেললো। তবু তাদের মন ভরে না তারা যার গুজা ও কানা রইলো না। হলো রাজপুত্র সদৃশ চেহারার অধিকারী। অতঃপর তারা এক রাজার মেয়ে এবং অপর ভাই মন্ত্রীর মেয়ে বিয়ে করে বিধবা মাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে শুরু করলো।----

পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে এখানে 'মূল চাকমা ভাষা সহ কাহিনীর উল্লেখ করছি। কাহিনীটির পরিধি দীর্ঘ হলেও এর বর্ণনা কৌশল এবং রসাপ্লুত ভাবধারা আমাদের আকৃষ্ট করে। কাহিনীটি এইরূপ:

এক্কে এউক্যা বাদীপিদি মিলা। তাগুন নেক নেই, মা বাবও নেই। বানা বানা তাত্তুন দ্বিবা পোয়া। সেত্তুন এউক্যা গুজাং আর এউক্যা কানা এজ। আদাস্যা পাড়াইল্যা মানষ্যে সে বেদন তার পোয়া দ্বিবানে গুজাঙ্গা ও কানা নাং এ দাগিত্তাক। বাদী পিদি মিলা বোজ নেউক্যা

চের পাচ মাস আগে মারা যিযন। সেক্কে তারাত্তুন জাগাজমি নএল। ইক্কে তাবা ভারী দুগত পুড়ি গেলাক। সেত্তি কিত্তাই তারাত্তুন এগগান ধানর ক্ষেদঅ নেই। আব তাবা জুমঅ কাবিদ নঅ পরদঅ। রানী পিদি মিলাউব্যাব নেক্কে সিউন কামালঅ সিউন ইক্কে যেই ফুরিয়ে। এদা-ত্তেই বানী পিদি মিলান মনদ সুগ নেই। ইক্কে কি গুড়িত্তে আর তান ছিবা পোযা খেই পাবিন। সমান মনদুগে আন চিদায় তাগদে তাগদে তান কিয়াননান শুকেই ফেইলো। বেজানা আব কি গুড়ি পারিন। কিচ্ছু উপায ন দেখিন্যাই সেবেদন তান আদাস্যা পাড়াইল্যা মানষ্যাব ঘরে ঘরে যিইন্যাই ভিক্ষা মাগদ। ভিক্ষা মাগিদ যেইনে যেই সোব সোব গুনাদক তরিন্যাই ভিক্ষা পেদ। তান সোন সোর হভায় ন পেদ। সিদিন ভিক্ষা ন পেদ সিদিন আব কি গড়িব। সিদিন উপাস থে পেদ। আব তাব পোযাগুন ভাদত জ্বালাই সিদিন কানি কানি থেদাক।

এদইক্কাগুড়ি ন্যাই এইজ্যা যায কেইল্যা যায বজয় বোঅ গেল। তান অবস্থান ফিবি ন' এল। আগ যেদইক্ক্যা মন দুগত তেইন্যাই কিয়ান ভাঙ্গি ফেইল্যো সেত্তুন বেশ ইক্কিনি কিয়ান ভাঙ্গি যেই ন্যাই চাঁদোবির্বান্ত তাবে দব গড়ত। তে এবাব মবদুন নিগলিত নপাবদ। কিআই তারে মানষ্যে দেগিলে দবিন্যে ধ্যাই দূদু গড়ই। এবাব তে সোবদন ভগবান বর মাগিদু তে ভগবানবে কঅত্তে: অ ভগবান—তুই মরে এদইক্কা দুগত কিত্তাই ফেই-ল্যাস্ দে। কিত্তাই মরে মারেই ন' ফেলেইন্যাই আগ্গাছ। তুই মরে এবাব মারে ফেলেবাত্তাই কঅংদে। মুই এদইক্কা দগত খাআই ন খাআই সমান। মরে তুই মাবেই ফেল্লেদে হদ। মরে বেগগুনে দেগিলে হাসি-দাগ ও ঠাট্টা মচকাবী গড়ি দাক। এমুদ ভিক্ষা মাগা গেলে ও মরে আদাস্যা পাড়াল্যা মানষ্যে গেইল দিনাই ধাবেই দিদাক।

এদইক্কা দুগত গুড়িন্যাই সে মিলাউব্যা তাগদে তার কিয়ান চেই ন পাবে পারা অযে। সেইত্তাই তারে আর এক জনে অ খোঁজ ন পেদাক। আর তে জাদামত ভিক্ষা মাগা গেলে অ চিকনড়া গুনিন্যাই দাবেই দিদাক। আর টিয়ে টিয়ে গুড়িন্যাই পাড়াইল্যা পোয়া বেগগুনে তারে কুকুর বাজেই দিদাক। তে সে বেদন ভিক্ষা মাগা ন' যায় আর তে থেক্কে আর ভিক্ষা মাগি আত্তাই। আদামে আদামে গুজংগ্যা আর কানা দিবেই ভিক্ষা মাগিত

বিনে যেহই সেবে সেবে ভগাদন ওবিন্যাই ভিক্ষা পেদাক আব সেবে সেবে ভিক্ষা সবাং নং পেদাক নে দিনান ভিক্ষা পেদ সেদিন্না ভিক্ষাদ পানুদে চুন বানিন্যাং বানি তান তেংজুনে ভাগ বুগ ওড়ি খেদাব। বদু গেদ ভবদত্তা না। কদু কদু নত ভবদত্যা কোন দগেই গৌবনানি বাচেই খেদাব।

একদিন না তিনজনে তিন কিনাদি মানষ্য ঘন ইদু ভিনা মাগি বাঙই বিবন কনঅজন ভিনা ন নে ন্যাই সুদান ওড়ি ঘবত এলাক। এ দইংগা ওড়ি এইংগা দাব বিন্না দাব তাবা বেগওন তাগনত। চেবাদি তাব দ্বিবা গোবাভুন তানী নন দুগ অল। তান মেবদন বেদব ভিদাব ছল্লাহ গড়নাক। কল্লা বিল্লা নত্ত্যা নন বেদ সম্বাব্দ দ্বি বেই ভিক্ষা মাগি নাতাই বাহিব অবাব।

তানা দ্বিবেং ঐ ছন্না ওড়ি ন্যাই বেদব ভিদাব ঘবত্তুন বাহিব অয গেলাক। খানদি চগে পা দেখন সিনদি যাদন। গুজাংগ্যা এউকা সানিন আগে খায কানাব এউগ্না কাদা বানা আগে। গুজাংগ্যা গুজং গুজং গুড়ি তাব লাদিকু ধবি ন্যাই হাদে আয কানা তাবে ধবি ন্যাই তাব পিজে পিজে যাগ। কানা যাদে বাদে বিযত সিযত চুপ খায আন গুজংগ্যা ষচন নীচ পথদ হাদিতে এক্‌কই আছাড খায। গুজাংগ্যা দাবা দাবা গেনে সোতেঅ যেহ ন পারে। সেবেদন কানাটিন বাগ উদে।

এদইক্ষা দুবদ পথদ ও বেইনো যেই মুডা মুড ছডাছডি পান অলাক। তুঅ তাবা যানা খুব নগই। আব কদুর যিইন্যে যেই তাবা এউকা মুডা গোড়াদ নুংগিল গোই। সেক্‌কে তাবা দ্বিবেং হাদিতে হাদিতে হতাথ গুজাংগ্যা পথদ এগগান মোম কাদ্দি পেল। গুজাংগ্যাদ তাব সাদা লাগাই নপাবে। এদাতেই গুজাংগ্যা কানাবে যে মোম কাজিযান তাব বালা ভিদবে ভব পাট্টাই কঅন। কানা সে মোম কাজিযান গুজাংগ্যাব বালা ভিদবে ভবাবদ কঅতে অ বেই। আব ইযান কি ভবাক্কতেব কানান এদইক্ষা নদাঅন গুনিয়াই গুজাংগ্যা ক অত্তে তুই এক্‌বালে চু চান্দে সিযান বালা ভিদবে ভবাদেই। কানা কঅত্তেয বেই। মুং কি ভবাইযং। তুই লাআড়ে লাআড়ে হাঁদ। মুইত আব হাদি নপাবি। গুজাংগ্যা লাআড়ে লাআড়ে হাদা দিল। আব কদুব যাদে যাবদ গুজাংগ্যা অব দব মুখে পথদ এউক্যা

ওমা চিকিদ্দি থোবা পেলাক। সিবাঅ বালা ভিদরে ভরাবাতাই তাববেই কানাবে কঅলাক। কানা তার বেইব কদা শুনিন্যাই সে ওমা চিবিদি থোবা কানা। ভিদবে ভরেলাক। অা কদ্দুব যেইন্যাই এক্কান ওমা দূর পিট মাব পেলাক। সে দূর পিট মাথান ডুমব পাবা অমা অব। সিযান অ কানা ঝলা ভিদরে রাখিলাক। এদইক্ষা গুড়িন্যাই তিনান জিনিজ ঝলা ভরেন্যাই তাবায় ঝলা বোত্ত খুব ভাবী অয়ে।

তাবা দ্বিজনে বদলা বদলী গুডিন্যাই ঝলা বোঅলদাক। আ কদ্দুব যেইন্যাই গুজাংগ্যা এউক্কা পাদা ধুল দেকক্ষ্যে, সিবাঅ বলে বলে কাঁদত্ত গুড়িন্যাই ললাক।

এদিন দ্বিদিন তারা এদইক্ষা গুড়িন্যাই হাদা হাদির পর তাবা এক নাংনা জাইন্যা বেজ্যত লুঙ্গিলাক্যয়। সেই বেজ্যত কোন ও মানষ্য ন খেদ। বানা এউক্যা রেক্ষস খেদ। সেককে যে রেক্ষস খেদ সিযান তাবা দ্বিবেই মোতেঅ নজানদঅ। তারা সেককে ভালুক দুবদ দুরদ জাগাদ হাদিলাক। তুঅ এগগান মানুষ্যব বাড়ী ঘব ওঅ দেগিলাগ। আ কদুব সেইন্যাই তাবা এগগান ডাঁঅর ঘব দেগিলাগ। তারা মনে গড়লাদে সিযান কনই মানষ্যব ঘব অব। সিযান ভাবিন্যাই তাবা দ্বিবেই যাদি যাদি সে ঘর মুযো লড় দিলাক। সে খবব দুযাবানদ যেইন্যাই তারা সে ঘবান এগগান পাক্কা ঘব দেখিন্যাই আসক অলাক। তারা সে ঘবয় চেবসিক্কা বেডানন। তাবা বেযাগ গাইন ঘবদ বেড়ালল তুঅ সেককে এউক্যা মানুষ্য অ নঅ দেগিলাগ। তাবা সেককে বেডাদে বেডাদে আ এগগান ঘবদ সেইন্যাই দেগিনবদ সে ঘরানর দনজা গান বন্দ দেখিন্যাই গুজাংগ্যা দবজা গানদ হা দিইন্যা দিই বাজারে। সে ঘবানদ অ বেইক্সগা খেদ তাব নাম এন হুত্তুইস্যা। সে বেজ্যৎ হুত্তুস্যা ভিনে আর কোনও মানুষ্য নয দেব দাব্যা নয বেক্ষস নঅখেদ। সে বেইক্ষস্যা সেরে সেবে সেত্তুন নিগ-লিন্যাই মানুষ মিলা দোলা মাওগোই। মানুষযুন মাবিন্যাই তে পেদত ভবাই খেদঅ। খেইন্যাই, মিলা মানুষত্তু সোনা দোলানী পেলে তে গিউন এক্কানট জমা গুড়িন্যাই তার খবব ভিদরে রাখেদ। সে বেইক্ষস্যা এদইক্ষা গুড়িন্যাই একতাল মানুষ মারিন্যাই সোনা রূপা গযে্য। বেদ হলে তে সে সোনার তালয উড়ে হুদি খেদ। যিদিন গুজাইগ্যা লোহ

কানা হুত্তুইম্যা রেইক্ষসব ঘরর ভিদরে সোনার তালর উচব ঘুম যেদ এল। গুজাইংগ্যা লোই কানা সে রেইক্ষস্যার ঘবর ভিদরে চলেলাবাত্তেই ভাবী চিদা গড়ল কিন্তু তারা রেইক্ষস্যাব ঘরব দরজা গান মেলিন পাবে। সিযা-নেদে সে হুত্তুইম্যা রেইক্ষস্যা এল সিয়ান গুজাংগ্যালোই কানা মতেও ন জানদ। তারা মনে গুইন্যংদে সিযান কোনতা মানুষর ঘব অব এদইক্ষ্যা ভাবিন্যাই তারা সে রেইক্ষস্যার ঘরর দরজাগান বাইজ্যার। তারা বেশ কদক্ষন বাইজ্যান। তুত্য সে ঘরর ভিদত্তুন কোনএ রঅ নএযে। বেশ কদক্ষন বাজ্যান্যাই তারা হবান হইয়ং। ও জ্যাংগাতে কানা বেশ চালাক এল। তে ও জাইংগ্যারে কঅলদে অ দেই তুই মকদাআন ক্ষন। এ মুইদ নদেখং দরজাগান কি ঘিকা আধে মুই এবার দরজাগান ত্যমাওড়ি ন্যাই বাইজ্যা। গুজাইংগ্যা তার বেই কানার কদাআন ওনিন্যাই এবাব বেইক্ষস্যার ঘরব দরজাগান বেশ অমা ওড়ে ন্যাই বাই জ্যাইলাক ইনদি বেইক্ষস্যা, বাবেতুন, রতা শুনিন্যাই তে হতায ঘুমতেন জাগিল। তে জাগিন্যাই ভিদবত্তুন কত্যস্থে, সেবা কান্না ম-দরজা বাইজঅর। তোবা কিতাই ম দরজাগান বাইজ্যাস্থে। মুইদ ঘুম যাংঅর। রেইক্ষস্যার এদইক্ষ্যা কদা শুনিন্যাই ও জাংগ্যালোই কানা বাআবেত্তুন কদা কয়। এও। ঘরব ভিদরে কউন্না। এদইক্ষ্যা ওড়ি ন্যাই তারা সিবা কউন্না সিবা কউন্যা কয়াকি গন্নাক। জেরদি রেইক্ষস্য রাগ উদি ন্যাই কঅল অ মুই রেক্ষস, তুমি কউন্নাহু বিজার গড়ল। যেক্কে তারা শুনলদে ঘরব ভিদরে সিবা রেইক্ষস, সেক্কে তারার মনদ ভাবী দর পেল। গুজাংগ্যা বেইক্ষস্যাব কদাআন ওনিন্যাই।

ধেই যাবাতেই চায, কিন্তু কানা গুজাংগাতে ভারী চালাক এল বিলি-ন্যাই তে তার বেই কানারে কঅদলদে অ বেই আমি কি তাই ধেই যেবং। মলে অ দ্বিবেই এক্কই সমারে মবিবং। তুই ধেই নযেইত। গুজাংগ্যা এই কদাআন শুনি ন্যাই তাত্তুন মনদ ভবসা অল। সেবেদন দ্বিবেইঅ অসা গুড়ি ন্যাই কঅলাক, আমি রেইক্ষস্যার উপরে পাক্ষস। তুই এজ্জন আমি দ্বিজন। আমি তর বাব। রাইক্ষস্যা পাক্ষস কদাগান শুনিন্যাই ভারী আমক অল, তে মনে মনে দরি ন্যাই ক অনাদ ই রেইজ্যত মুই বাদে কেয়ই ন এল। ইয়ান ঘর রেইজ্য। তারা কিতাই ইয়ত এইছো।

নাঃ তাবা ম শক্র অব. তাবাবে মুই দাবাই দিম। সিযান ভাবি বেইক্ষস তবে ঘবব ভিদন্তেবাআবে নিগুলি যেদে যাবাতেই এক্‌কানা গুড়ি ন্যাই গুজাং গ্যালোই কানাব কালাউযা দেখি ন্যাই। তাব মনদ আরতো ভাবী দব অন। সেবেদনতে আব ঘবব বাআবে নত্রযেব। বেইক্ষস ঘবব বিদন্তে বিজাব খড়ল। এত্ত। তুনিদ বেইক্ষস বাব গাক্ষস। চালেন। ঘবে তুমি কঅদে ক্কুমি ঘিজন ইযত কিআই এইচ্যচ্চদে কানা কঅলদে অং তুহ সিযান নঅ জানঅত্তে না। আমি এইচ্যাং দে তবেলইসাডি গুড়িন্যাই মাবি বাত্তাই। তুই আর এই বেইজ্যত খাআই ন পেবে। বেইক্ষস্যা তাবাব এই কদা আন শুনি ন্যাই এবাব আব অ ভাবি গুডিন্যাই দড়িন্যাই অমাগুডিন্যাই ক অলদে চালেন, তোমা বললান কিন দিক্‌কা আযে মবে সিযান এক্‌কনা দেগ অ।

গুজাংগ্যালোই কানা দ্বিজনে বুদ্ধি গুডিন্যাই সেককে তাবার ঝলা ভুদতে মোয কাটিযান নিগুলিন্যাই বেইক্ষস্যা কিয়া উগবে লুঙ্গি মাবি দিলাগ। বেইক্ষস্যা সিযান দেখিন্যাই দবপেল। তই কইত্তে আঃ ইযান কি। গুজাইংগ্যা ক অলতা। কি তুই কই ন পাবচ্ছ। সিয়ান আকক আমা কিযানব এগগান কেশ মিনিন্যাই লুঙ্গি মাবি দিযেই আই। বেইক্ষস্যা সিযান সিবান শুনিন্যায। ক অলদে উঃ এতমান কি তোমা কিয়ানর কেশ সিযান কইন্যাই বেইক্ষস্যা তাব ঘবদুন পিচাদ ধেইন্যাই তাবার দরে দাবা দাবা দিবে। দাবা দাবা যাদে বেইক্ষস্যা ছেড়েন্যাই নলাবুঅ সকা গু বাজিসে। কদু বিগে ন্যাই আবঅ তা ঘব যুগে ফিবি এযের। ফিবি-ন্যাই আব বিজাব গড়ন। অ গাক্ষস। তোমাব আব কি কি বলান আযে। কানা ক অত্তে আবঅ এইচ্যদ না। তুই চাআ আমাত্তে আর কি কি বলান আযে। সিযান কইন্যাই গুজাংগ্যা লোহ কানা শিয়ান শুনি ন্যাই আব ঝলাবাত্তুন দুন পিটান তাব কিযানট পডি ন্যাই পড়ি বিজার গযো সিযান আব কি। গুজ গ্যালোই কানা কত্যলাগ, সিযান কি তুই আমাতে বিজাস গড অত্তে, তুই কই ন পাবঅছ না। সিযান কি। সিয়ান আমানয ট্রুন এক্‌কান গুড়ি ছিনি ন্যাই ওর মিক্‌কা লুঙ্গি দিযাই আই তুই আর কিতাই আবঅ তুই এইচ্যছ। ধেই যেই নত্য পাবছ না। রেইক্ষস্যা সিয়ান শুনি মনে মনে দড়ি ন্যাই কঅনদে উঃ ইয়ান তাবাব

কি দইক্ষ্যা নয অইযে। এত্তমান নয তাবাব কিংঅবি যাআই পাবে। উ° পাক্কস মত্তন কদমান ডঅব। ইযান ভাবীনগই বেক্কস আবও দাবা দাবা ওড়ি ন্যাই ধেই যাইদে যাইদে কঅব, উ. গাক্কসেব কিবল। এদ-ইক্কাওডি ন্যাই তে ভয গডব। আব কি সাক কাডি কাডি ওডি ন্যাই ধেই যাব। বেইক্কস্যা ধেই গেলে গুজাংগ্যালোই কানা আবত্য চেষ্টা ওডি ন্যাই দেগিল তাবা বেইক্কস্যাব ঘবব ভিদবে চমে বাত্তাই। কিও সব গানব দবজা ভিদবেয়ে বানা এল বিলি ন্যাই তাবা বেইক্কস্যাব ঘবব ভিদবে চলেনাত নত্য পাবল। তাবা কিংবঅবি বাইক্কস্যাব বাদে বেইক্কস্যা ফিবি ন্যাই আব একবাব পেক্কস্যাব দাগি গুজাংগ্যালো বানাব ইদু গল, ে এই ন্যাই এই বিচাব গডব অ. পেক্কস তোমা ইদু আব কি কি আযে। তাবা শিযান শুনি ন্যাই তাবাব ঝলা বাত্তুন নিবিদি থেবাবা বেইক্কস্যাব কিযানচ সিনি পডল গোই বেইক্কস্যা সিযান দেখিন্যাই কঅত্তে আঃ ইযান কি। ইবাদ ভালুক বচং জিনিছ গুজাংগ্যা লোই বানা বন্ধি ত্তডি ন্যাই বেইক্কসাবে কঅনাদ এও, বেইক্কস্যা সিযান তুই কই ন পাবছ না। আমা-লোই চেনেনী গডাতে নাই। সিযান মামা এক্‌কানা ওড়ি ন্যাই বফ ফেন্যাং দে বেইক্কসা কঅতে উঃ পেক্কস্যাব মুযদ এতমান কয আযে তাবা ভাবী সাহাসী অব এই কদাআন কই ন্যাই বেইক্কস্যা দবে দাবাদাবা গুডি ন্যাই সেত্তুন ধাই যিয়ে, ইনদি বেইক্কস্যা যেক্কে ধেই যিযে গুজাংগ্যালো কানা সেক্‌কে বেইক্ক্যার ঘব ভিদবে সোলাত্তে চেছতা গড়ল, তুঅ তাবা সব ভিদ্দরে গেদে না পাবল। কিত্তাই সে ঘবব দবজাগান ভিধবে দিন্যাই কানা এল, তুই তাবা দ্বিবেই কিংঅবি বেইক্কাব ঘবদ যোযে সে চিদা গড়তে আবন্ত গডলাক, সেক্কে বেইক্কস আবঅ তাবাব ইদু লাআডে লাআডে ফিবিন্যাই গুজাংগ্যালো কানাবে কঅন অ পেক্কস তোমা ইদু আব কি কি অন্তব আগে। এবাব গুজাংগে লোই কানা বুঝি গুডি ন্যাই গুড়ি কলা-অলাক অ তুই গেবা ক অতেনা বেইক্কস্যা আসা ইদু ভালক ঘানি অন্তব আবে। ইম্মে তব বানা একখান ওডি ন্যাই ওড়ি জিনিছ দেখেবং আমি তব বাব। তবে এদাতেই নঅ মাবেনুং দে। তুই এই জ্যাঅ ধেই নত্য বিনে কিআই ইযত্ত এঘব। আইাচ্ছা। তুই যুদি আমাত্তুন আবঅ জিনিচ ছাআছ চালেন তবে আমি মাযেই ফেলেবং। তুই ইক্‌কে আব এগগান

জিনিষ দেগ। এই কদাআন কইন্যাই তারা যে ফাদা ধূললা আইন্যান সে ফাদা ধুললা তাবার বালা ভূদত্তুন নিন্যাই নিল। তই সিত্তুন এগগান বাঁজর কেইম নিন্যাই নি অমা অমা ওড়ি ন্যাই বাজদন। ধুল্লারে আ অমা ওড়ি ন্যাই বাজাদে সিবা গরুং গরুং রঅ গডেব সিয়ান শুনি ন্যাই শুনি রেইক্ষস্যা আর বিজাব গড়েব আঃ। সিবা কি অঃ পেক্ষস। গুজাংগ্যা লোই কানা তই কঅলাক, আঃ গড়অতে যে অ রেইক্ষস্যা। ইযান আক্কা আমি এক্কেনা গুড়ি নাই গুড়ি আতেই আই। বেজী ওবি ন্যাই গুড়ি আমি পাতেই লে তুই ইয়ও ইক্ষে মবি যেবে। এদাত্তেই আমি ডঅব ওড়ি ন্যাই নঅ পাত্তে। রেইক্ষস্যা গুজাংগ্যা লোই কানাব পাত্যঅ শুনি ন্যাই শুনি তাব মনে মনে কঅলদে উঃ ক্ষেসর পাত্যঅ কত্তমান তে কিংঅরি এতমান পাত্তা পাত্তেই না মুই এ রেজ্যত ন থেইম মুই অন্য বেজত চলি যেইম। এদে থেযলে তারা মবে সত্য সত্য ঘেবাক ইয়ান ভাবিন্যাই ভাবি তে ওজাংগ্যা লো কানারে ক অনদে অ পেক্ষস মুই নিছেই এত্তুন চলি যেইম। কিন্তু তুমি মর এগগান কদা রাগা পড়িব। ওজাংগ্যা লো কানা ক অনদে সিযান কি। বেইক্ষস ক অব, মুই এগগান রেইদ ঘর ঘর গানদ থেই নত্য পারি না। মুই কেইন্যা যেইম, তুই রেইক্ষসাব কদা শুনি ন্যাই শুনি গুজাংগ্যা লোই কানা এক্কই সমাখে বুদ্ধি গুড়ি ন্যাই ওড়ি কত্যনাদ না। তুই ইযত আব খা আই না পাবচ্ছ ইক্কে তরে আমি সেষি দিন্যাই দি যাবেই ফেলোবং। তুই আমা সমারে নাড়ি গডতে চঅতেনা। ছাআলেহন তুই আমা সমারে লাড়ি গড়। এদইক্ষা কইন্যাই কই গুজাংগ্যা লোই কানা বুদ্ধি গুড়ি ন্যাই গুড়ি ন্যাই তারার ফাদা দুলনা বাইজ্বাদন রেইক্ষস্য যে বঅ ওন্যান সেককে তে দরে দাবা দাবা ধেই থিয়ে। এবার আর ন এযে। রেইক্ষস্যা সে বেজ্য ছাড়ি ন্যাই ছাড়ি অন্য রেজাতে ধেই ন্যাই ধেই বাজ গড়তে আরম্ভ গড়ল।

ইনদি গুজাংগ্যা লোই কানা দে বেইক্ষস আর এত্তনয়, তে ধেই যিয়ন। তারা তই রাক্ষস্যার ঘরর ভিদবে যাইবাত্তে চায়। কিন্তু যেই ন পারে, তাবা জেরদি রেইক্ষস্যাব দরজা গান ভাঙ্গি ঘরর ভিদরে চলেলাক। চযে ন্যাই চমে তাবা ঘরর ভিদবে তারা দ্বিবেই আমক অলাক, ঘবর ভিদরে বেয়াগ সোনা রা পাদীর তাল। কতদইক্ষ্যাব দোস দোল জিনিষ রেইক্ষস্যা

তরে ঘরর ভিদরে আইন্যন তবে পাতা নেই। তই তারা বুদ্ধি ওডি ন্যাই ওডি তারার ঝলাউ বা গম গাডি লন। তই সিবার ভিদরে এবং ভাল সোনা রূপাদি ভবে ন্যাই ভবে দ্বিজনে নাআডে নাআডে গুডি ন্যাইঘরর বাআরে এস, সেককে দিন ওম্নি যেঐন্যে যেই বেইদ হতন। কানা কত্যাত্তে অ বেই এত্ত বেইদর ভিদরে আমি দ্বিজনে ঝলাউবা নিইন্যা নি কিংগডি হাদি যেই পারিবং, মুইদ মোতেত্য চউগো নদেগ°। এইজ্যা বেইদ আমি দ্বিজন ইগত থেই যেবং কেইল্যা বেইন্যা পঅর তালে বোলাউবা নিইন্যা নিউ ঘর মুবো অবং কানার কদাগান এবংব গুজাংঘ্যার বেশ মনে নাগল। তেত্য ভাবিন্যাই ভাবি দেগিন দে বেইদর ভিদবে পথ্য হাদি যেদে তে যিয়ত যিযত তুশ খেব। সিযান তে ভাবীন্যাই ভাবিতেই তবে বেই কানারে কঅলদে ত্য বেই তুই বেজী গম বইবছ। এই কথাগান কইন্যাই কই তারা দ্বিজনে সিগাত ঘুমা বলাক। বেইদ সম্যাকদ অইযে, তারা দ্বিজন এগগান চবনদ পডি গোলাক। সিযান অল তারা দ্বিজনে হাদি যেদে যেদে ভালুতদুবদ লুঙ্গিলাঙ্গে তারা বালা বিদবর সোনা রূপাদি দ্বিভাগ গুডে ন্যাই গুড়ি লইযন। তারা গোদা বেউত্যো সিযত ঘুমদ কাদাই দিলাক। বেইন্যা পর অলে তারা দ্বিবেই জাগি উদিন্যাই উদি তারার ঘর মুখো বালাউবা দ্বিজনে বেদনা বদলী তডি ন্যাই গুডি হাদা দিলাক, তারা দ্বিজন হাদি যেদে কদঅ কদঅ ঝাড জঙ্গল কাঁতা বোন পার হত্যা-ন্যাই উজট ঘেই ন্যাই এওন তার পাতা নেই। এতে এআতে তারা দ্বিবেই আধাপদট এইন্যাই তারাত্তু তারায কেইন্যা বেইদর ছবদর কদাগান ছবন অল। কানা আগে উদি দিইন্যাই দি কয তাঁ বেই মুই বিছাস গইন্যং মুইত্য হেদইক্ষ্য ছবনদ দেগদি, তুই ত্য বেই ভাবী গম কদা ছযন গইথাছ। ছালেন। অ বেই আর কুদু যিইন্যে যেই সোনা রূপাদি ভাগ গড়বং এদইক্ষা দ্বিজনে তই।

আবঅ তারা এত্তে এত্তে থিক আধা পথট এল। আধা পথট এইন্যাই তারা ঝলাভুদবর সোনা রূপাদি ভাগ গডতে আরম্ভ গড়লাক। কানাদ চগে নদেখং এদাত্তেই জাংগ্যা ভাগ গডবার সমদ এউক্যা বেশ চিগন আর এউগ্যা বেশ ডঅড গুডিন্যাই গুডি ভাগ বসাই লন। ভাগ গড়া অইয়ে। সেককে গুজাংগ্যা ডঅর ভাউক্যা লদ চায। কানা ক অলদে অ বেই

বাচ্ছুক তুই। মুই আগে দেখং ভাগ কনতা উঅড় আব কনতা চিগন অইযে। সিগান কইন্যাই কই কানা দ্বিবাভাগন উবে তাব দ্বি হাদ দিন্ন্যাদি বিজাবেই চায। যিবা উঅড ভাগ হতনা সিবা কানা লদত চায। মগন সিবাব উগবে কানাব হাদদান, বাগি ওদা গ্যানে কঅলদে অ নেই মুং এভাগ লেইম। তুই ও ভাগ তুই নঅ। গুজাংগ্যা কব, না, মুং তনে সিবা দিং তুই সিবা নঅ। তুই যিবাব উগবে হাত বাগিছমুই সিবা লেইম। কানা কিন্তু তান কদা শুন্দন চান। তে এবে ভাউক্যাব উগবে হাদ্দান এইয্যন। তে সিবত্তুন তবে হাদ নঅ তোলে। এদাত্তেত্তই গুজাংগ্যাতুন বাগি উদিন্যায উদিতে গেবেদন খাশ গুডিন্যাই গুডি কানব গালটি এউকা। স্বগাব লাগাই দিযে কানা কিন্তু সে চোগাব খেইন্যাই খেই হতাম গুজাং-গ্যাবে এউক্যা ভুক দিল। তাবা দ্বিজনে এদইক্ষা গুডি ন্যাই গুডি মানা মাবি গুডিন্যাই গুডিনে তাবাব লাভ গল। সিগান অল কানা যেক্ষে গুজাংগ্যাব চোগাব হেন সেক্কে হতাথ কানাব কানা চক্ষুন পেব অলাক। তে এবাব বেগাগ দেগি পাবে। আব গুজাংগ্যা যেক্ষে কানাব ভুক হেন সেক্কে গুজাংগ্যাঅ আব গুজা নঅ বন। সে বেদন তেঅ হতাথ উজ্জু অল। তে এবাব গমগুডি ন্যাই গুডি হাদি পাবে। ইক্ষে তাবা দ্বিজন খুশী অল। কিন্তাই তাবা দ্বিজন এবাব গম মানুষ অইযে। তই তবা দ্বিজন গম মানুষ অইন্যাই অই আবঅ দ্বিজনে ঝলাভুদবব সোনা রূপাদি ভাগ ন অগুডিন্যাই বদলা বদলী গুডি ঝলাউবা নিম্ন্যাই নিই হাদা আবম্ভ গভলাক। যে দে যে দে তাবা ভালুক দুন্দ লুঙ্গিলাগ গই। সিযত্তুন তাবা এউক্‌কা গাভুব ধনি ন্যাই ধনি তানাব ঝলাউবা ঘবদ মুযো সিবাত্তেই কঅন। সে গাভুববা ঝলাউবা হাদি হাদি গাব আন তাবা দ্বিজনে পিছদি এযেব। তাবাব বাডীদ এবাব সম্বদ, তাবা হাদত্তুন গুলাদক চোল কিনি আইনান। তাবা হাঁদিতে হাঁদিতে এককুাই চিদা গডতে এলাক। তাবাব মা'গ কিং অবি এতাদিন বাঁচে আস্যেনি। সিযান ভাবি ন্যাই ভাবি তিন-জনে যাদি যাদি ঘবদ যায। বেদ সম্যাকদ তাবা তাবান নিজ ঘবদ লুঙ্গি লাগগি। তাবা ঘবদ এইন্যাই এই তাম্মামাবে ডাকদন মা, মা। উদত। আমি ইসগোই। ঘবগানব দবজা খান মেল। তারা কদক্ষন এদইক্ষ্যাগুডি ন্যাই তাম্মাবে দাগে। তুঅ তাম্মাব কোনঅ বঅ তারা নঅ পেল। তাবা

তাম্মার রত্ত সেককে কিং অরি শুনি পেব তাম্মা বেজারী এর আগাদি চের পাচ দিন ভাবৎ তাদঅ খেই ন পেই ন্যাই মনা মনা গুড়ি তুম যাব। তার পোয়া দ্বিবা তার ঘবদ ফিরি এইচ্যেবে তেত মতেঅ কইদঅ নঅ পাবে। তারা তাম্মার কোনঅ রত্ত ন হুনিন্যাঃ এবাব অমা এমা গুড়িন্যাই দাকা আবন্ত গড়লাক। এবাব তাম্মা তাবাদ বঅ শুনি ন্যাই শুনি যাদি যাদি ঘুম ঘুম উদিল। ঘুমতুন উদিন্যাই উদি তাম্মা তাবঅ গানর দরজা গান মেলিদিল। মেলি দিইন্যাইদি চায়দে তার পোয়া দ্বিবা তার ঘবদ এইচ্যো তাম্মা তারাবে দেখিন্যাই দেখি ভাবী খুজী অল্ল। যাদি যাদি বিলার গড়ল আং মোঃ তুত্তলক তোরা এদ্বিন কদে যিযদ। মুইদ এইজ্যা চের পাঁচ দিন যাবৎ ভাত খেই ন পাই। মুইদ মবি যেইম। মতে পেট পুড়েব। তাম্মার একদা আন শুনি ন্যাই শুনি যাদি যাদি তাম্মারে কঅন। মা ভাদত্য রানঅ। মা এই কদাআন কইন্যাই কই তারা যে চোল আয়ন গিউন তাম্মার হাদত দিল। তাম্মা চোল দেখিন্যাই দেখি যাদি যাদি রান্যে তই বেয়াক্কুনে তারা এক্কানে বই ন্যাই বই ভাদঅ খেলাক। রেজদি তাম্মারে তারা ছব কদা ভাঙ্গি কইলাক এবং তারা যেই সোনা রূপাদি আইন্যন সেতুন ওলাদক তাম্মারে দেগাইল। তাম্মা সিউন দেগিন্যাই দেখি ভাবী খুজী অইয়ে ওই গছি লোয় ইদ্ বর মাগো। এদইক্ষা গুড়ি ন্যাই গুড়ি তারা মাস দ্বিমাস কাদান। তারপর লাআড়ে লাআড়ে আদাম্যা পাড়াইল্যা মানুষতুন জাগা জমিন কিনিতে আবন্ত গড়িলাক। আদাম্যা পাড়াইল্যা মানুষে তারারে দেখিন্যাই দেখি কঅনদ তারা কিংঅরি গম মানুষ অই যিযন। কানাদঅ আর কানা নেই, তার চক্ষুন গম অইযন। আর পুজাংগ্যাঅ উজু অইয়ন। কিন্তু একদাআন আদাম্যা পাড়াইল্যা মানয্যে তারার সবমুখে নঅকত্যাদ। এবাব বানী দিদির পোয়া দ্বিবাবে মানুষ্যে কানা নোই ও জাইংগারে এবাবত গম মানুষ। কিঅই তারা এদইক্ষাগুড়ি ন্যাই গুড়ি তারা বজর ছমাস ভারী সুগে কাদাই দিলাগ, এবার তারায় কোন অ অভাব নেই। কিন্তু তারা যে রেইদে রেইদে হতাথ ডঅর লুগ হইম্নন সিয়ান কেয়ই নজানদ। মানুষে মনে করলদে তারা ভগাবানর বরে গম মানুষ অইয়ন। কিন্তু তারাতুন এতা সোনা রূপাদি এল যে সিয়ান তারা কেরইকে নত্য কইদত্য এইযা যার কেইল্যা যার আর

দিন তাবা তাব মাবে কমনদে মা। আমি দ্বিবেই বো গড়িম কানা তাব বড় পো আব গুজাংগ্যা চিগন পো এল। তই গুজ্যাংগ্যাবে আগে বো গড়া বাতেই তাবাব মাবে কঅলঅ। তাম্মায অত্যনদে আইচ্ছা ম পুতলক ওবাম্নোই মুই মিলা দেখিম। কাযা কঅনদে মা। তুই মল্লাই বাজাব ঝী দেখ। মুই বাজাব ঝী বো গডিম, জেবদি মব বেইবে মন্ত্রীব ঝী বো গডাইত। মা তুই এই যা খা বাজাব বাড়ীত। বাজাব বাডীত যেইনো নেই তুই এই কদাআন বাজাবে খবব দে। তাম্মা তাবাব এই কদাআন শুনিন্যাই শুনি ভাবী আসক অলাক। তাম্মায তাবাবে কঅলদে তে বিং-অবি যেব বাজাব ইদু বোব কদা নিইন্যা নিই। তে যেই নপাবে কিঅই তাবা গবীব মানুষ। তুত্যা তাবা তাম্মাবে বাবে বাবে কত্যদ মা তুই এবাব বাজাব বাড়ীদ যা। আমি বাজাব ঝী আব মন্ত্রীব ঝী বো গড়ি পেডিম, আমি কি মানুষ নযনি। কিঅই ন পেবিম. নিচ্চয পেবিম। এদইক্ষা গুডি ন্যাই তাবা তাম্মাবে বাজাব ঝী বো গডবাতেই কঅনে তাম্মা মনে কবনদে তাবাব মাদা খাবাপ অইযে। এবাব নয তাবা এদইক্ষ্য কদা কই পাবে। সিযান ভাবী ন্যাই ভাবী তাম্মাব মনদ ভাবী চিন্দা অল। আং কিংঅবি তাব পোযা দ্বিবা আবঅ গম অব। তে এইদইক্ষ্য এক্কই চিন্দা গড়ে। আব দিন কানা তাব মাবে কঅনদে মা। তুই যুদি বাজাব ইদু ন নেইনে যোই বোব কদা ন কঅচ্ছ সেবেদন মুই বিত খেই মবিবং। তাব দইক্ষ্যা গুজাংগ্যা ও তাম্মাবে কঅনদে মা। তুই যুদি বাজাব ইদু ন নেইনে যোই বোব কদা ন কঅচ্ছ। সেবেদন মুই বিত খেই মবিবং। তাব দইক্ষ্যা গুজাংগ্যা অ তাম্মাবে কঅনদে মা। তুই ম বেইবে বাজাব ঝী বো গডা। পিচ্ছদি মুই বাজাব মন্ত্রীব ঝী বো গডিম। এবাব নয মুইঅ বিত খেই মবিবং। তাবাব এইদক্ষা কদাআন তাম্মায় বাব বাব শুনি প্যাই শুনি ভগবানেব ইদু কঅতে তা ভগবান তই মবে কিআই বাঁচেই বাইখ্যাস্বে মেপোযা দ্বিকাব কিম্নাই মাদা খাবাপ কইযে। মুই ইক্কে কি অবি তাবাবে গম গুডি পেবিম। তুই মবে দযা গডিদে। এদইক্ষা গুডি ন্যাই গুড়ি তাম্মায এক্কই ভগবানেব ইদবব মাগে। তুঅ তাবা বাজাব ঝী বো গডবাব কদাআন ছামিযা কয এই কদা আন আদাম্যা পাড়াল্যা শুনি ন্যাই শুনি তাবাঅ কঅনদে বানী পিদিব পোয়া দ্বিবাব

নিশচযই মাদা খাবাপ অইযে। তাবাবে ভুদে পেইগো। তুত্যা কানা লোই গুজাংগ্যা মানুষবে ন কঅনদে তাবা ইক্কে ডাঙ্গব মানুষ অইযে। তাবা ইক্কে বাজাব ঝী বো গড়ি পাবে। তাবা যে ইক্কে হতাব ডাঙ্গব মানুষ অইযন ইযান তাবা মানুষবে কিংঅবি কইদিত পাবে। কিডাই, জেবদি তাবাব শত্তুব বেজ্জা অয। ইযান ভাবি গুজাংগ্যালোই কানা তাম্মাবে অ নঅ কঅনদে তাবাতুন এস্বেব দ্বিসেব সোনা ৰূপাদী জমা আযে। তাম্মায গুজাংগ্যা লোই কানাব পীড়া অইযন ভাবি ন্যাই ভাবি কদ কদ বৈদ্য ওঝা আইন্যন। কিন্তু কেবই তাবাবে গম গুডিত ন অ পাবে। কিন্তু তুঅ গুজাংগ্যাবে লোই কানা তাম্মাবে দিসমাদানে কঅন নাগিলাক। মা। তুই বাজাব বাডীদ যা। আমি বাজাব ঝী, মন্ত্রীব ঝী বো গড়িবং। এদিন তাম্মা তাবাব কদামত বাজাব বাডীদ খিযে বাজাব বাডীদ যেইন্যো যেই কিন্তু বাডীব ভিদবে চমেলিত নঅ পাবে। কিতাই গেইভদ ছিবাই আযে। তাবা বানী পিদি বুডিবে চমেলিত নঅদে। তাবা গেইলদে আব মাবেই ফেটলত চায। তুঅ বানী পিদি বাজার বাডীতে ভিদবে যেদ চায। তে কঅন্নে মুই এক্কানা বাজাব সমাবে কদা কঅম। ঘবে এক্কানা চমেলিত দে। তুতা বাজাব ছিবাইযে বানী পিদিবে বাজাব বাডীব ভিদবে চমেলিত নদে। বানী পিদি আব কিগুডি পাবে। তই তে আব বাড়ীদ ফিবি যিযে। গুজাংগ্যা লোই কানা কঅন্নে অ মা। তুই যিযত নিই বাজাব বাড়ীদ। বানী পিদি কতলাদ যিই। মুই যিযন বাজাব বাডীদ। মুইদ বাজাব বাড়ীব ভিদবে যেই নাপাবি। কিঅই গেইতদ ছিবাই আযে ঘবে বাজাব বার্ডীব ভিদবে যাবাঅই নদে। মুই কিংগড়ি যেই পাবি, না মুই আব যেই নপেবিম। তুতা গুজাংগ্যালোই কানা তাম্মাবে কঅলদে তুই আবঅ যা তাক্সা আব কি গুডি পাবে। যেবাদি তাক্সা রাজাব বাডীদ যেযে এবাবতা বাজাব ছিবাই বানী জিদিকে বাজাব ইদুমেদ নদে। আব বানী পিদিঅ সেতুন কনঅ সিক্কা যেদনচায। এদইক্ক্যা গুড়ি ন্যাই গুডি বানী পিদি বাজাব ঘবব পথদ দ্বিদিন বন। জেবাদি বাজা এদ্দিন বানী পিদিবে শুযে সব মুখে দেখিন্যাই দেখি বিজাব গডল কি বুড়ী। তুই কিঅই এই চ্যাছদে। বানী পিদি কঅন্নেমুই এগ্যান সালিশ গইত্যানে পছছিদে। রাজা কঅলাদ ঘব সমারে আয। এই কদা

রানী পিদি শুনিন্যাই শুনি রাজার সমারে রাজার বাড়ীর ভিদরে গেল। রানী পিদি কঅল্লে অ রাজা মল্লে দ্বিরা পোয়া আসে রপোযারা রাজার ঝি রো পড়ত চায়, আর চিগন পোয়ারা মন্ত্রীর ঝি রো পড়ত চায়। তুমি দিই পার নি। রাজা রানী পিদির এই কদা শুনিন্যাই শুনি তার ভাবী রাগ অল। রানী পিদিরে মারেই খেদাই দিল। তই রানী পিদি বাড়ীদ গিয়ে আগতা তা পোয়া দ্বিরারে তা দুগর কদা কঅল। তারা কয় মা তুই আগতা না। এবার রাজা কি হয় দেগ। জেয়াদি রানী পিদি রাজার সম্মুগে গেল। রাজা এবার তার চগরে রাগ কঅ চুডিন্যাই গুডি তারে কঅলদে অ বুড়ী। তপোয়ারে মন ঝি দেবং। তুই মরে দ্বিগের সোনা দি পারি বিনি। এই কদা শুনিন্যাই শুনি রানী পিদি পামক অল। তা ঘরদ এ-ন্যাই এই তার পোয়া দ্বিরারে সে কদাগান কঅল। গুজাংগ্যা কোং কানা তারার ঝলারাতুন দ্বিগের সোনা নিই ন্যাই নি তাম্মার হাদত দিল। তাম্মারে কঅলদে মা। তুই রাজার ইদ্ দ্বিগের সোনা দিএস তাম্মা তারার কদামত রাজার বাড়ীদ সে দ্বিগের সোনা রাজার হাদদ দিল। সোনা লইন্যা লই রাজা ভাবি দেগিল দে তার ঝি রানী পিদিরে পোয়ারে দেঅা পড়িব। কিতাই তেও কদাদি ফেলিয়ে। ইয়ান ভাবি ন্যাই ভাবি খান কি গুড়িব। যিদিন বেৎ অর সিদ্দিনর এগগান সুর টিক গড়ল। সে সুগান রানী পিদিরে শুনাই দিল। রানী পিদিঅ ভাবী খুশী অইয়া তার পোয়া দ্বিরারে কঅলদে অপূৎলক। ব্যের সুর টিক গইযযন রাজা। ইকাকে রাডী পিদির পোয়া দ্বিরাঅ ভাবী খুশী হইন্যাই হই পুরমদে তারা এক বেই রাজার ঝি রো গড়ল আর এক বেই মন্ত্রীর ঝি র‍্যে গুডি ন্যাই গুড়ি বেজ্য গুড়ি খেলাক।

উপরোক্ত কাহিনীটি যে রূপকথার পর্যায়ভুক্ত তা আকৃতি প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। কাহিনীটি আকারে দীর্ঘতম। তাছাড়া কাহিনীতে বর্ণিত বুড়ির নাম গোত্র বা পরিচয়ও নেই। রূপকথার অন্যতম নিদর্শন দৈব প্রভাব বা ম্যাজিকও এতে সংযুক্ত। কেননা একমাত্র দৈব প্রভাবেই গুজা ও কানার পক্ষে অতি মানব পর্যায়ে পৌঁছে রাক্ষস হত্যা করা সম্ভব হলো এবং ম্যাজিকের গুণেই তারা কুব্জতা ও অন্ধত্ব হারিয়ে ভালো মানুষ হতে সমর্থ হলো।

রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত 'বাঁদরীর বিতত্তা' ও রূপকথা পর্যায়ের। কাহিনীটি মূল চাকমা ভাষাসহ উল্লেখ করছি।

ভালক বছর আগর কদা। এক দেশত এউক্কা রাজা মোগ পো নঃ সুগে শান্তিতে বাস গড়ত। রাজাতুন চের বো্যা গুনবান পো এলাগ। চের বো্যা পোততুন বেশ চিগন পো বো্যা বেগত নতুন বেশ চালাক। তার বড় বইযনে কোন মতে কোন দিগন দি তারে ঠগাই ন পারতাক। যারে কইযে তে চের দিগন দি পটু। কি বিদ্যান কি কামে কর্যে সব দিগন দি তার বড় বেইযনে যেযান ন পারতাক তে সেযান পারত। সেনত্যাই রাজা রানী তারে খুব বেশ আদর গড়তাক। কয়েক বছর পর পো গুন বো পেবার কাবেল অলন। একদিনে বেগ পোতুনরে তায়দু ডাকিলো তে কলদে, 'ও পুতলক, তুমি ও তিন বেই উপযুক্ত অযো। এবার ঠিক কর কুন কুনদিতুন বো আনিবা।

বড় পো্যাবা সেনে বল্লাক, বাবা, যে যে দেশত বান নিকেপ গড়িব তে সে দেশততুন বো আনিবো। রাজা সে কথাগান মনর খুশীয়ে মানি নিলো।

একদিন্যা রাজা চের পো্যাগুনে কলাক। বা অ পুতলক, কনদিন বান নিকেবা খড়লাক।

তারপর সেনে একদিন্যা বান নিকেপ গড়বার দিন স্থির অল। ডাঙ্গর তিন বেইয়ে উত্তর পুগে পচিচমে তিন ছিগনদি বান নিকেপ কর্ল্যাক। তিন বেইয়ের বান তিন দেশত গড়িলো। তারা তিন দেশতুন তিন নোয়া দোল দোল বযন্ত্র কন্যা পেলাক। এবার বেশ চিগন বেইযার তীর নিকেপ গরার পালা।

তেয়্যা খুব ভাবি চিন্তি আকাশ মক্খ্যা তীর নিকেপ গললো। হনেক দেশত পার হই এক অঘোর ঝাড়ত তীর পোল গোই। তগাদে তগাদে চীগন পো্যাবা শেষে ঝাড়ত খোঁজ পেলক গই। যে দেশত এক বাঁদরী বাস গরত। এবার এ খবর সেইল্যায় তিন বেইয়ে খুব খুজী হলাক। কারণ তাততুন নিচচয় সেই বাঁদরীরে বো হিসাবে গ্রহণ গরা পড়িবো এবার তারে ঠকাই পারবাক। বেগ বেইয়ুনে দোল দোল বো পেলাগ বানা তে এউক্কা বাদরী পেল। এবার তারে বেগ বেইয়ুনে খুব তাততা গড়া

আবম্ভ গর্ল্লাক। এভাবে তার তিন বেইয়ে তাবে তাততা করিযাততেই বাকী নূতন নূতন উপাই বাহির গরজোল। একবার তিন বেইয়ে ঠিগ কর্ল্লাক বেব বেইয়ের বো এর মধ্যে রান্না ইদাহদ দিল। এবার তারা নিচচয়ই জিতি পারিবেক। হদাহদ আরম্ভ অ'ল। তিন চের বেইয়েব রান্নার মধ্যে রাজা সব চিগন পো'র বো'র রান্না বেশ গম পেল। এবাব বড় বেই বেগুন ঠকি পেলাক।

তারপর আর একদিন্যা ঠিক কল্যাক বো এর মধ্যে বুনানানার হদাহদ তা অব। এবার এ কদা শুনিয়া চিগন পোর মনত খুব চিন্তা লাগিলাক। সেয়ান দেইন্যায় তারে বাঁন্দরী বিজার গললো। এর কি অয়াজিনা। তারপর তে কন, তরে কইন্যায় অ-কোন লাভ নেই। অনেক বিজাব গড়ানোর পরে কঅলতা কাইল্যা আমারার বোঅর মধ্যে বুনন হদাহদ হব তার উতরে সেই বাঁদরী বলদে এর কোন চিন্তার কারণ নেই। তুই কন চিন্তা ন গরিছ। বুনানর কামড় কাপড় বো বেএ গুনে রাজারে দেগেলাক তারপর বাঁন্দরীর তৈয়ারী কাপড় লইন্যায় চিগন পো বা রাজার দুত হাজির অল। এককান চিগন কাপড় চিরান মেলতে মেলতে রাজ্য ভরি গেল। তোয়া বেগ গাইন মেলা না অল। রাজা সেয়ান দেইন্যায় ভারী খুর্জী অলাক। এবারে অন বেগগুন পরাজয় অলাক। এবার খুব মনর দুগে অন বেইয়ুনে দিন যাপন করতন।

আব একদিন্যা ঠিক গচান দে তারার বো অব মধ্যে দোল হদাহদ অব। এ হদাহদানত ভাবা নিশ্চয়ই বাঁন্দরী জামাইব বোয়ে হদিবাক। এ হদা-হদাহদে তার কথা শুনিন্যা চিগন পোবার মাদাত বাঁশ পড়ে পারা অলা। বোয়াতে মনর দুগে ঘরত ফেরত এল। তারে দুগিত দেখিন্যাই তার বো এব মনত চিন্তা অল। ভাব বো মনে মনে কততে এছ্যা নিশ্চয়ই তে কোন কিছুথ্যাই মনত দুঃখ পেয়ো, শেযে বিজার গড়িনাই জানিলদে আগামী কাইল্যা তারার বো এর মধ্যে দোল হদাহদ অব। এই কথা শুনিন্যাই বাঁন্দরী জামাইপ বঅলদে তর চিন্তা গড়ন ন পড়িবো। তুই কোন চিন্তা ন গড়িছ। বানা তুই মরে এককান কাম সাহায্য কইল্যাই সব ঠিক অব সে কাম্যান অতে মুই যখন ম বাঁদর চামান ফেলেই যেইম সেককে সো চামান তুই আগুনত দি দিবে। তারপর বিল্ল্যা সময় মত বাঁদরী যখন তা

চামান ফেলেই অন্য কিতা যেয়ে সেককে বাঁদরী জামাই বো এর সেযান আগুনত দি দে। তাবপর বো এরে কঅল তুই মানুষ অ। সে কথা কদে কদে বাঁদরী মানুষ অল। তার ছোলে তারার ঘর আলোক পেলাক। বৈদত আলো দৈইন্যাই মানষ্যে মনে গল্লাক তাবার ঘর আগুন ধচেচ। কিন্তু সেইন্যায় দেখল দে আগুন নয়। চিগন পোয়র বো এর আলোয় তারার ঘরে আলোক পেলাক। এবারও হদাহদে তার জয় অল। আগ জনমও বাঁদরী অইককা পরী এল। এবার বাজা ভাবী খুজী হলাক।

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে এক রাজা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে শাস্তিতে বাস করতেছিলেন। রাজার চারজন গুণবান পুত্র ছিল। চার ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে ছিল খুব চালাক। তার বড় তিন ভাই কোন ভাবেই ছোট ভাইকে ঠকাতে পারতো না। যাকে বলে চালাক। কি জ্ঞান, কি বুদ্ধিতে তার বড় ভাইয়েরা যা না পারতো তা সে পারতো। এ কারণে রাজা এবং রানী তাকে খুব আদর করতো। কয়েক বছব পর তারা বিয়ের উপযুক্ত হলো। একদিন রাজা সব ছেলেকে ডেকে বললেন তোমরা এখন উপযুক্ত। এবার ঠিক করে বলো কোন দিক থেকে বৌ আনব।

বড় ছেলে বললো, বাবা, আমরা যে দেশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবো সেই দেশে বিয়ে করব।

রাজা মনের খুশীতে তা মেনে নিলে। একদিন রাজা চার ছেলেকে বললেন, বল, বৎসগণ কবে তীর নিক্ষেপ করবে।

অতঃপর একদিন তীর নিক্ষেপ করার সময় স্থির হলো। বড় তিন ভাই উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তিন ভাইয়ের তীর তিন দেশে গিয়ে পড়লো। তারা তিন দেশ থেকে তিনজন সুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে এলো। এবার ছোট ভাইয়ের তীর নিক্ষেপ করার পালা।

সে খুব ভেবে চিন্তে আকাশ মুখো তীর নিক্ষেপ করলো। অনেক দেশ পার হয়ে তার তীর এক গহীন জঙ্গলে গিয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ছেলে সেই জঙ্গলের সন্ধান পেয়ে গেল। সেই দেশে এক বাঁদরী বাস করতো। এই সংবাদ শুনে বড় তিন ভাই খুব খুশী। কেননা,

তাদের ছোট ভাইকে নিশ্চয়ই সেই বাঁদরীকে বিয়ে করতে হবে। এবারে নিশ্চয়ই তারা ছোট ভাইকে ঠকাতে পারবে। কেননা তারা সবাই পেয়েছে সুন্দরী সুন্দরী স্ত্রী আর সে পাবে এক বাঁদরী। এবারে সব ভাই মিলে তাকে ঠাট্টা করা আরম্ভ করলো। এ ভাবে তার তিন ভাই ঠাট্টা করবার নতুন নতুন উপায় বের করতে লাগলো। একবার তিন ভাই মিলে ঠিক করলো যে, চার ভাইয়ের স্ত্রী মিলে রান্নার পরীক্ষা দেবে। এবারে তারা নিশ্চয়ই জিততে পারবে। পরীক্ষা শুরু হলো। চার বৌয়ের রান্নার মধ্যে রাজা ছোট বৌয়ের রান্না ভাল বোধ করলেন। এবার সব বড় ভাই ঠকে গেলো

অতঃপর আর একদিন ঠিক করলো যে চার বৌয়ের মধ্যে কাপড় বুননের পরীক্ষা হবে। এ কথা শুনে ছোট ছেলে মহা ভাবনায় পড়লো। তা দেখে বাঁদরী স্বামীকে বললো যে, চিন্তার কারণ নেই। তুমি ভেবো না। অতঃপর বাঁদরীর তৈরী কাপড় রাজাকে দেখানো হলো। রাজা সেই মিহি কাপড় ছড়াতে ছড়াতে দেখেন যে তা সারা রাজ্যময় বিস্তৃত হয়ে যায়। অথচ সবটুকু শাড়ী ছড়ানই হয় নি। রাজা ভীষণ খুশী হলেন। এবারে সবাই পরাজিত হলো। মনের দুঃখে সবাই কাল কাটাতে লাগল।

আর একদিন সবাই ঠিক করলো যে চার বৌয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা হবে। এবারে নিশ্চয় বাঁদরীর স্বামীর স্ত্রী পরাজিত হবে। এ প্রতিযোগিতার কথা শুনে ছোট ছেলের মাথায় বাজ পড়লো। মনের দুঃখে সে ঘরে টিকতে পারে না। তার দুঃখ দেখে তার স্ত্রীর মনে ভাবান্তর দেখা দিলো। সাক তবু সে স্বামীকে বললে যে তার কোন চিন্তার কারণ নেই। আরও বললো, কাল সকালে এক ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি যখন আমার বাঁদরীর চামড়া ফেলে দেব সেটা তুমি আগুনে ফেলে দেবে। আর তুমি আমাকে বলবে, তুই মানুষ হ। যেমন কথা তেমনি কাজ। বাঁদরী এবারে মনুষ্য রূপ ধারণ করলো। তার সৌন্দর্যে সমস্ত ঘর আলোকিত হলো। বিদ্যুতের মতো আলো দেখে সবাই মনে করলো রাজার ছোট ছেলের ঘরে আগুন ধরেছে। কিন্তু সকলেই দেখলো যে আগুন নয়। ছোট ছেলের বৌয়ের সৌন্দর্যে ঘর

আলোকিত হয়ে আছে। এই প্রতিযোগিতায়ও সে জয়ী হলো। আসলে সে বাঁদরী নয়, ছদ্মবেশী রাজকন্যা। এবারে রাজা আরও খুশী হলেন।

পশু পাখী বা জন্তু জানোয়ার কেন্দ্রিক উপকথা সমূহেও নর নারীর প্রাধান্য লক্ষ্য করবার মতো। এমন কি জীব জন্তু ও নর নারীতে পার্থক্য নির্ণয়ও অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কেননা, উভয়েই কাহিনীব বিষয়বস্তুতে এমন নিবিড় ভাবে জড়িত যে একদল ছাড়া অন্য দলকে কল্পনা করা যায় না। অরণ্যচারী মানব সমাজের কথা উপকথায় প্রাধানতঃ বাঘ, সর্প, ভাল্লুক, হাতী, হরিণ, কুকুর, শিয়াল, মোরগ মুরগী, হাঁস, ময়ূর ময়ূরী, কোকিল, চিল, শকুন ইত্যাদি জড়িত এবং তাদের সঙ্গে মানব মানবী সম্পর্কিত। সি. এইচ. বোম্পাস, পি. ও. বোডিং, ভেরিয়ার এলুইন, আর্চার, এস. সি. রায় প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভীল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম সমাজ থেকে পশুচরিত্র বিশ্লেষণাত্মক বহু কথা উপকথা সংগ্রহ করেছেন এবং সে সবের সঙ্গে বাংলাদেশের আদিম সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ কাহিনীর সঙ্গেই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বর্ণনা ও বিষয়বস্তুতে কোথাও কোথাও সামান্য তফাৎ নজরে পড়ে। আদিম সমাজের কথা উপকথার অন্তরালে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এবং সংস্কারবদ্ধ ধারণা। সংস্কারবদ্ধ ধারণাই অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসে রূপলাভ করেছে। ফলে, কাহিনী আর কাহিনী মাত্র নেই—ধর্মাশ্রিত বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখা যায় যে বাঘ ভালুক সাপ ইত্যাদি আর জীবজন্তু পর্যায়ে নেই—হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রদ্ধার পাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে পূজনীয় বা ভয়ের বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ সর্পের কথাই ধরা যাক। সর্প যে ভীতিপ্রদ বস্তু এটা সন্দেহাতীত। কোন কোন আদিম সমাজে সর্প পূজিত না হলেও সর্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই সমাজে প্রচলিত এ সম্পর্কিত কাহিনীটি এইরূপ:

এককালে এক ব্যক্তির দুই মেয়ে ছিল। দুই বোন একত্রে পিতার জুম ক্ষেতে কাজ করতো। সেই জুম অঞ্চলের এক বৃক্ষের গর্তে বাস করত এক বিরাট সাপ। দুই বোন জুম ক্ষেতে কাজে গমন করলে সাপটি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতো এবং বড় বোনের সঙ্গে প্রেম লীলায় মত্ত

হতো। ছোট বোন ভয়ে দূরে সরে থাকতো এবং এই ঘটনা কখনো কাউকে বলতো না। পিতা দুই বোনের জন্য গামছায় বেঁধে দই ও চিড়া-মুড়ি দিত তাদের খাবার জন্য। কিন্তু বড় বোন ও সাপ মিলে তা খেয়ে ফেলতো এবং ছোট বোনকে না খেয়েই থাকতো হতো। এ ভাবে ছোট বোন যখন না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলো তখন একদিন তার বাবা কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে সব খুলে বললো। বাবাতো শুনে অবাক। সে পরের দিন বড় মেয়েকে জুমকাজে যেতে নিষেধ করলো এবং নিজে গোপনে বড় মেয়ের পোষাক পরিধান করে একটি ধাবালো দা সহ ছোট মেয়ের সঙ্গে জুমকাজে গেল। জুমক্ষেতে উপস্থিত হয়ে নিয়ম মত ছোট বোন ডাক দিতেই সাপ এসে বড় বোন মনে করে তার বাপের কোলে বসতেই বাপ এক কোপে সাপ মেরে ফেললো।

পরের দিন দুইবোন আবার জুম কাজে গেল। কিন্তু আর সাপ দেখতে পেলো না। বাড়ী ফিরে এসে দেখে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পেড়েছে। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়ও বড় মেয়ের উপর সে ভীষণ ক্ষিপ্ত। অতঃপর সে এক কোপে বড় মেয়েকেও কেটে ফেললো। কিন্তু আশ্চর্য। দেখতে পেলো বড় মেয়ের পেট থেকে শত শত সাপের বাচ্চা বেরুচ্ছে। এবারে সেই সব সাপের বাচ্চা মারা শুরু করলো। সব মেরে শেষ করলো কিন্তু একটি ভুলে লুকিয়ে ছিল। সেই সাপের বাচ্চা যখন বড় হলো তখন সে মানুষ খেতে শুরু করলো। একবার এক সাহসী ব্যক্তি সেই সাপও মেরে ফেললো। সাপ মারা হয়েছে বটে তথাপি সেই সাপের উদ্দেশ্যে তারা এখনও খাদ্য উৎসর্গ করে থাকে।

লুসাই ভাষায় থিয়াংগ্লু অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বলে একটি কথা আছে। সাপ সত্যি লুসাইদের কাছে থিয়াংগ্লু। কাজেই সাপ যদি কারো বাড়ীতে প্রবেশ করে তবে তাদের ধারণা নিশ্চয়ই পরিবারের কারও মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা। অতএব সাথু-আ দেবতার পূজা না করলে আর রক্ষা নেই। এ ভাবে লুসাই সমাজ সাপকে সরাসরি পূজা না করলেও প্রকারান্তরে শ্রদ্ধা দেখানো হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিম সমাজের কথা উপকথা ধর্মভাব সম্পৃক্ত এবং পশুচরিত্র বিশ্লেষণেও মানব সমাজ সম্পর্কিত। ইতি-

পূর্বে বর্ণিত কাহিনী সমূহে তা স্পষ্ট। পশু চরিত্রের বিশ্লেষণে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যযোগ্য যে, একই জন্তুর বিভিন্ন ভূমিকার জন্য আদিবাসী ভেদে তাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতেও দেখা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখো ও বনজোগী এবং সিলেট বা আসামের খাসীয়া সম্প্রদায় কুকুরের প্রতি অনীহা ভাব প্রকাশ করে অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের খুমী ও মুরং সম্প্রদায় কুকুরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। অনুরূপ ভাবে সাঁওতাল ওরাওঁ সমাজে শৃগাল বুদ্ধির রাজা হিসেবে বিবেচিত কিন্তু সেন্দুজ, চংবঙ্গা প্রভৃতি সমাজে শৃগালকে নির্বুদ্ধিতার জন্য হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

পাংখো ও বনজোগী এবং খাসয়িা সম্প্রদায় কুকুরকে কেন অবজ্ঞা করে তার অন্তরালে পাংখো ও বনজোগীদের বক্তব্য এই যে, একবার এক কুকুর চাঁদ খেয়ে ফেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কুকুর আকাশে যাবে চাঁদ গ্রাস করতে ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে মোরগ উড়ে গিয়ে চাঁদকে সতর্ক করে আসে এবং চাঁদ সাবধান হয়ে যায়। ফলে কুকুরের পক্ষে আর চাঁদ গ্রাস করা সম্ভব হয়নি। ভগবান পুরস্কার স্বরূপ মোরগকে উপহার দিলেন সুন্দর লাল টকটকে বোল এবং তাকে নিয়োজিত রাখলেন মানুষকে ভোর বেলা ডেকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য। এই কারণেই মোরগ আদরের বস্তু আর কুকুর অবজ্ঞার পাত্র।

খাসীয়াদের বক্তব্য এই যে, একবার ভগবান তাদের মধ্যে লেখা পড়া বিস্তারের জন্য কাগজ ও কলম পাঠিয়েছিলেন লোক মারফৎ। কিন্তু পথিমধ্যে কুকুর সেই কাগজ ও কলম খেয়ে ফেলে, ফলে তারা আর লেখা পড়ার নির্দেশ পায় নি। তাই কাগজ ও কলমের প্রতীক স্বরূপ খাসীয়া সমাজ মাথায় এক টুকরো কাপড় এবং একটা চিরুণী সব সময়ের জন্য গুঁজে রাখে। এবং এটাই তাদের কুকুরকে অবজ্ঞা করার কারণ।

খুমী ও মুরং সমাজের ধারণা ভিন্ন। তারা কুকুরকে আদর করে এবং শিকার ও গৃহকাজে ব্যবহার করে। এমনকি কোনও মুরং কিম্বা খুমী মারা গেলে তারা তৎক্ষণাৎ একটি কুকুর হত্যা করে। তাদের ধারণা এই পৃথিবীতে কুকুর যেমন তাদের নানা কাজে সাহায্য করে মৃত কুকুরের আত্মাবস্তুও মৃত ব্যক্তির আত্মাবস্তুকে পথ দেখিয়ে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবে।

এমনি ধরণের বিচিত্রধর্মী কথা উপকথা আদিম সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের সামাজিক জীবনের ব্যবহার্য বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক কথা উপকথাও কম চিমাকর্ষক নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্‌কী অঙ্কন প্রথা কেন্দ্রিক কাহিনী, শিশুর নাম করণের কাহিনী, সিঁদুরের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী, হলকর্ষণ রীতির কাহিনী ইত্যাদির নাম করা যায়। কাহিনীগুলো যে শুধু মানব মনে রসের প্লাবন জাগায় তাই নয়--এব অন্তর্নিহিত নীতিবোধও আমাদেরকে চমৎকৃত করে। এসাবেব অবদানে বাংলার লোক সাহিত্যও যে সমৃদ্ধ সে কথা বালাই বাহুল্য।

৮

ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও বিভিন্ন আদিম সমাজে প্রচলিত লোক–গীতি, গাঁথা, কাহিনী, কাব্য, পালাগান, উপকথা, রূপকথা, কথা, বারোমাসী ইত্যাদি আদিবাসী সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ চাকমাদের গোজেলের লামা, রাধামোহন ধনপতি, চাটিগা ছাড়া, জামাই মারনী, গোমতী নদীর উৎস, এঁয়াতারা ত্বরর জর্ম্মকথা, লক্ষ্মীব পালা, বান্দরর কিততা, গুজাংগ্যা লোহা কানার কিততা, রাধার চৌতিসা, নিমাই চান্দের গীত, কির্বাবির বারোমাসী, তান্যাবির বারোমাসী কালিন্দী রানীর বারোমাসী, রঞ্জনবির বারোমাসী, চিকনবির বারোমাসী এবং উবাগীত; টিপরাদের রাউনী বাউনী কোচুক হা সিকাম তাল্লায়, লাংগা রাজা ন অ বুল্লায়, সিয়াই তোয় কুতুং এবং গরয়া-গীত; মগদের রিফুংযাং, অবুশে তেখ্রাং, থিনজীয়ানা গীত এবং তংদেই খিং তেখ্রাং; মুরংদের চি-আলা-ক্রে, নস্যাৎ পা-এ এবং চম্পুয়া-কোমলাং; পাখোদের বোমাকানি ও বগালেক; লুসাইদের তুইচং নদী ও ফাচিং-এর বীরত্ব; খাসীয়াদের উ রায়তুং উ মানিক, উসীম জালিং টন, উ লিকাই তামা ও উ থেলেন; মনিপুরীদের খাম্বাথৈবী, নংপদ নিংথু পান থৈবী এবং খানজিং লাইরেম্বী; সাঁওতালদের কারা ও গুজা, শৃগালের কাহিনী ও দানশীল রাজা; গারোদের ব্রহ্মপুত্র নদ ও তুরাপর্বত কাহিনী ইত্যাদির নাম করা যায়। এসবের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, অপর দিকে তেমনি রয়েছে প্রেম রস, নীতিকথা, এবং কর্মবহুল জীবনের চরম পরাকাষ্ঠা।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বিভিন্ন আদিম সমাজের সঙ্গীত সম্পর্কে আরণ্য সাংস্কৃতি গ্রন্থের সঙ্গীত শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গীতের উদ্ভব, ব্যবহার পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং সঙ্গীত গীত হওয়ার সময়কাল ইত্যাদি সব কিছুই সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবুও বলবো সঙ্গীত আদিবাসী সাহিত্যের বিস্তৃত শাখা এবং আরণ্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে সারবস্তু ও ম্যাজিক। দৈনন্দিন জীবনে সফলতা আনয়নের জন্য সঙ্গীত অপরিহার্য। অতএব, সঙ্গীত কেবল চিত্ত-বিনোদনেব অন্যতম পন্থা নয়, তাদের ধর্মের অঙ্গ। তাই সঙ্গীত কখনো দেবদেবীর অর্চনায় প্রার্থনার স্তোত্র বা পূজাব মন্ত্র, কখনো নর-নারীর চিরন্তন প্রেম ও বিরহের সাক্ষী ; আবার কখনো তাদের মিলনের যোগ-সেতু। আলোচনার পরিসর না বাড়িয়ে বিভিন্ন আদিম সমাজে প্রচলিত কিছু সংখ্যক মূল ভাষায় রচিত বিচিত্র-ধর্মী গান ও তার বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি :

কুকী গান

১. মেলকেন্দু আন্ না নি মেলকেন্দু
নাংনি মেল পারতেন না হুযাই আই।
পোরতেন হুয়াই লেন হুযাই ও সন্
লেন হুযাই ও কে লিন্ বাই কেন সন্।
নিল নাও লেও নাও লিল খাম চাংচে
লম লা হুং লিয়েন চম লা হুং।
কালচে বলে লিয়েন চং কেন বেং,
জল পুই হা বল ক্রুং লেং জান নই।
চিলিম লু চের খোয়াং খাম বেম লই,
চের খোয়াং খাম লাই সহই মেল লেও
চাং গাল রেম পা তন চোয়াল চাম তে,
চাং গাল রেম পা পেল কং লুং ইলদ।[১]

অনুবাদ :

তোমার ও রূপে যেন রূপ খেলা করে,
সুডৌল মুখের বক্তে ফুল ফুটে আছে।
তোমাকে পাবার আশা হৃদয়ে আমার
অথচ তোমার মন চায়না আমাকে।

আমাকে দাওনা এনে তোমার ঢোলক,
ঢোলক বাজাব আমি তব চার পাশে।
তুমি তো রূপসী মেয়ে, তোমার ও রূপ
আমাকে এনেছে টেনে তোমার উঠোনে।

জানি না পাবো কি আমি তোমার পরশ?
অথচ এ মন কেন তোমাকে যে চায়!
কঠিন পাথর তুমি। আমার এ প্রেম
সেখানে আঘাত খেয়ে শুধু ফিরে আসে।

২. রেংগা রো আলে খাং বাপু আল
আলামে সো আলে লুংদি লেংগ-এ
মোকামা সাল তে থি পো-আল
বোংগা দাপালো সে আলে
লুংদি লুংগ লেংগ-এ ।।

অনুবাদ :

ময়ূরের মতো নাচবো পেখম খুলে
আমাদের মন ময়ূর হয়েছে আজ।
পবিত্র গৃহে যেমন পতাকা উড়ে
তেমনি উড়ছে আমাদের মন আজ।

লুসাই গান

১.　তুজান তুনজ চাং চান খাংগ
সেরেন্ দ্রা কানচিয়াংগ গিনি

নৃগ লুমা জাল খ্রিং গফাংগ
জালস্ত্রিং লম বাম দা অ।
তান্নিহারাই
আকাম বিরে হেই বাং কাথিয়াল নাই॥

অনুবাদ :

তুমি আর আমি ঢোলের আওয়াজে মত্ত,
জানি না কেন যে আমরা পৃথক হবো!
তারকার মতো মিলবো না একি সত্য?
আমরা দু'জন এক সাথে নাচি গাহি
অথচ কেন যে যার যার ঘরে যাই।

২.　নি লেংগ কঅ তুম লুহ্ভে
স্ত্রি ভার কঅ তুম লুহ্ ভে।
অথ নিম অপ কঅ বি আ
নি লেন কঅ তুঁম লে।

অনুবাদ :

দিনের কাছে আমার মিনতি নয়
সন্ধ্যার কাছে আমার মিনতি নয়।
রূপসী শোনো তোমাকে পাবার আশা
তোমাকে পেলে সকলি পাবো যে আমি

মুরং গান

কানা উমা আংগ নাউ থে এন্
কানা উমা আংগ চিরেত এল্।
এল্‌রা কই আংচা নিমরু আ
এন্‌রা কই আংচা ফুং ইয়াঁ।।

অনুবাদ :

তোমাকে পেলে কেন যে ভালো লাগে!
মুখের চুরুনি তুমিই প্রিয়তমা ;
তোমাকে পেলে আশীতে মুখ দেখি,
তোমাকে ছাড়া কি করে আমি বাঁচি।।

মগ বা মারমা গান

১. ক্যেইদরো তং কেইনে সায়া 'হ্লা বারে
তই রোয়া প্রেস্থ প্রেসারোলে লুগ্রেঁা হ্লা বারে।
ক্যেয়ইদরো য়ইকে হেমাক্‌লে ম্রুা হ্লাবারে,
ক্যেয়ইদরো তংদেইনেমা মারমা রখই গাক
গ্রুং স্থ
তাফা তাফা—এ সালুমুলু সাঁ্যাংতাং প্রাবারে
ক্যেয়ইদরো তং কেইনে ইশ্যাই হ্লাবারে।[২]

অনুবাদ :

আমাদের এ পাহাড়ীভূমি শান্তির আশ্রয়,
সব মানুষের হৃদয় জুড়ে খুশীর হাওয়া বয়।
আমাদের এ জুম এলাকা শান্তির আশ্রয়।।
এখানের যতো মানব-মানবী সবার এক প্রাণ,
মিলে মিশে আছি সবাই এক মায়ের সন্তান।
সব মানুষের হৃদয় জুড়ে শান্তির হাওয়া বয়,
আমাদের এ পাহাড়ী ভূমি শান্তির আশ্রয়।

২. অসুকাগে হ্লাবারে—অবুশে কাগে
সয়দই হ্লাবারে
বখই রখই রখই আকা।
বখই আকা শয়দই হ্লা
লাকখোক জারো সিরাবারে।------
অস্থটিগে হ্লাবারে
অবুশে ভিগে শয়দই হ্লাবারে
পাখাক্ তোয়গা অমুইসাং
জালে মিলিখ্যাং
লাওয়া ব্রাংসে ওক খাটি বুবুরী দয় দয় কারে
অস্থকাগে হ্লাবাবে
অবুশে কাগে শয়দই হ্লাবারে
খযদাইতে তোয়াদাইতে প্রইবক প্রইদাইতে
ক্রশি হ্লাক্শে হ্লাকখাটি বুবুতি দযদয় কারে
ক্রীশে হ্লাকশে হ্লাক কা হ্লাকক। অবুশে তিপ্রাবারে
অস্থতিগে হ্লাবারে অবুশে তিগে শয়দই হ্লাবারে
অস্থতিগে হ্লাবারে অবুশে কাগে শয়দই হ্লাবারে।[৩]

অনবাদ :

কার গান এত মধুর মধুর?
কার নাচ এত মধুর মধুর?
সে গান যে খুকুমনির,
সে নাচ যে খুকুমনির।
বখই নাচ নাচের রাজা
বখই নাচ সোনার প্রাসাদ :
হাত তালি যেন প্রাসাদের ঘণ্টা।
কার নাচ এত মধুর মধুর?
কার গান এত মধুর মধুর?
সে নাচ যে খুকুমনির
সে গান যে খুকুমনির।

সোনার পালঙ্কে ঘুমায় খুকু
চারপাশে নাচে যুবক-যুবতী
হাই তুলছে ; জাগবে খুকু--
কার গান এত মধুর মধুর ?
কার নাচ এত মধুর মধুর ?
সে গান যে খুকুমনির
সে নাচ যে খুকুমনির।
খুকু এখন বসতে পারে
হাতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেয়
সে যেন এক নাচের ভঙ্গী।
কার গান এত মধুর মধুব ?
কার নাচ এত মধুর মধুর ?
সে গান আমার খুকুমনির
সে নাচ আমার খুকুমনি।

মনিপুরী গান

চিংগা সাতপা ইংগেনা নাই
চিন্ নাইনা কেমখি ব' পা নু আই।
আই না কেংগী কেন দি দা
মালাং বা না ধিত পা গী কেন বা নাই।
মালাং বা নাই স্তং কাইত দা
হাই রাং লাই খাক লাই বাগী কেন বা নাই।

অনবাদ ঃ

পাহাড় আড়াল করে কী সুন্দর ফুল ফুটে আছে,
বৃথাই ঝরছো তুমি অপরূপ হে সুন্দর ফুল ;
বড়ই আক্ষেপ! তুমি কেন যে এমনি ঝরে পড়ো।
'বৃথাই ঝরি না আমি', ফুল বলে নিষ্ঠুর বাতাস
আমাকে বিচ্ছিন্ন করে মায়াবী প্রেমের বোঁটা থেকে।'

বাতাস বললো চুপে, 'আমার কি দোষ?
প্রেম ভাবে তুমি ঝরে পড়ো।'

খাসীয়া গান

কুবলাই কুবলাই খী লিত বাম,
কবাই স ই ইং ও ব্লি হো।----
কুবলাই কুবলাই খী লীত বাম।

অনুবাদ :

সালাম, সালাম চলে যাও তুমি
ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পান-শুপারী খেতে।
সালাম, সালাম চলে যাও তুমি।----

গারো গান

১. ও যিশু ক্লাব চিংআ বি আ
নাংকি বিলকো আনবো যাসগিপা
চিং বিলাপ গিপ্পা অংজাওবা,
চক্কা গিলিক বাংকো নাংনা অক্কা
চিংনি সেসাং ওঁ দংবো সাংনান
গিগিক রাজা সংবো রাজা না আসান।[৪]

অনুবাদ :

আমার প্রার্থনা শোনো, দয়াময় যিশু
তোমার দয়ায় যেন শান্তি পাই আমি।
কি আছে আমার আর? দেব যে তোমায়?
সামান্য ভক্তি ও প্রেম রাখি ওই পায়।
আমার অন্তরে থাকো, অন্তরে আমার,
হৃদয়ের রাজা তুমি, রাজা নেই আর।

২. বিলা রাংনা যাসা বে আ
আগিল সাকনি পিলাক নান।

যে আসং অং ওবা
বিলা রাংনা যা'সা রা
হায় ঝমখেল না যিশু যাসা বেগিপ্পা।[৫]

অনুবাদ :

যিশুর মায়াবী প্রেম কত যে মহান
সেই প্রেমে বেঁচে আছে সকল সন্তান।
যিশুর দয়ার কোনো তুলনা যে নাই
তাঁহার কারণ যাচি আমরা সবাই।

৩. নাসিমাং আং জারিশোদে মান্দে রিমপাবো
ক্লাবো যিশু অকামেং আ রেবা আংনা
রেবা আংনা।
ক্লাবো যিশু মেং আ আং নম থম্
অংগেন।।[৬]

অনুবাদ :

তোমাকে যে পেতে চাই মানুষের মাঝে,
তোমাকে পাবো যে যিশু মানুষের মাঝে।
বহু দূরে আছো তুমি তাতে কি বা আছে?
তোমাকে যে পেতে চাই মানুষের মাঝে।

টিপ্রা গান

১. লখি ঐ লখি রাং চাকমা শোনা কাইন্যা মা
সাকাং হিম্ পাইদে ইয়ালুক মা।।
দিঁগল কাই কেশের
যাইদি থানা নো বায়া বিরি নৈ বিনতি দেশের;
গরা ডুশা গ চৈত্রেমা পুরুং
আনি লখি ন সর খা বুদ্ধি ফুরুং
সাকাং হিম্ পাই দে ইয়ালুক মা।।

ননদে লুং আ---খালে সৈতেয
ইযাকা খোক্ চাক্‌য়া কালাই গ মোক্ তোর
বাজা নি দঁাইয়া
বছব যাংখালে খালি যাংখালে
আর পুনবার খানদে মাইয়া
শানাং হিম্ পাইদে ইয়ানুক মা।।
কপাল নি চিঠি
বাত্তক ব অ বাত্তক দিযা সুই ব অ সুই দিযা
আনি লখি বাই মালাই নি বিধি
আংলে ভাবি গ নন লখানি চালসা
লুং তমানি উৎখালে তিনি
ফুঁযা বা চুং নাই ফুঁয়া বা খিনাই সিঁয়ারো বাহা
সাকাং হিম পাইদে ইযালুক মা।।
মালযা খালে নন খাং গৈব বছব
দেশি ছাড়ি গৈ বাড্য ছাড়ি গৈ
লখি নি বাগৈ উংনান কবুব
সাকাং হিম পাইদে ইযালুক মা।।[৭]

অনুবাদ :

ওরে ও সোনার বরণ সোনার চাকমা মেয়ে,
এসো তুমি চলে যাবো প্রেমের নাওটি বেয়ে।
বাঁশ বাগানের মাথায় বসে
ঝিল্লি ডাকে প্রেমের রসে
সেই রসে কি সোনার মেয়ে উঠ্‌ছো তুমি নেযে।
এসো কন্যা চলে যাবো প্রেমের নাওটি বেয়ে।।
তোমার জন্য কাঁদি যে হায়
নয়ন জলে বুক ভেসে যায়
বললে তুমি বছর শেষে বাঁধবে ঘর ভিন দেশে যেয়ে।
এসো কন্যা চলে যাবো প্রেমের নাওটি বেয়ে।।

কপাল আজ হয়েছে মন্দ
আঁধার মেখে হলাম অন্ধ
চাঁদ ভেবে জোনাকী ধরি দুঃখের গান গেয়ে।
এসো কন্যা চলে যাবো প্রেমের নাওটি বেয়ে।।
ক্ষণে নিভে' ক্ষনে জ্বলে দুঃখ বাড়ালে
কি দোষে আমাকে তুমি পাগল বনানালে
আমি দেশ ছেড়ে যাবো কন্যা তোমার গান গেয়ে।
এসো তুমি আমার নায়ে আমি তোমার নেয়ে।।

২. পার অ সাচালাং

হাপুং খায়ছানি ববই নি ভজন্,
আর খায় ছাগ খরাং খানা খন্।
তোয়ছা বেখেরেপ্ তেরাং তোয় কালাই
বেং কি বচলই পুং রখা নাই খন্।।
ও খুম্তায় ও লামাচু ববার
বলং নি মোকৈ উংখালে ববার
সাচালাং হাবৈ হাপার সিকালা
বফাং ওয়াফাং গ বাখাই কবল্খা
বাখা উরিনাই কক্ মুং তামা ন
ছেড়ে ছেড়ে খাই সা-খন্।।
খুম্বার নি বাখাই ববই নি শাকাই
মাইনা মিনিষর মাঁইয়া
আন কমলসা ভোমভ্রাই-মা মাছা
ত-মৈ বা খাসিলিয়া
বক হতোই নি খোমই বিছিং গ
খাপাং ছাবাই খা বক দিন সাল গ
সাচালং ন্বার লামাকু ববার
তামা কক মুং ন সা-খন্।।*

অনুবাদ :

• পাহাড়ে বসন্ত

এই পাহাড়ে কে যে গান গায়
এই পাহাড়ে কে যে গান গায়
ওই পাহাড়ে স্বর-ভেসে যায়
মাঝখানে ঝর্ণধারা খঞ্জনী বাজায়।।
এই বনে হারিনের খেলা
ওই বনে ফুলেদের মেলা
কী আনন্দ গাছে গাছে বাঁশের মাথায়।।
তবে কি বসন্ত আজ নুপুর বাজায়।।
ওই বনে ভ্রমরের নাচ
এই মনে কী যে উল্লাস
কী করে এখন আর চুপ থাকা যায়।
তবে কি বসন্ত আজ নুপুর বাজায়।।
ফুলে ফুলে উড়ে মধুকর
জানে কি সে বুকের খবর
এমন আনন্দ আজ পেলো সে কোথায়।
বসন্ত এলো কি এই পাহাড়ের গায়।।
ও পাহাড়ে কদম্বের-বন
এ পাহাড়ে কিশোরীর মন
দখিনা বাতাসে আজ খুলে খুলে যায়।
বসন্ত এসেছে এই পাহাড়ের গায়।।
বসন্ত এসেছে এই পাহাড়ের গায়।।

চাকমা গান

১. অজল পাগর্য্যা নীচ ঝুপ
দিন দিন পরেত্তি কলিযুগ।
কলি যুগৎ সত্য নেই
বক চিরি দেখেল-অ সত্য নেই?

অনুবাদ

সুউচ্চ পাকুড় নীচু ঝোপ
দিনে দিনে পড়ছে কলিযুগ।
কলি যুগে সত্য নেই,
বুক চিরে দেখালেও প্রত্যয় নেই।

২. জুন পর্বাৎ ভুই হাদে
প্রান ন জুড়ায় তুই বাদে।
বেলা নিগিলে তিদি পেখ
বেড়ৎ বার্যেষি নিশি বেত।
নিশি বেদৎ জাগিবে
ভাবনা খেলে লামিবে।।

অনুবাদ :

জোছনা পড়লে মাঠ হাসে
প্রাণ জুড়ায় না তুমি ছাড়া।
রাত্রে ডাকবে তিতির পাখী
বেড়া ধাক্কাব নিশি রাতে
নিশি রাত্রে থাকবে জেগে
মনে থাকলে আসবে নেমে।

৩. মদনা তদেগং টুট জলে
রাংগা খাদিয়ে বুক জলে।
কিজিং ছিনি পক্ষ্য গেল
ভরন্দি বাজারৎ লক্ষ্মী গেল।
চিগন মরিচা টানংগর।
দোলে হুপ্পনে কানংগর।।

অনবাদ

ময়না-তোতার ঠোঁট জ্বলে
বাঙা বেষ্টনীতে বুক জ্বলে।
উপত্যকা ছেড়ে পক্ষী গেল
কাঁদছি হায়, লক্ষ্মী গেল।
ছোট্ট বেত অযথা টানি
স্বপ্ন দেখে বৃথাই কাঁদি।

৪. বনের দগরে হরিণ ছ
ন দেলে তোরে মরিব।
উড়েব পক্ষী তল্ চেইয়া
ছাড়ি ন পারিম তর মেইয়া

অনুবাদ :

বনের ভিতরে হরিণ ছা
তোমাকে না দেখে বাঁচব না।
উড়ছে পাখী নীচে চেয়ে
ছাড়তে পারিনা তোমার মায়া।

৫. হিল্লমিলাবুয়া জুমত যায় দে
কাল্লোঙ পিদত তাগল হেদত
জুমত যায দে।।
যাদে যাদে পদ্ধুন পিচ্ছে ফিরি চায়
সোয্য ফুলুন দেগি খেদত বুক্কুয়া তার যুরায।।
মনত স্থগ লোইনে তে উরি উরি হাদে দে
জুমত যায় দে।।
নুয়া জুম ধান কাদাত্ পিবির পিবির বুইয়্যার বায়
সিগোন পেঁকুন ঘুত্যাত বোইনে ধান পাগানা হান্
হিল্লামিলাবয়া বাদোল মারি সিগোন পেকন ধাবায়।

মোন ঘরং সাবাত কোইনেই উবাগীত গায,
বেলান গেলে সাযোন্যা হলো ঘরত ফিরেদে।
জুমত যায দে॥ *

অনুবাদ :

পাহাড়ী ওই যুবতী মেযে জুমে যায রে
পিঠে ঝুড়ি হাতে দা জুমে যায রে॥
যেতে যেতে পথে থেকে পিছে ফিরে চায,
সরষে ফুল দেখলে ক্ষেতে বুকটা তার জুড়ায।
মনের সুখে এদিক ওদিক ঘুরে যে বেড়ায
জুমে যায রে॥
জুমের ক্ষেতে ধীরে ধীরে বাতাস বয়ে যায
ছোট্ট ছোট্ট পাখী এসে পাকা ধান খায।
পাহাড়ী ওই যুবতী মেযে সেই পাখী তাড়ায।
মনের সুখে গাছের নীচে উবাগীত গায
সন্ধ্যা হলে আপন ঘরে একা ফিরে যায।
জুমে যায রে॥

সাঁওতাল গান

নিঞগা নাপুন পানি কান্দো বড়বাড়ী
গতেঞ চালুক-তুকু-এ বরোবারিক,
জিযী বো গে বারিক গাতিং গে নাঁতা
জিযী বো গে বারিক গোতিং তিংগুন
নিগান জিযী দোবে গভেন তাই রে॥

অনুবাদ :

পিতা আর মাতা দেবতা সদৃশ,
কিন্তু স্বামীর সমকক্ষ কে আছে?

জীবনের সকল সুখ এবং দুঃখ
একমাত্র স্বামীই ভাগ করে নিতে পারে,
একমাত্র স্বামীই বিপদ রুখে দাঁড়াতে পারে।
আমার গোটা জীবনই স্বামীর হাতে।।

২. আতো গাতি কুড়ি কোড়া
মাযা জালাং ছাড়া কিঁদেই
ইনদ ভেদ কান বোঙ্গা দেউড়ে
ইং বেনং মাযা জানা মিনা
আনাং মেন খাং।
কাদাম বা তে চাপা দিন পে
খ্রিয়ে ডুচিয়ে তে গেচু জিন পে
দেউড়ে চিতাং কুলি শভব নূব।।

অনুবাদ ঃ

গ্রামের যতো যুবক-যুবতী আছে
মায়ার জালে আটকা তাদের কাছে
ছিলাম আমি। এখন বোঙ্গার জ্বালা
ছিঁড়লো মায়া, আমার যাবার পালা।
কদম ফুলেব ইশারায় দিস্ ডাক,
আসবো আমি মিথ্যে নয় এ হাঁক।

ওরাওঁ গান

১. এতো বড়ো বাঙেলা রাজা কাঁহা গেলা
নিঠুরী কুঠুরী রানী কাঁদায়।
শুখালা পাতাই পাতাই নুড়ি গেলা
তাইসানা রাজা নুড়ি গেলা।।
আরে আইয়ো পুরুবে হোঁ দালান
পশ্চিমে হোঁ দালান;
দুইয়ো দালান সুমানে সুমান।।

আবে আইগো দালান কা নু'পাবে
বাণী যে কাঁদায়,
তিবিয়ো বিয়ো বাঁশী যে বাজায়।।
আবে আইয়ো বাজা যে আওয়ায়
আশী বান্দুন খিড়িকাতে আওযায
আবে আইযো হালে নব্বই হালে আশী
আশী বান্দুক খিড়িকাতে আওযায
পাইক বান্দুক দিলিকাতে আওযায।।[১০]

অনুবাদ :

এতো বড়ো প্রাসাদ বাজা কোথায় গেলেন
নির্জন কুঠুবীতে বসে বাণী একা কাঁদছেন।
শুকনো পাতা যেমন উড়ে যায
বাজাও তেমনি চলে গেছেন।।
পূব দেশে রাজাব প্রাসাদ
পশ্চিমে বাণীব প্রাসাদ
দুই প্রাসাদেব মাঝে বিবহেব দূরত্ব।
বাজা তুমি ফিবে এসো
নির্জন কুঠুবীতে বসে বাণী একা কাঁদছেন।
তোমাব বিবহ বাজে বাঁশীর সুবে সুবে।।
বাজা তুমি ফিবে এসো, তুমি যতো বুড়োই হও,
হোক না তোমার বয়স আশী, হোক না নব্বই
তুমি এলে বন্দুক ছোটানো হবে, বাজী পোড়ানো হবে
তোমাকে নিয়ে আনন্দেব ধুম পড়বে।

২ জাঙ্গালা ভিতাবে জাঙ্গালা ভিতাবে
বাবা গেলা হেরাইয়ো গেলা ;
জাঙ্গালা ভিতারে জাঙ্গালা ভিতারে
বাহিন গেলা হেরাইয়ো গেলা।

জাঙ্গালা ভিতারে জাঙ্গালা ভিতারে
আমিয়ো হেরাইয়ো যাবো।[১১]

অনুবাদ :

বনের ভিতরে বনের ভিতরে
বাবা গেলেন হারিয়ে গেলেন,
বনের ভিতরে বনের ভিতরে
বোন গেলো, সে হারিয়ে গেলো।
বনের ভিতরে বনের ভিতরে
আমিও একদিন হারিয়ে যাবো।

উপরে উদ্ধৃত গানগুলোর সাহিত্যমূল্য অত্যধিক। শুধু গান নয় এসব নিটোল কবিতা এবং আদিম সমাজের জীবন প্রবাহের নিখুঁত চিত্র।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিম সমাজের যে নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত গান বা কবিতাগুলো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ আদিম সমাজে দ্বিভাষিতার প্রচলন থাকলেও এখনও এমন সব আদিম সমাজ রয়েছে যারা নিজস্ব ভাষা ছাড়া অন্যের ভাষা ব্যবহার করে না এবং এটা তাদের ধর্মীয় রীতি। অন্যের ভাষা শিক্ষা লাভ করলেই তাদের আত্মা-সার-এর অবনতি ঘটবে এবং তারা হবে নানারূপ বিপদ আপদের শিকার। উদাহরণ স্বরূপ মুরু, মুরং, সেন্দুজ পাংখো, বনজোগী বম ইত্যাদির নাম করা যায়। এবং এজন্য তারা লেখা পড়া পর্যন্ত করে না। তাদের ধারণা লেখা পড়া করলে তারা আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে টিকে থাকবে না, ধর্মান্তরিত হবে। কার্যতঃ দেখা যায় তাই-ই। শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তারা উচ্চতর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই মুরু, মুরং, পাংখো, বনজোগী, সেন্দুজ ও বম সম্প্রদায় এখনো তাদের আদি ধর্ম জড়োপাসনা বা প্রাণবাদে টিকে আছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষিত হয়ে কেউ খৃষ্টধর্ম, কেউ বৌদ্ধ ধর্ম বা কেউ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আদিম সমাজের নিজস্ব ভাষার লক্ষণ বিভিন্ন আদিম সমাজে প্রচলিত তাদের গান বা কবিতা সমূহের

মধ্যে বিধৃত। একজনের ভাষার সঙ্গে অপরজনের ভাষার কোন মিল নেই। বোধ হয় ইতিপূর্বে বর্ণিত সংস্কারবদ্ধ ধারণাই এর মূল কারণ। বাংলা ভাষার কিছু শব্দ চাকমা, ওরাও, রাজবংশী প্রভৃতিদের ভাষায় অনুপ্রবেশ করলেও তা বিকৃত বাংলা হিসাবে স্থান পেয়েছে। যেমন ওরাওঁদের 'জাঙ্গালা ভিতারে জঙ্গলের ভিতর 'হেরাইয়ো হারিয়ে চাকমাদের 'পিচ্ছি ফিরি' পেছন ফিরে, 'বেলান গেলে বেলা গেলে অর্থাৎ সন্ধ্যা হলে ইত্যাদি বাংলা শব্দের বিকৃতরূপই বোঝান।

বাংলাদেশের সিলেট নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় যেমন বাংলাভাষার বিকৃতরূপ বা আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায় তেমনি কোনো কোনো আদিম সমাজ যেমন চাকমা, ওরাওঁ, রাজবংশী ইত্যাদিদের ভাষায়ও তেমন লক্ষণ স্পষ্ট। চাকমা ভাষায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, ওরাওঁ ও রাজবংশীদের ভাষায় রংপুর দিনাজপুর ও বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বর্তমান। অন্যান্যদের ভাষা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত।

৯

বাংলা লোক সাহিত্যের ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, খনার বচন, মন্ত্র ইত্যাদির মতো আদিবাসী সাহিত্যেও অজস্র ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ও মন্ত্র রয়েছে। এসবও শিল্পসঞ্জাত ও রসবোধের পরিচয়বাহী। এবং বলা চলে এসব আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন আদিম সমাজে যে সব ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে সে সবের মূল বক্তব্য এক তবে ভাষায় তফাৎ রয়েছে, এই যা। ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন আদিম সমাজের মূল ভাষার গানের উদ্ধৃতি সমূহে ভাষার নমুনা দেখানো হয়েছে। ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদে একই বক্তব্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের লোক-কবির দুটো লাইনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় 'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'। কাজেই আলোচনার পরিসর না বাড়িয়ে কেবল চাকমা ও গারো সমাজে প্রচলিত কিছু সংখ্যক ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদের উল্লেখ করছি :

চাকমা ছড়া

১. খাচ খুচ খাচ
ত-মামুর ঘরত যাচ্
ত-মামু দির কুরা কারি
চিং গিলালি খাচ্।

অনুবাদ : ঠাস্ ঠুস ঠাস
মামার বাড়ী যাস্
মামা দিবে মুরগী কেটে
চিৎ-কলজেটা খাস।

২. টন্দুরে গরতন গজর মজর
বিলেই আগে রই,
ও লাক্করে ডাগগোই।
বিলেই মারোই কোই
ও ঝাড়ে বিলেই ঝাড়ৎ যিযো
কদ পেবো গোই।

অনুবাদ

ইঁদুর করে গচর মচর
বিড়াল আছে বসে
লক্ষ্মী-সোনা ডাকো
বিড়াল মারবে যে।
বনের বিড়াল বনে গেছে
কোথায় পাবো তারে?

৩ কালা কালা হক্কেং
চিদিরা চিদিরা গুই
বুক চিরি গুরা দিলেও
তুযো ন ডরাং মুই।

অনবাদ কালো কালো তক্ষক
নানা বর্ণের গো-সাপ
বক্ষ বিদীর্ণ করলেও
ভয় করিনা আমি।

৪.　　আম পাতা লক্‌খন
ভবে মার্তে কদক্‌খন।
হামত তলে সমৈলুং
বড়ই কাদা ফুদেই লুং
বড়ই গাছের তলে
মোম বাত্তি জ্বলে
মুই যেম আগাজত
পানি খেম্‌ গলজত।।[১]

অনুবাদ.　　আম পাতা লক্‌লকে
থোবে মারতে কতক্ষণ
মাচার নীচে ঢুকলাম
বড়ই কাদা বিবলো
বড়ই গাছের তলে
মোম বাতি জ্বলে
আমি যাবো আকাশে
পানি খাবো গেলাসে।

বাধা

১　　বিলা বগা বিলং চরে
বিল শুগোলে বগা মরে। -　　গারো

অনুবাদ.

বিলের বক বিলে চরে
বিল শুকালে বক মরে।--　　কুকি

২　　চিদিলুং কাল্যাজিবা
উদিলাক সবক চাবা
ফুদিলাক মালতী ফুল
বদিলাক করণ্ড।--　　গাছ্যা

অনুবাদ

ছিটালাম কালিডিবা
উঠলো সোজা চারা
ফুটিলো মালতী ফুল
ধরলো কলমচা। - গবয়ে

৩. কাজালঙ্কে ভেক্‌ভেক্যা
পাগিলে সিন্দুর
যে ভাঙিং ন পারে
তে গুন্ডি সুদ্দা উন্দুর।- মানির কত্তি

অনুবাদ

কাচা থাকলে নরম
পাকলে সিন্দুর
যে বলতে না পারে
তার গোষ্ঠি শুদ্ধ ইন্দুর।--[২] মানির পাতিল

প্রবাদ

১. পর অ কদাত কান ন দ্য
অল্প খেয্য সজাগে র‍্য।

অনুবাদ :

পরের কথায় কান দিও না
অল্প খেয়ে তুষ্ট থাকো।

২. দূর অ কুদুম ফুল বাস
কাযঅ কদম চিনদা বাস।

অনুবাদ

দূরের কুটুম ফুলের বাস
কাছের কুটুম চিমসে বাস।

৩. যে কুকুরর নেজ বেঙা
চুমাং ভরেল্যে উজু ন অং।[৩]

অনুবাদ

যে কুকুরের লেজ বাঁকা
চুমোতে ভরে দিলেও সোজা হয় না।

গারো ছড়া

নাংফা বাচি রেযাং আ?
বল দেন নাচি।
মাই বল কো দেন বারা?
বলং আগাথ কি।
উকো বাচি পয়লে আ?
গোয়াল পাড়া চি।
যদি ভাগা পাল কলাচি
উচ মাইকো বা বারা?
নাকাম বালে–মাচি।
উবো সাওবা চা সাওয়া?
নন অক্ক ভাংসি।[৪]

অনুবাদ

তোমার বাবা কোথায়?
বনে গেছে।
কি করতে?
কাঠ কাটতে।

কি কাঠ?

আকাঠা।

আকাঠা দিয়ে করবে কি?

কয়লা বানাবে।

কয়লা করবে কি?

বেঁচবে।

কোথায়?

গোয়াল পাড়া।

কত দাম?

দশ টাকা।

টাকা করবে কি?

টাকা দিয়ে শুটকী মাছ
কিনবে শুনেছি।

কি মাছের শুটকী?

বোয়াল মাছের।

বোয়াল মাছের শুটকী

শুনি খাবে কে?

পেটুক আমার এক বোন আছে যে!

গারো ভাষায় প্রবাদকে বলা হয় 'আগান নি আকা।' প্রবাদগুলো উপদেশধর্মী এবং প্রতিটি প্রবাদের অন্তরালেই রয়েছে নীতিকথা এই নীতিকথাই গারো সমাজের প্রাণ। দু' একটা প্রবাদ বাক্যের নমুনা দিচ্ছি:

১. সংনা নকনা ছাললাৎ
গিপিন নাদে আমাং।

অনুবাদ:

'নাই মোগর চেয়ে
কানা মোগ ভালো।'

২ সাল বাম এ বাজা ভক,,
চিত্ত সুও তাল জাজক।[৩]

অনুবাদ ঃ

অসুখী রাজার চেয়ে
গরীব প্রজা ভালো।

আদিবাসী সাহিত্য যে বৈশিষ্ট্যময় ও সমৃদ্ধ তা বিভিন্ন আদিম সমাজের কাহিনী, কথা, উপকথা, রূপকথা, সঙ্গীত, কবিতা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদিতে স্পষ্ট। আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যময় ও বিচিত্র স্বাদে রূপায়িত করার মূলে এসবের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

7

আবশ্যিক গ্রন্থ ও পাদটীকা

১

১. E. Crawley, **The Mystic Rose,** (London, 1965), P. 43.
২. F.W. Bain, **The Digit of the Moon,** (London, 1901) P. 13—15
৩. Verrier Elwin, **The Muria and Their Ghotul,** (Oxford University, Press, London, 1947), P. 419.

২

১. Lt. Col. J. Shakespear, **Thr Lushai-Kuki Clans,** (London, 1912), P. 143.
২. E.T. Dalton, **Descriptive Ethnology of Bengal,** (Calcutta, 1872), P. 61.
৩ P. Dehon, **Religion and Customs of the Uraons,** (Memoirs of Asiatic Society of Bengal, Vol I 1905—1907), P. 155.
৪. S.C. Roy, **The Birhors,** (Ranchi, 1925), P. 243.
৫. S.E. Peal, 'The Communal Barracks of Primitive Races' in **Journal of Asiatic Society of Bengal,** Vol LXI (1893), P. 246 f.
৬. J.P. Mills, **The Ao Nagas,** (London, 1926), P. 73.
৭. J.H. Hutton, **The Angami Nagas,** (London, 1931), P. 243.
৮. **Ibid,** P. 49.
৯. **Ibid,** P. 51.
১০. Verrier Elwin, **The Muria and Thair Ghotul,** (Oxford University Press, London, 1947), P. 310—312.

১১. **Ibid,** P. 311—305.
১২. **Ibid,** P. VII (Preface).
১৩. **Ibid,** P. 338—339.
১৪. **Ibid,** P. 351.
১৫. S.E. Peal, **op. cit,** P. 246 f.
১৬. A.C. Haddon, **Reports of the Cambridge Anthropological Expedition in Torres Straits,** Vol V, 1904. P. 2—3.
১৭. R.H. Codrington, **The Malanesians,** (Oxford University Press, 1891), P. 102.
১৮. W.J.V. Savile, **In Unknown New Guinea** (London, 1926), P. 35, 36, 105.
১৯. Raymond Firth, **Art and Life in New Guinea,** (London, 1936), P. 25.
২০. C.G. Seligman, **The Melanesians of British New Guinea,** (Cambridge, 1910), P. 4500.
২১. B. Malinowski, **The Sexual Life of Savages,** (London 1968), P. 59.
২২. S.E. Peal, **Op.Cit,** P. 169.
২৩. **Ibid,** P. 258.
২৪. H. Law. **Sarwak,** (London, 1884), P. 247—248.
২৫. Hutton Webstar, **Primitive Secret Societies** (New York, 1908), PP. 8, 9. 10.
২৬. H. Baniesgson, **Indo-China and its Primitive Races,** (London, 1919), P. 45.
২৭. A.E. Jenks, **The Bontoc Igorot,** (Manila, 1905). P.10
২৮. Robbert Briffault, **The Mothers** (Abridged Edition, London, 1959), P. 50—51.
২৯. R.F. Barton. **The Igorots of To-day in Asia** (London, 1961) P. 37.
৩০. R.F. Barton, **The Philippines Pagans,** (4th Edition, London, 1968), P. 9—12.
৩১. V. Eric and Paul Radin, **Contributions to the Study of The Bororo Indians,** (New York, 1906). P. 338.

৩২. Hutton Webstar, **Op. Cit.,** P. 12—13.
৩৩. C.A. Sherring, **Notes on the Bhotias of Almora and British Garhwal,** P. 105--107.
৩৪. W.W. Hunter, **The Annals of Rural Bengal,** (London, 1868), P. 217.
৩৫. C.G. Seligman, **The Bari,** (London, 1928), P. 415.
৩৬. E. Gottschling, **The Bowenda** (London, 1905), P. 372.
৩৭. J. Boston, **Notes on the Kipsikis** (London, 1924), P. 68.
৩৮. A.C. Hollis, **The Massai,** (Oxford University Press, (London, 1905). P. 122.
৩৯. শঙ্কর সেন গুপ্ত, বাঙ্গালী জীবনে বিবাহ, (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশান্ কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃ, ৫৮।
৪০. Verrier Elwin, **The Baiga,** (Oxford University Press, London, 1939), P. 221.
৪১. Raymond Firth, **We The Tikopia,** (London, 1968), P. 490.
৪২. H.A. Junod, **Life of a South African Tribes,** (London 1936), Vol. I. P. 55.
৪৩. N.E. Hines, **Medical History of Contraception,** (London, 1936), P. 23.
৪৪. B. Malinowsci, **The Sexual Life of Savages,** (London, 1968), P XLV (Preface).

৩

১. J.G.P. Riedel, **De Sluik-en Krocsbajige Rassem tuseshen Selebes en Papua,** P. 252.
২. **Ibid,** 271.
৩. J.G. Frazer, **The Golden Bough** (Abridged Edition, London, 1960), P. 68.
৪. A.E. Crawley, 'Fire, Fire gods' in **Encyclopaedia of Religion and Ethics,** 1913, P. 26—30.

৫. H. Egede, **A Description of Greenland,** P. 209.
৬. G.M. Sproat, **Scenes and Studies of Savage Life,** P. 206.
৭. Lt. Co. J. Shakespear, **The Lushai Kuki Clans** (London, 1912), P. 107—108.
৮. Robbert Briffault, **The Mothers,** (Abridged Edition, London, 1959). P. 314.
৯. শঙ্কর সেন গুপ্ত, বাঙ্গালী জীবনে বিবাহ, (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশানস, কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃ, ৫৬

৪

১. A. Campbell, 'The Traditions of the Santals' in **JBORS** Vol. II, P. 21.
২. Lient Tichell, 'Memoir on the Hodesum' in **Journal of Asiatic Society of Bengal,** Vol IX (1840), P. 797.
৩. W. Koppers, 'Bhagwan, The Supreme Deity of the Bhils' in **Anthropos Tom** Vol. XXXV—XXXVI, (1940— 1941). P. 284.

৫

১. E. Crawley, **The Mystic Rose,** (London, 1965) P. 1. 235.
২. Abdus Sattar, **In The Sylvan Shadows.** (Dacca, 1971), P. 132.
৩. G. Gorer, **Himalayan Village,** (London, 1938, P. 226
৪. Verrier Elwin, **The Muria and Their Ghotul,** (Oxford University Press, London, 1947), P. 426.

৬

১. J.G. Frazer, **The Golden Bough,** (Abridged Edition, London, 1968), P. 702—703.

২. Ruth Benedict, **Patterns of Culture.** (New York, 1961), P. 28.
৩. Margaret Mead, **Coming of Age in Samoa,** (New York, 1928), P. 37.
৪. Robbert Briffault, **The Mothers,** (Abridged Edition, London, 1959), P. 238.
৫. Margaret Maed, **Sex and Temparament in Three Primitive Societies,** (New York, 1950), P. 41.
৬. Robbert Briffault, Op. Cit., P. 239.
৭. Ibid, P. 240.
৭. S. Powers, **The Tribes of California,** (London, 1937) P. 31.
৯. E. Shorthand, **The Southern Districts of New Guinea,** (London, 1942), P. 294.
১০. W.R. Smith, **Religion of the Semetes,** (London, 1894) P. 133.

৭

১. H.H. Bancroft, **The Native Races of the Pacific States of North America,** (1875—76), P. I. 549.
২. E. Treagear, 'The Masai of New Zealand' in **J.A.I.** Vol. IX (1879), P. 164.
৩. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** P. 240.
৭. **Ibid,** P. 241.

৮

১. Ruth Benedict, **Patterns of Culture,** (New York, 1961), P. 37—38.
২. J.G. Bourke, **Scatalogic Rites of All Natives,** (London, 1941), P. 378.
৩. H.H. Ellis, **Studies in the Psychology of Sex,** (London, 1912), P. V, 172.
৪. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** P. 247.

৯

১. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** **P.** 239.
২. **Ibid,** P. 242.
৩. J.G. Frazer, **Op. Cit.,** **P.** 803.
৪. E.A. Hoebel, **Man in the Primitive World,** (London, 1958), P. 373—374.
৫. J. Macdonald, 'Manners, Customs, Superstitions and Religions of South African Tribes' in **JAI,** (1890), Vol. XIX, P. 284.
৬. J. Bowring, **A Visit to the Philippine Islands,** (1891) P. 120.
৭. J.G.F. Riedel, **Op. Cit.,** P. 57.
৮. E.A. Hoebel, **Op. Cit.,** P. 371.
৯. C.L. Ford, 'A comparative Study of Human Reproduction' in **Yale University Publications in Anthropology** No. 33, (1945), P. 44.

১০

১. E.A. Hoebel, **Op. Cit.,** P. 372.
২. J. Shooter, **The Kafirs of Natal and the Zulu Country,** P. 165.
৩. B. Malinowski, **The Sexual Life of Savages,** (London 1968), P. 192.

১১

১. B. Malinoswki, **The Sexual Life of Savages** (London, 1968), P. 179—197.

১২

১. **B.** Malinowski, **The Sexual Life of Savages, P. 193.**
২. **E.** Crawley, **The Mystic Rose,** **(London, 1965),** **P I. 239.**

৩. I. Schapera, **Married Life in an African Tribe,** (London, 1910), P. 198.
৪. Margaret Mead, **Sex and Temperament in Three Primitive Societies,** (New York, 1935), P. 31.
৫. P.A. Talbat, **The Peoples of South Nigeria,** (London 1926), P. 354.

১৩

১. Kaj Birket-Smith, **Kulturens Vagar, Natur Och Kultur,** (Stockholm, 1943), P. 39.
২। শঙ্কর সেন গুপ্ত, বাঙ্গালী জীবনে বিবাহ, (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশান্স, ১৯৭৪), পৃ, ৪৬
৩. E.W. Burgess, 'Introduction' in **The Negro Family in the United States,** (Chicago, 1939), III-B P. XI.

১৪

১. **Census of India,** 1931, Vol I, Part, III-B : P. 229—23·0
২. S.W. Agarwala, **Age at Marriage in India,** (Delhi, 1862), P. 4.
৩. R.F. Barton, **Ifugaon Law,** (University of California Publicatious in American Archaeology and Ethnology, Vol. 15, (1919), P. 15—22.

১৫

১. J.F. McLennan, **Primitive Marraige,** (Edinburgh, 1865), P. 37.
২. G.W. Stow, **The Native Races of South Africa, A History of the Intrusion of the Hottentots and Bantu into the Hunting Grounds of the Bushman,** (London, 1905), P. 96.

৩. J. Roscoe, **The Northern Bantu, An Account of Some Central African Tribes of the Uganda Protectorate,** (Cambridge, 1915), Vol II. P. 255.
৪. W. Jochetson, **The Koryak,** (Publications of the Jestup North Pacific Expedition, 1908), Vol. VI, P. 741—42.
৫. G.A. Erman, **Travels in Siberia,** (London 1848), P. II. 442.
৬. Lord Kames, **Sketches of the History of Man,** (Edinburgh, 1913), P. I. 449.
৭. J.L. Kraft, **Travels, Researches and Missionary Labours during an Eighteen Years Residence in Eastern Africa** (London, 1860), P. 354.
৮. J. Shooter, **The Kafirs of Natal and Zulu Country,** (London, 1857), P. 74.
৯. Maya Das, "An Article' in **The Punjab Notes and Queries,** (1884—1885), Part II. P. 184.
১০. E. Crawley, **Op. Cit.,** P. II. 80.
১১. C.G. Seligman, **The Melanesians of British New Guinea,** (London, 1910), P. 268—269.

১৬

১. J.G. Frazer, **Tootemism and Exogamy,** (London, 1910), P. 32.
২. B.A. Gupta, **A Prabhu Marriage : Customary and Religious Ceremonias,** (London, 1911), P. 71.
৩. W. Crooke, **The Popular Religion and Folk-lore of Northern India,** (London, 1871), Vol II. P. 115.
৪. H.H. Risley, **Tribes and Castes of Bengal,** (Calcutta, 1891), Vol. II. P. 202.
৫. E.T. Atkinson, 'Notes on the History of Religion in the Himalayan of the North West Province' in **J.A.S.B.** (1884), L III, i. i. P. 100

৬. W. Crooke, **Op. Cit.**, P. II. 120.
৭. A.. Von Gennep ; **Les Rites de Passage,** (1909), P. 190.
(ই. ক্রলের 'দি মিষ্টিক রোজ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।)
৮. J.G. Frazer, **The Golden Bough,** P. 9.
৯. F.L. Critchlow, **On the Forms of Betrothal and Wedding Ceremonies in the Old Franch Romans and Aventure** (1903), P. 16.
১০. F. Boas, **Soicial Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians** (United States National Museum Report, 1895), P. 359.
১১. P.P. Howell, **A Mannual of Nuer Law,** (Oxford University Press, London, 1954), P. 74—75.

১৭

১. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** P. 136.
২. রবার্ট ব্রিফল্ট মেজর রস কিং-এর বরাত দিয়েছেন। প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪২
৩. রবার্ট ব্রিফল্ট স্যার ডেনজিল ইবেটসন-এর বরাত দিয়েছেন। প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৭
৪. W R. Smith, **Kinship and Marriage in Early Arabia,** (London, 1885), P. 170.
৫. E. Westermark, **The History of Human Marriage,** (London, 1901), P. 318.
৬. Sir B.H. Thomson, "Concubitancy in the Classifiactory System of Relationship' in **J.A.I.** (1845), Vol. XXIV, P. 383.
৭. A.H. Huth, **The Marriage of Near Kin Considered with respect to the Law of Natives,** (London, 1875), P 10—14.
৮. C. Darwin, **The Descent of Man,** (London. 1883), P. 37.

৯. L. Fison, **Kamilaroi and Kurnai,** (Melbourne, 1880) P. 370—372.
১০. E. Crawley, **Op. Cit.,** P. II. 218.
১১. W.R. Smith, **Op. Cit.,** P. 149.
১২. E.M. Curr, **The Australian Race,** (London, 1887) P. 245.
১৩. A.C. Haddon, **The Ethnography of Western Tribes of Torres Straits** in J A.I. (1890), Vol. XIX. P. 411.
১৪. W.H.R. Divers, **Kinship and Social Organization,** (London, 1914), P 39.

১৮

১. A. Betta, 'The Symbolic Use of Corn at Weddings', in **The Westminister Reviews** (1912), Vo.l XXVIII, P. 542.
২. W.W. Skeat, **Malay Magic,** (London, 1900), P. 278
৩. J. Forsyth, **The Highlands of Central India,** (London, 1871), P. 149.
৪. H.B. Rowney, **The Wild Tribes of India,** (London, 1882), P. 67.
৫. J. Forbes, **Eleven Years in Ceylon,** (London, 1840 P. I. 331.
৬. L.W. Kuchler, 'Marriage in Japan', in **Transaction of the Asiatic Society of Japan,** (1885), Vol. XIII, P. 115.
৭. W.W. Gill, **Life in Southern Isles** (1876), P. 63.
৮. S. St. Johns, **Life in the Forest of Far East,** (London 1862), P. 51.
৯. E.T. Dalton, **Descriptive Ethrology of Bengal,** (Calcutta, 1872), P. 37.
১০. A. Leared, **Morocco and Moors,** (London, 1876) P. 37.
১১. J. Cain, 'An article' in **The Indian Antiquary,** (Bombay, 1874), P. III. 151.

১২. E.G. Curbutt, 'Some Minor Superstitions and Customs of the Zulus' in **Folklore Journal** (Capetown, 1880), Vo. II. P. 12.
১৩. J.G. Frazer, **Tootemism and Exogamy**, (1910),P.248
১৪. E. Crawley, **Op. Cit.**, P. II. 136.
১৫. G.O. Musters, **At Home with the Patagonians**, (London, 1873), P. 184.
১৬. J.W. Anderson, **Notes of Travel in Fiji and New Caledonia**, (London, 1880), P. 30.
১৭. J. Shooter, **The Kefirs of Natal and the Zulu Country** P. 54.
১৮. W. Westermark, **The History of Human Marriage**, (London, 1910), P. 395.

১৯

১. L.T. Hobhouse, G.C. Wheeler and M. Ginsberg, **The Material Culture and Social Institute of the Simpler Peoples**, (London, 1930), P. 85.
২. G.P. Murdock, **Social Structure**, (New York, 1949), P. 20.
৩. C.A. Soppitt, **A Short Account of the Kuki-Lushai Tribes on the North East Frontier**, (London, 1887), P.14-15
৪. W.H. Brett, **The Indian Tribes of Guiana**, (London, 1868), P. 101.
৫. J. Bonwick, **Daily Life and Origin of the Tasmenians**, (London 1870), P. 72.
৬. M.J. Harskovits, 'A Note on Woman Marriage in Dahomy', (Africa Vol. No. 10, 1937), P. 335.

২০

১. C.G. and B. Seligman, **The Veddas**, (Cambridge, 1911), P. 100.

২. Fernando Henriques, **Love in Action**, (London, 1962), P. 257.

৩. **Ibid**, P. 272.

৪. W.H.R. Rivers, **The Todas**, (London, 1906), P. 525—529.

৫. G. Gorer, **Himalayan Village**, (London 1938).P. 171

৬. Fernando Henriques, **Op. Cit.**, P. 275.

৭. **Ibid**, P. 281.

৮. B. Blackwood, **Both Sides of Buka Passage**, (Oxford University Press, 1935), P. 110.

২১

১. Hutton Webster, **Primitive Secret Societies**, (New York, 1908), P. 38.

২. W.D. Hambly, 'Some Books for African Anthropology' in **Field Museum of Natural History, Anthropological Service**, Vol. 26, Part 2, (1947), P. 498.

৩. Ruth Benedict, **Patterns of Culture**, (New York, 1961), P. 26.

৪ Robbert Briffault, **The Mothers**, P. 193—195.

৫. Ruth Benedict, **Op. Cit.**, P. 27.

৬. S. Powers, **Tribes of California**, (Washington, 1927), O. 79.

৭. Robbert Briffault, **Op. Cit.**, P. 195—196.

৮. E.H. Man, 'The Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands' in **J.A.I.** (1883), P. XII. 134.

৯. R.B. Smyth. **The Aborigines of Victoria**, (1878), P. 202.

১০. S. Hearne, **A Journey from Prince of Wale's Fort in the Northern Ocean**, P. 319.

১১. G. Taplin, **The Native Tribes of South Australia**, (London, 1879), P. 69.

১২. W.B. Spencer and F.G. Gillen, **The Native Tribes of Central Australia**, (London 1899). P. 251.

১৩. Craighill Handy, 'The Polynesian Family System in Kaw, Hawai' in **Journal of the Polynesian Society,** No. 4, 1951), P. 276.
১৪. W.T. Pritchard, 'Notes on Certain Anthropological Matters respecting the South Sea Islanders', in **Memiors of the Anthropological Society,** London, 1884, Vol. 7, P. 325—326.
১৫. J. Thomson, **Through Masai Land** (London, 1887), P. 258.
১৬. W.H. R. Rivers, **The Todas,** (London, 1906), P. 503.
১৭. E. Crawley, **The Mystic Rose,** P. II. 74.
১৮. S. Fraued, 'The Taboos of Virginity' in **Collected Papers,** (1924—1925), P. IV. 220.
১৯. R. Peristiany, **The Social Institutions of the Kipsigis,** (London, 1937), P. 73—73.

২২

১. Robbert Briffault, **The Mothers,** P. 126—127.
২. **Ibid.** P. 127.
৩. **Ibid,** P. 131.
৪. G.P. Murdock, **Social Structure,** (New York, 1949), P. 370.
৫. W. Ellis, **Polynesian Researchers,** (London, 1859), P. 274.
৬. Lloyd Warner, **A Black Civilization,** (Revised Edition, New York, 1958), P. 306.
৭. Lloyd Warner, **Op. Cit.,** P. 307—308.
৮. F. Boas, 'The Central Eskimo' in **6th Annual Report of Bureau of Ethnoogy,** (1884—85), Washington, 1888, P. 579.
৯. F. Boas, **Op. Cit.,** 605
১০. A.C. Hollis, **The Massai,** (London, 1908), P. 261.

১১. L.F. Tautain, 'Etude Sur Le marriage des polynesians des Iles Marquises' in **Anthropologic** Vol. VI, Paris, 1896. P. 692.

১২. Bengt. Danielsson, **Love in The South Seas,** (London, 1965), P. 114.

১৩. F. Sheldon, 'Custom among the Natives of East Africa', in **J.A.I.** (1892), Vol, XXI, P. 365.

১৪. L. Fison and A.W. Howith, **Kemilaroi and Kurnai,** (Melbourne, 1880), P. 202.

১৫. J. Thomson, **Through Masai Land,** (London, 1887) P. 51.

১৬. H. Egede, **A Description of Greenland,** (London, 1878, 2nd Edition), P. 140.

১৭. W.G. Sumner, **Folkways,** (New York, 1910), P. 483.

১৮. **Ibid,** P. 484.

১৯. W. Junker, **Reisen in Africa,** (1875—1886), P. 291.

২০. P.S. Pallas, **Voyages in Russia,** (Paris, 1893), IV. 69.

২১. J. Sibree, **The Great African Island,** (London 1880) P. 252

২২. G.H. Von Langsdorff, **Voyages and Travels in Various Parts of the World,** 1801—1807. (Cartisle, 1817), P. 358.

২৩. P.F. Sarassin, **Die Weddahs,** (Wiesbaden, 1893), P. 466.

২৪. W.G. Sumner, **Folkways,** P. 484.

২৫. **Ibid,** P. 485.

২৬. Robbert Briffault, **The Mothers,** P. 132.

২৭. W.G. Sumner, **Op. Cit.,** P. 485.

২৮. F. Galton, **Hereditary Genius,** (New York, 1870), P. 151.

২৯. H. Yule, **Mission to Ava,** (London, 1858), P. 86.

২৩

১. **B.E.F.E.O.,** Vol. II. (1902), P 144.
২. Robbert Briffault, **The Mothers,** P. 314—315.
৩. **Ibid,** P. 312.
৪. J.P. Vogel, **Indian Serpent Lore,** (London, 1926), P. 31.

২৪

১. J.P. Mills, **The Rengma Nagas,** (London, 1937), P. 224.
২. E Thurston, **Castes and Tribes of Southern India,** (Madras, 1909), P. VI. 63.
৩. Verrier Elwin, **Myths of Middle India,** (1949), P. 454.
৪. W.B. Spencer and F.J. Gillen, **The Native Tribes of Central Australia,** P. 545.
৫. J.G. F. Riedel, **Op. Cit.,** P. 414.
৬. **Ibid,** P. 358.
৭. J. Bedier, **The Romance of Tristan and Iseult,** (London 1913), P. 47.
৮. B. Blackwood, **Both Sides of Buka Passage,** (Oxford University Press, 1935), P. 121.
৯. Fernando Henriques, **Love in Action,** (London, 1963), P. 97.
১০. E.F. Fortune, **The Sorcerers of Dobu,** (London, 1932), P. 235.
১১. J. Mooney, 'The Sacred Formulas of the Cherokees' in **Annual Report of the Bureau of Ethnology,** (1891) Vol. VI. P. 380.
১২. Fernando Hendriques, **Op. Cit.,** P. 97.

২৫

১. P.O. Bodding, **Studies in Santal Medicine and Connected Folklore,** (Calcutta, 1925), P. 126—127.

২. J.H. Hutton, **The Angami Nagas,** (London, 1921) P. 263

৩. S. Beal, **Buddhist Records of the Western World** Vol. I. P 198.

৪. W. Crooke, 'The Land and Island of Women', in **Man in India,** Vol, II, P 12

২৬

১. Havelock Ellis, **Analysis of the Sexual Impulse** (London, 1914), P 33

২. J.W. McCrindle, **Ancient India,** P 300.

৩. Margaret Mead, 'The Mountain Arapesh' in **Anthropological Papers, American Museum of Natural History,** XXXVI, 1940, Part II P. 360.

৪. W.G. Archer, **The Blue Grove,** P. 72.

৫. J.P. Mills, **The Rengma Nagas,** P. 260

৬. Verrier Elwin, **The Muria and Their Ghotul,** P. 430—31.

৭. G. Gorer, **Himalayan Village,** P. 226.

৮. C.G. Seligman, Anthropological Perspective and Psychological Theory' in **J.R.A.I.** Vol. LXII. P. 229.

৯. F. Boas, "Tsimshian Mythology' in **Thirtyfirst Annual Report of the Bureau of American Ethnology,** 1909-1910, Washington, 1916, P. 809.

১০. R.H. Lowie, 'The Test-Theme in North American Mythology' in **Journal of American Folklore,** Vol. **XXI,** 1908, P. 110.

'The Northern Shoshone' in **Anthoropological Papers of the American Museum of Naturral History,** Vol. II, 1905, P. 260.

১১. G.A Dorsey and A. L. Krober, Tiaditions of the ' Arapaho' in **Field Columbian Meseum, Anthoropological Services,** V, Chicago, 1905, P. 260.

১২. W. Bogoras, Tales of Eastern Sıberıa' ın **Anthropological Papers of the American Museum** of Natural History Vol. XX, 1924, P. 97.
'The Folklore of North Ezstern Asia as compared with that of North Western America', ın **American Anthropologists,** Vol, IV, 1902, P. 667.

১৩. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** P. 118.

১৪. E. Westermark, **The History of Human Marriage** P. I. 405—406.

১৫. G. Landtman, **The Kwai Papuans of British New Guinea,** (London, 1927), P. 238.

১৬. R.L. Dickinson, **Human Sex Anatomy,** (London, 1733), P. 100.

১৭. Verrier Elwin, The Vagina Dentata Legend' in the **British Journal of Medical Ethnology,** Vol. XIX, 1943, P. 439—53.

১৮. M. Jacobs, 'Coos Myth Texts' (**University of Washington Publications in Anthropology, Vol. VIII,** Washington 1940), P. 206.

১৯. C. Wisler, 'Mythology of the Blackfoot Indians' in **Anthropological Papers of the American Museum of Natural History,** Vol, II, 1308, P. 16.

২০. D.C Duvall, 'Mythology of the Black foot Indians', in **Anthropological Papers of the American Museum of Natural History,** Vol. II, 1908, P. 16.

২১. Savage Landor, **Alone with the Hairy Ainu,** P. 141.

২২. Verrier Elwin, **Myths of Middle India,** P. 361.

২৩. Block, **The Sexnal Life of Our Time,** (London, 1941), P. 559.

২৭

১. আবদুস্ সাত্তার আরবী কবিতা, (ঢাকা, ১৯৭৪), পৃ. ১৯
২. **The Book of a Thousand Nights and One Night.** Translated by E. Powy Mathers from the version of J.C. Mardrus, (London, 1923), Vol. 3, P. 477.
৩. Robbert Briffault, **Op. Cit.,** P. 120.
আরও বিস্তারিত জানা যাবে A. Aymard, Les Touaregs. Paris, 1911.
৪. Mungo Park, **Travels in the Interior of Africa,** (Edinburgh, 1860), P. 36.
৫. B Malinowski, **The Sexual Life of Savages,** P. 248
৬. D. Pierson, . **Negros in Brazil,** (Chicago, 1944) P. 136
৭. Fernanando Henriques, **Love in Action,** (1963) P 62—63.

২৮

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, (কলিকাতা. ১৯৫৪, ১ম সংস্করণ), পৃ, ১৯৫
২. চাকমাদের এই 'উবাগীত' শ্রী সলিল রায় কর্তৃক সংগৃহীত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'পার্বত্য বাণীতে' প্রথম ছাপা হয়েছিল। শ্রী সলিল রায়ের অনুমতিক্রমে গানগুলোর অনুবাদ সামান্য পরিবর্তন করে এই গ্রন্থে সংযোজিত হলো।
৩. শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব, বাংলার পল্লীগীতি, (কলিকাতা, ১৩৭৩) পৃ. ৬৪
৪. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, (রাঙ্গামাটী, ১৯৬৯), পৃ, ২৭৪-৭৫
৫. Charu Lal Mukherjee, **The Santals,** (Calcutta, 1962) P. 397.
৬. বরেন ত্রিপুরা, অজানা পাহাড়ী সুর, (রাঙ্গামাটি, ১৩৭৩). পৃ ৪

২৯ ।

১. Charu Lal Mukherjee, **Op. Cit.,** P. 367.
২. সুধীর কুমার করণ, সীমান্ত বাংলার লোকযান, (কলিকাতা, ১৯৫৯), পৃ, ২৩৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৩
৪. Verrier Elwin, **The Tribal Art of Middle India,** (Oxford University Press, 1951), P. 97, 103, 107 and 167.
৫. M.S. Herskovits, **Background of African Arts,** (Denver, 1945), P. 117.
গ্রন্থটিতে আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম সমাজের শিল্পকলার নমুনা এবং সেই সঙ্গে যৌন-আবেদন মূলক চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে।
৬. A.L. Krober, 'Art' in J.H. Steward (সম্পাদিত) **Handbook of South American Indians,** Vol. 5. P. 411—492
আমেরিকার আদিম সমাজের চিত্র-বিচিত্র শিল্পকলার পরিচয় এতে বিধৃত।
৭. R. Linton and P.S. Wingert, **Arts of the South Seas,** (New York, 1946), P. 217—47.
সামোয়া অঞ্চলের আদিম সমাজের বিভিন্ন ধরণের চিত্রের নমুনা এতে উপস্থিত।

৩০

১. শঙ্কর সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০৫.
২. আবদুস্ সাত্তার, আরণ্য জনপদে (১৯৭৬),
আরণ্য সংস্কৃতি (১৯৭৫), **In the sylvan shadows** (১৯৭১) ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৩. শঙ্কর সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৮,

দ্বিতীয় পর্ব

১

১. ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য ঢাকা (১৯৭৭),

২. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ (ঢাকা, ১৯৭৬)

২

১. Abdus Sattar, **In the Sylvan Shadows.** (Dacca, 1971) P. 173—174.

২. **Ibid,** P. 54—56.

৩. 'Who taught the first man and woman to make rice-beer and thus introduced sexual congress to the world.' (Census of India, 1931 : Vol. I. Part III-B P. 109.

৪. Hivale and Elwin, **Songs of the Forest,** (London, 1944), P. 18F.

৫. Verrier Elwin, **Myths of Middle India** (Oxford University Press, London, 1949). P. 28—29.

৬. Abdus Sattar, **Op. Cit,** P. 252—253.

৭. R.H. Sneyd Hutchinson, **Eastern Bengal and Assam District Gazetteer** (Chittagong Hill Tracts), Allahbad, 1909 P. 38.

৩

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, (কলিকাতা ১৯৫৭), পৃ, ৫৬৩

২. প্যারীমোহন দাসগুপ্ত (সম্পাদিত) মনসা মঙ্গল, (কলিকাতা, ১৩৩৭) পৃ, ৫৪

৩. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৫—৪৬
৪. সুধীর কুমার করণ, সীমান্ত বাংলার লোকগান, (কলিকাতা, ১৩৭১), পৃ, ৩৮—৩৯
৫. C.H. Bompas, **Folklore of Santal Parganas,** (London 1909), P. 78.
৬. Abdus Sattar, **Op. Cit,** P. 274.
৭. Major P.R.T. Gurdon, **The Khasis,** (London, 1907) P. 165—166.
৮. C.H. Bompas, **Op. Cit.** P. 215.

৪

১. J.P. Mills, **The Ao Nagas,** (London, 1926), P. 227.
২. C.H. Bompas, **Op. Cit,** P. 402.
৩. **Census of India,** 1931, P. 113.
৪. S.C. Roy, **The Hill Bhuyan of Orissa** (Ranchi 1936) P. 279.
৫. S.C. Roy, **The Kharias,** (Randi, 1941), P. 431.
৬. S.C. Roy, **The Birhors,** (Ranchi 1325), P. 486.
৭. Major A. Playfair, **The Garos** (London 1909), P. 85.
৮. **The Census of India,** 1931, P. 116.
৯. Major P.R.T. Gurdon, **Op. Cit,** P. 171.
১০. J.G. Frazer, **The Worship of Nature,** .Vol. I (London 1926), P. 47.
১১. Verrier Elwin, **Op. Cit.** P. 75.
১২. W. Crooke, **The Popular Religion and Folklore of Northern India,** Vol. II, P. 144.
১৩. Verrier Elwin, **Op. Cit,** P. 103.
১৪. S.C. Roy, **The Birhors,** P. 497.
১৫. J.P. Mills, **Op. Cit.** P. 304.
১৬. A.C. Brown, **The Andaman Islanders,** (Cambridge, 1922). P. 145.

১৭. Mason, 'Karens' in **JASB**, Part II, P. 217.
১৮. Callaway, **Zulu Tales,** Vol I. P. 294.
১৯. R.S. Rattray, **Ashanti,** P. 174.
২০. J.G. Frazer, **Op. Cit,** P. 110.
২১. E.B. Tylor, **The Origins of Culture,** Part I, P. 290
২২. **Census of India,** 1931, P. 102.
২৩. H.A. Rose, **A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-East Frontier Prnvinces,** (Lahore 1919), P. 127.
২৪. D.N. Majumder, 'Some Ethnographic Notes on the Hos of Kolhan', in **Man in India,** Vol. V, P. 185.
২৫. Major A. Playfair, **Op. Cit,** P. 88.
২৬. S.C. Roy, **The Birhors,** P. 498.
২৭. A.C. Hollis, **The Massai,** P. 288.
২৮. J.G. Frazer, **Op. Cit,** P 47.
২৯. R.G. Chaube, **N.T. Notes and Queries,** Vol. IV. P. 129.
৩০. S.C. Roy, **The Birhors,** P. 498.
৩১. Mariner, **Tonga Islanders,** Vo. II. P. 120.
৩২. E.B. Tylor, **Op. Cit.** P. 264.

৫

১. Verrier Elwin, **The Myths of Middle India,** P. 230.
২. Major P.R.T. Gurdon, **Op. Cit.** P. 130.
৩. Verrier Elwin. **Op. Cit,** P. 218.
৪. আব্দুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃ, ২২০
৫. W.V. Grigson, **The Maria Gonds of Bastar,** (London, 1938), P. 206.
৬. Robbert Briffault, **The Mothers,** (1959), P. 308.
৭. Ivor H.N. Evans, **Studies in Religion Folklore and Custom in British North Borneo and the Malaya Peninsula,** (Cambridge, 1923), P. 47.
৮. J.G. Frazer, **Op. Cit,** P. 199.

৯. N. Stamm, **Bantu Kavirondo of Mumies district (Near Lake Victoria),** Anthropos, Vol, XIV—XV (1919--1920). P. 979.
১০. E.T. Dalton, **Descriptire Ethnology of Bengal,** (Calcutta, 1872), P. 165.
১১. Kalhan, **Rajtarangini,** Vol. I. (Trans, Sir Aurel Stein), P. 29.

৬

১. Verrier Elwin, **The Muria and Their Ghotul,** P. 308.
২. Mrs. Rafy, **Folk Tales of the Khasis,** (London, 1920), P. 75.

৭

১, শঙ্কর সেন গুপ্ত, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, (কলিকাতা, ১৯৭২) পৃ, ৩৯১—৩৯২
২. আবদুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে (ঢাকা, ১৯৭৬) পৃ, ৮৫—৮৬
৩. শঙ্কর সেন গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

৮

১. জনাব শফিক উদ্দিন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।
আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
২. উচ হ্লা, রচিত এবং উচম্রামং-এর সহায়তায় আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৩. সাদ মংপ্রোয়েপ্রু রচিত এবং উ চম্রামং-এর সহায়তায় আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৪. ধীরেন্দ্র মা'রাক রচিত এবং আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৫. ধীরেন্দ্র মা'রাক রচিত এবং আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৬. মধু সাংগমা রচিত এবং আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।

৭. ররেন ত্রিপুরা কর্তৃক সংগৃহীত ও তাঁর সহায়তায় আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৮. ররেন ত্রিপুরা রচিত এবং তাঁর সহায়তায় আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৯. ননাধন চাকমা রচিত এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাকমার সহায়তায় অনূদিত।
১০ কমলা মিনুজী রচিত এবং তাঁর সহায়তায় অনূদিত।
১১. ঐ

৯

১. শ্রী সলিল রায় কর্তৃক সংগৃহীত ও আবদুস্ সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
২. শ্রী ভগদত্ত খীসা কর্তৃক সংগৃহীত ও আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত।
৩. ঐ
৪. এই ছড়াটি ১৯৬৬ সালে হোসেন আলী মাতবর টি কে -এর সহায়তায় হালুয়াঘাটের মাজরাকুরা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। ছড়াটি প্রায় একইভাবে মাহবুবুল হক কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে বিরিশিরি কালচারাল একাডেমীর মুখপত্র 'জানিরা' জানুয়ারী ১৯৭৮ সালে পত্রস্থ হয়েছে।
৫. মাহবুবুল হাসান ও মাহবুবুল হক কতৃক সংগৃহীত এবং 'জানিরা', জানুয়ারী, ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। একইভাবে এসব ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত। পৃ. ৫৯৭.

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী
আদিম সমাজ
শব্দসূচী

গ্রন্থপঞ্জী

Abdul Hafiz : *Loukik Sanskar O Manab Samaj,* (Dacca, 1976)

: *Bangladesher Loukik Oitijya* (Dacca, 1975)

Abdus Sattar : *Aarannya Janapade*, (Dacca, 1966)

: *Aaranya Sanskriti,* (Dacca, 1977)

: *In the Sylvan Shadows,* (Dacca, 1971

: *Tribal Culture in Bangladesh*, (Dacca, 1975)

: *The Sowing of Seeds*, (Dacca, 1977)

Agarwala, S.W. : *Age at Marriage in India*, (Delhi, 1062)

Allen, B.C. : *Assam Census Report*, 1901.

Allen, W.J. : *Report on the Khasi and Jaintia Hill Territory*, 1858.

Archer, W.G. : *The Blue Grove*, (Calcutta, 1928)

: *The Dove and the Leopard*, (Calcutta, 1948)

Ashley Montagu, M.F. : *Coming into Being among the Australian Aborigines*, (London, 1937)

Anderson, J.W. : *Notes of Travel in Fizi and New Caledonia,* (London, 1890)

Ashraf Siddiqui, Dr. : *Loka Sahitya*, (Dacca, 1978)
: *Kingbadantir Bangla*, (Dacca 1975)
: *Lokayat Bangla*, (Dacca, 1977)
: *Folktakes of Bangladesh* (Dacca 1976)
: *Folkloric Bangladesh*, (Dacca 1976)

Ashutosh Bhattacharjee, Dr : *Banglar Loka Sahitya*, (Calcutta, ist ed. 1954)

Bain, F.W. : *A Digit of the Moon*, (London, 2nd edn, 1901)

Baines, J.A. : *Census Of India*, 1891.

Bancroft, H.H. : *The Native Races of the Pacific States of North America*, (1898)

Barton, R.F. : *The Kalingas*, (Chicago, 1949)
: *Ifugaon Law*, (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. 15, 1919)

Barua, Hem : *The Red River and the Blue Hill*, (Ganhati, 1956)

Beal, S. : *Buddhist Records of the Western World*, (London, 1909)

Beech, M.W.H. : *The Suk*, (London, 1911)

Benedict, R. : *Patterns of Culture*, (Newyork, 1937)

Bernot, L. : 'Chittagong Hill Tribes' in *Pakistan Society and Culture*, ed. by Stanley Marton, Human Relation Area Files, (New Haven, 1957)

Bessaignet, P. : 'Tribes of the Northern Borders of Eastern Bengal' in *Social Research in East Pakistan* (Dacca, 1960)

Betts, A : 'The Symbolic Use of Corn at Wedding' in *The Westminister Review*, vol. CL. XXVIII. (1912)

Biddulph, J. *Tribes of the Hindu Kosh*, (Calcutta, 1880)

Blackwood, B. : *Both Sides of Buka Passage*, (London, 1935)

Boas, F. : *Social Organization and Secret Societies of the Kawakiutl Indians*, (United States National Museum Report, 1895)

: 'The Central Eskimo' in *6th Annual Reports of Bureau of Ethnology*, (Washington, 1888)

: 'Tsimshian Mythology' in 31st *Annual Report of the Bureau of American Ethnology*, 1909-1910, (Washington, 1916)

Bompas, C.H. *Folk-lore of the Santal Parganas*, (London, 1909)

Bogoras, W. : 'Tales of Eastern Siberia' in *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History*, vol. XX. 1924.

: 'The Folk lore of North Eastern Asia as compared with that of North Western America' in *American Anthropzlogist*. Vol. V, 1902.

Booding, P.O. : *Studies in Santal Medicine and Connected Folk-lore*, (Calcutta, 1925)

Bourke, J.G. : *Scatologic Rites of all Natives*, (London, 1892)

Bowney, H.B : *The Wild Tribes of India*, (London, 1882)

Bowring, J. : *A Visit to the Philippine Islands*, (London, 1904)

Bownick, J. : *Duily Life and Origin of the Tasmenians*, (London, 1870)

Brett, W.H. : *The Indian Tribes of Guiana*, (London, 1868)

Briffault, R : *The Mothers*, (Abridged Edn., London, 1958)

: 'Group Marriage and Sexual Co-Communism' in *The Making of Man* ed. V.F. Calverton, (New York, 1931)

Brown, A.R. : *The Andaman Islanders*, (Cambridge, 1922)

Butler, John : *A Sketch of Assam with some Account of the Hill Tribes,* (London 1897)

: *Travels and Adventure in the Province of Assam,* (London, 1895)

Cain, J. : 'Article' in *Indian Antiquary*, vol. III, 1874.

Callaway, H. : 'Relation of Amazulu' in *The Religious System of Amazulu.* (Natal, 1868-1870)

Campbell. J.M. : 'Notes on the Spirit Basis of Belief and Custom' in *The Indian Antiquary*, vol. XXXVI, 1877.

Campbell, A. : 'The Traditions of Santals' in *J.B.O.RS.*, vol. II.

Chakma Barmi, Madhab Chandra : *Sree Sree Rajnama,* (Rangamati, 1940)

Chatterjee, Devi Prasad : *Lokayat Darshan,* (Calcutta, 1772)

Chatterjee, Dr. Suniti Kumar : *Sanskritiki,* (Calcutta, 1368 B.S.)

Chatterjee, Gayatree : *Varater Nritya Kala*, (Calcutta, 1371 B.S.)

Codrington, R.H. : *The Melanesians,* (Oxford University Press, 1891)

Comric, P.V. : 'Anthropological Notes in New Guinea' in *Journal of Royal Anthropological Institute*, vol. I, 1876

Conybeare, F.C : 'A Brittany Marriage Custom' in *Folk-lore*, vol VIII (London, 1907)

Cook, James : *An Account of a Voyage Round the World*, vol. I, (London, 1896)

Crawley, A F : 'Exogamy of Mating of Cousins' in *Anthropological Essays* (1907)

Crawley, E. : *The Mystic Rose*, (London, 1962)

Critchlow, F.L. . *On the Forms of Betrothal and Wedding Ceremonies in the Old French Romans and Aventure*, (London, 1903)

Crooke, W. : 'The Hill Tribes of the Central Indian Hills' in *Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol XXVVIII, 1899)

The Land and Island of Women in *Man in India*, vol. II (1922)

: *An Introduction to the Popular Religion and Fold-lore of Northern India*, vol I, (London, 1926)

Curr, E.M. : *The Australian Race*, (London, 1876)

Curbutt, E.G. : 'Some Minor Superstitions and Customs of the Zulu's In *Folk-lore Journal*, (Cape Town, 1880)

Dalton, E.T. : *Descriptive Ethnology of Bengal*, (Calcutta, 1872)

Danialsson, B. : *Love in the South Sea*, (London, 1965)

Darwin, G.R. : *The Descent of Man*, (London, 1883)

Das, Maya : 'Artcle' in *The Punjab Notes and Antiqueries*, 1885.

Das Gupta A,S : *A History of Indian Philosophy*, (Cambridge, 1940)

Dawson, J. : *Australian Aborigines*, (Melbourne, 1881)

Daval, D.C. : *Mythology of the Blackfoot Indians* (Anthropological Papers of American Museum of Natural History, vol. II, 1908)

Dehon, P. : *Religion and Customs of the Uraons*, (Calcutta, 1906)

Dickinson, R.L. : *Human Sex Anatomy*, (London,1933)

Dikshit, S.K. : *The Mother Goddess*, (Calcutta, 1947)

Dorsey. G.A : *Tradition of the Arapaho* (Field Columbia Maseum, Anthropological Series, V. Chicago, 1905)

Dunber, George : *Other Men's Lives*, (London, 1938)

Dutta, M.N. : Vishnupuranam, (Calcutta, 1894)

Rgede, H. : *A Description of Greenland*, (London, 1898)

Ehrenfels, O R. : *Mother Right in India*, (Hydrabad, 1941)

Ellis, W. : *Polynesians Researchers*, (London,199

Ellis, Dr. Havelock — 'The Influence of Menstruation on the Position of Women's in *The Studies in the Psychology of Sex*, (London, 1880)
Analysis of the Sexual Impulse, (London, 1901)
Sexual Selections, (London, 1905)

Elwin, Verrier — *The Muria and Their Ghotul*, (Oxford University Press, 1947)
The Baiga (London, 1939)
Myths of Middle India, (Bombay, 1949)
Tribal Myths of Orissa, (Bombay, 1954)
The Agaria, (Bombay, 1942)
'The Vagina Dentata Legend' in *British Journal of Medical Psychology*, vol. XIX (1943)
Folk tales of Mahakoshal, (Bombay, 1944)

Erman, G.F. — *Travels in Siberia*, (London, 1898)

Felkin, R.W. — *Uganda and Egyptian Suden*, (London, 1882)

Firth, R. — *We the Tikopia*, (London, 1936)
Primitive Polynesian Economy, (London, 1939)
Human Types, (London, 1965)

Fison, I. — *Kamilarai and Kurnai*, (Malbourn,e 1880)

Forbes, J. — *Eleven Years in Ceylone*, (London, 1880)

Forsyth, J. : *The High Lands of Central India*, (London, 1871)

Fortune, E.F. : *The Sorecrers of Dobu*, (London, 1932

Frazer, J.G. : The Golden Bough, (Abridged edn, 1960)
: *Myths of the Origin of Fire*, (London, 1930)
· *The Worship of Nature*, (London 1926)
: *Tootemism and Exogamy*, (London, 1910)

Freud, S. : *Tootems and Taboos*, (London, 1965),

Furer Haimendrof, C. Von : 'The Naked Nagas' in *Journal of Royal Anthropological* Institute, vol. Ixvlii, 1938.

Gait, E.A. : *Census of India*, Assam Volume, 1901

Galton, F. : *Hereditary Genius*, (New Yor, k1870)

Gill, W.W. : *Life in Soutyern Isles*, (London, 1876)

Gillen, F.J. : *The Native Tribes of Central Australia*, (London, 1899)

Godden, G.M. : 'The False Bride' in *Fook-lore*, vol. IV (1893)

Gorer, G. : *Himalayan Village*, (London, 1938)

Ghosh, Satish Chandra, : *Chakma Jaati*, (Calcutta, 1915)

Grierson, G.A. : *Linguistic Survey of India*, vols, I-VI. (Calcutta, 1906)

Grison, W.V. : *The Maria Gonds of Bastar,* (London, 1938)

Guha, B.S. : *An Outline of the Racial Philosophy of India,* (Calcutta 1737)

Gupta, B.A. : *A Prabhu Marriage : Customary and Religous Ceremony,* (Bombay, 1911)

Gurdon, P.R T. : *The Khasis,* (London, 1914)

Hall, D.G.E. : *A History of South East Asia,* (London, 1955)

Hambly, W.D. : 'Source Book for African Anthropology' in *Field Museum Natural History, Anthropological Series,* vol. 36, Part II, 1947)

Handy, Craighill : 'The Polynesian Family System in Kau, Hawai' in *Journal of the Polynesian Society,* No. 4, 1951.

Hawley, F.H. : 'James Kiva Magic and its Relation to Features of Pre-historic Kivas' in *South Eastern Journal of Anthropology,* Vo.l 8, 1952)

Held, G.J. : *Mahabharata,* (London, 1935)

Hearne, S. : *A Journey frnm Prince to Wale's Pnrt i'the Northern Ocean,* (London 1895)

Hinriques, Farnando *Love in Action,* (London, 1963)

Hickson, S.J. *A Naturalist in North Celebes*, (London, 1889)

Himes, N.E. *Medical History of Contraception*, (London, 1936)

Herskovits, M.J. *A Note on Women Marriage in Dahomey*, Arfica Vol. 10, 1937.

Hobley, H. *Ethnology of A-Kamba and Other East African Tribes*, (Cambridge,1910)

Hobbhouse, L.T. *The Material Culture and Social Institute of the Smpler Peoples*, (London, 1930)

Hodson, T.C. *The Naga Trihes of Manipur*, (London, 1911)

Hoebel, E.A. : *Man in the Primitive World*, (London, 1958)

Hollis, A.C. : *The Religion of the Nandi*, (Oxford 1909)

Hunter, W.W. : *The Annals of Rsal Bengal*, (London, 1868)

Hutchinson, R.H.S. : *Eastern Bengzl and Assam District Gazetteer (Chittagong Hill Tracts)*, Allahabad, 1909.

: *An Account of Chittagong Hill Tracts*, (London, 1876)

Howell, P.P. : *A Manual of Nuer Law*, (London,1954

Huth, A.H. : *The Marriages of near Kin Considered with Respects to the Law of Nation*, (London, 1875)

Hutton, J.H. : *The Angami Nagas*, (London, 1921)
: *The Sema Nagas*, (London, 1921)
: *Census of India*, 1931, vol. I, part III-
: *Caste in India*, (Calacutta, 1977)

Hume, R.E. : *The Thirteen Principal Upanishads*, (Oxford, 1931)

Iyer, L.A. Krishna : *The Travancore Tribes and Castes*, (Trivandrum, 1937-1940)

Jacobs, M. : *Coos Myth Texts* (University of Washington Publications in Anthropology, vol. VIII, Washington, 1910

Jack Finegan : *The Archaeology of World Beligion*, (Princeton, 1952)

Jackson, F.G. : 'Notes on the Samoyeds of the Great Tundra' in *Journal of the Royal Anthropological Institute*. vol. XXIV 1895.

Jenkins, Rev. : *Life and Works in Khasia*, (London, 1911)

Jenks, A.E. : *The Bontoc Igorots*, (Manila, 1905)

Jochelson, W. : 'The Koryak' in *Publications of the Jestup North Pacific Expeditions*, Vol. VI, 1908.

Johns, S. St. : *Life in the Forest of the Far East*, (London, 1952)

Johnston, H. : *The Uganad Protectorate*, (New York, 1902)

Junod, H.A. — *Life of South African Tribes*, (London, 1913)

Kames, Lord — *Sketches of the History of Man*, (London, 1893)

Karsten, R. — 'The Toba Indians of Bolivia Granchaco', *Acta Academi ae Aboensis Humaniora*, (Abo, 1923)

Kinaley, Mary — *West African Studies*, (London, 1901

Koppers, W. — 'Bhagaban the Supreme Deity of the Bhils' *Anthropos Toms* XXXV—XXXVI (1940-1941)

Kowaleski, M. — 'Marriage Among the Early Slavs' *Folk-lore*, London, 1875.

Kraft, J.L. — *Travelsl Researches and Missionary Labours during an Elighteen Years Residence in Eastern Africa*, 1860.

Krober, A.L. — *Traditions of the Arapaho*, (Field Columbia Museum, Anthropological Series No. 5, 1905)

Kuchler, L.W. — 'Marriage in Japan' in *Transaction of the Asistic Society* of Japan, Vol. XIII, 1885.

Laha, B.C. — *Ancient Indian Tribes*, Calcutta, 1935

Landor, W. Savage — *Alone with the Hairy Ainu*, (London, 1879)

Landtman, G. — *The Kiwai Papuans of British New Guniea*, (London, 1927)

Lang, Andrew : *Myth, Ritual and Religion,* (New York, 1899)

Leval, H. : *Mangareya,* (Paris, 1938)

Learmed, A. : *Morocco and Moorso* (London 1876)

Levy Bruhl, L. : *Primitive Mantality,* (London, 1923)

Lewdin, Captain T.H. : *The Jill Tracts of Chittagong and thc Dwellers Therein,* (Calcutta, 1896)
: *Wild Races of South Eastern India,* (London, 1870)

Logan, W. : *Malabar,* (Madras, 1887)

Lowie, R.H. : 'Myths and Traditions of the Crow Indians' in *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History,* Vol. XXV. 1922.
: 'The Test-Theme in American Mythology' in *Jour7al of American Folk-lore,* XXI, 1908.

Lyall, C.J. : *The Mikirs,* (London, 1908)

Mc Crindle, J.W. : *Ancient India,* (Wesatminister, 1901)

Macdonalds, J. : Manners, Custo s, Superstitions and Religions of South African Tribes' in *Journal of the Royal Anthropological Institute,* vol. XIX 1890)

Macdonnel, A.A. : *Vedic Mythology,* (Strassburg, 1897)

Malimowski, I : *The Sexual Life of Savages.* (London, 1968)
: *Magic, Science and Religion,* (London, 1948)
: *Sex, Culture and Myth,* (London 1963)
: *Sex and Repression in Savage Society,* (New York, 1927)
: 'The Natives of Mailu' in *Transaction of the Royal Society of South Australia*, vol. XXIX, 1915.
: 'Marriage' in *Encyclopadia of Britanica*, vol. 14 (14thed.)

Man, E.H : The aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands', in *Journal of Authropological Institute*, vol. XII, 1883.

McLennan, J.F : *Primjtive Marriage*, (London, 1871)

Mead, M. : *Coming of Age in Samos*, (New York, 1926.)
: *Male and Female : A Study of the Sexes in the Changing World.* (New York, 1949)
: *Sex and Temperament in Three Primitive Socjties*, (1935)

Meyer, J.J. : *Sexual Life in Ancient India*, (London, 1930)

Mills, J.P. : *The Rengma Nagas*, (London, 1937)
: *The Ao Nagas*, (London, 1926)

Money, J. : 'The Sacred Formulas of the Cherokees' in *Annual Report of tye Bureau of Ethnology*, Vol. Vi, 1891.

Mukherjee, C. : *The Santals*, (Calcutta, 1962).

Murdock, G.P. : *Social Structure*, (New York, 1949)

Musters, G.O. : *At Hnme with the Patagonians*, (London, 1873)

Nadel, S.F. : *The Nuba*, (London, 1947)

Nath, Rajmohan : *The Background of Assamese Culture*, (Shillong, 1948)

O'Malley, L.S.S. : *Gazetteer of the Santal Paugarnas*, (Calcutta, 1910)

Pallas, P.S. : *Voyages in Russia*, (Paris, 1893)

Parry, N.E. : *The Lakhers*, (London, 1932)

Peal, S.E. : 'The Communal Barracks of Primitive Races' in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, vol. LIX, 1893.

Peristiang, J.G. : *The Social Institutions of the Kipsigis*, (London, 1939)

Playfair, A. : *The Garos*, (London, 1909)

Powers, S. : *The Tribes of California*, (London, 1937)

Powdermaker, H. : *Life in Lesu . The Study of a Aelanesian Society in New Ireland*, (London, 1933)

Pritchard, W.T. : 'Notes on Certain Anthropological Matters respecting of the South Sea Islanders' in *Memoris of the Anthropological Society*, vol. 7 (London 1864)

Radcliffe Brown, A.R. : *Strcture and Functinn in Primitive Society.* (Glencoe, 1952)

Radin, P. : *Primitive Man as Philosopher*, (New York, 1956)
: *Primitive Religion.* (New York, 1957)

Rafy, Mrs. : *Folk-tales of the Khasis,* (London, 1920)

Ray, V.F. : 'The Sunpoil and Nespelum em' in *University of Washington Publications in Anthropology*, vol. 5, 1932

Riseley, H.H. : *Tribes and Castes of Bengal*, (Calcutta, 1891)
: *People of India*, (Calcutta, 1887)

Roheim, G. : 'Women and their Life in Central Australia', in *Jnurnal of the Royal Anthropological Institute,* vol. LIII. 1933.

Roscoe, J. : *The Northern Bantu*, (Cambrideg195)

Rivers, W.H.R. : *The Todas,* (London, 1906)

Roy, S.C. : *The Craons of Chhoto Nagpur*,(Ranchi 1915)
: *The Uraons Religion and Custom,* (Ranchi, 1928)

Roy, S.C. — *The Birhors*, (Ranchi, 1925)
The Kharias, (Ranchi, 1937)
The Hill Bhuyas of Orissa, (Ranchi, 1936)

Russel, R.V. & Hiralal, Raibahadur — *Tribes and Castes of the Central Province of India*, (1976)

Rauussen, K. — 'Intellectual Culture of the Caribon Eskimo' in *Report of the 5th Thule Expedition*, 1922-24. Vol. VII ? No, 2. 1925.

Seligman, C.G. — *The Malnesians of British New Guinea*, (Cambridge, 1910)

Sengupta, Sankar — *Banglarmukh Aami Dekhiachhi*, (Calcutta, 1975)
Bangali Jibaney Bibaha,(Calcutta1975)

Shakespear, Col. J. — *The Lushei-Kuki Clans*, (London, 1912)

Sheldon, F. — 'Customs Among the Natives of East Africa' in *Journal of the Royal Anthropological Institute*, volXXI,1892

Shortland, E. — *The Southern District of New Aealand*, (London, 1902)

Shooter, J. — *The Kafirs of Natal and Zulu Country*. (London, 1897)

Sibree, J. — *The Great African Island*, (London, 1880)

Sidney Endle, Rev. — *The Kacharis*, (London, 1911)

Schapera, I. — *Married Life in an African Tribe*, (London, 1910)

Simmons, L. : *The Role of the Aged in Primitive Society*, (London, 1945)

Skeat, W.W. : *The Malay Magic*, (London, 1900)

Smith, W. Robertson : *The Religion of the Semetes*, (London, 1894)

: *Kinshjp and Marriage in Early Arabia*, (London, 1885)

Spencer, W.B. : *The Native Tribes of Central Australia*, (London, 1912)

Soppitt, C.A : *A Short Account of the Kuki-Lushai Tribes of the North East Frontier*, (London, 1887)

Spreat, G.M. : *Scenes and Studies of Savage Life* (London, 1905)

Stack, E. : *The Mikirs*, (London, 1908)

Stow, G.W. : *The Native Races of South Africa*, (London, 1905)

Sumner, W.G. : *Folk-Ways*, (New York, 1957)

Talbet, P.A. : *The Peoples of Southern Nigeria*, (London, 1926)

Taplin, G. : 'The Narriyeri' in *The Native Tribes of Australia*, (N.Y. 1897)

Thomson, G. : *Studjes in Ancient Greek Society*, (London, 1958)

Thurmald, R. : *Revies of Sex and Temperament in Three Primitive* Societies' in *American Anthropologst*, Vo. 38, 1940.

Thomson, J. : *Through Masai Land*, (London, 1887)

Thomson, B.H. : "Concubitancy in the Classifactory System of Relationship' in *Journal of Anthropology of Royal Institute*, XXIV, 1896.

Thurston, E. : Castes and Tribes of Southern India, (Madras, 1909)

Tichell, Lient : 'Memoir of the Hodesum' in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, Vol, II, 1840.

Treagear, E. : *The Maoris*, (New Zealand, 1940)

Tylor, E.B. : *The Origins of Culture*, (New York, 1958)

Vogel, J.P. : *Indian Serqent Lore*, (London, 1925)

Waddel, L.A. : *Buddhism in Tibet*, (London, 1895)

Warner, Lloyd : *A Black Civilization*, (London, 1958)

Webster, H. : *Taboo*, (London, 1942)

Westermarck, E. : *The History or Human Marriage*, (London 1921)

: *Marriage Ceremoniesiin Morocco*. (London, 194)

Webster, H. : *Primitive Secret Sncieties*. (New York. 1908)

Wissler, C. : Mythology of the Blackfoot Indians, *Anthropological Papers nf the American Museum of Natural History*, Vo. II, 1908)

Yule, H. : *Misson to Ava in* 1855, (London, 1898)

: *The Book of Sir Marco Polo*, (London, 1871)

আদিম সমাজ

[যাদের সম্পর্কে এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে]

শব্দসূচী